boierpathshala.blogspot.com

আগুন রঙের বুলেট

অনীশ দেব

আগুন রঙের বুলেট

বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না,
শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirograbity@gmail.com

অনীশ দেব

আগুন রঙের বুলেট

পত্রভারতী

www.bookspatrabharati.com

পত্রভারতী

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৮

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ সৌজন্য চক্রবর্তী
অলংকরণ রাজীব পাল

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Aagun Ranger Bulet
by Anish Deb
Published by PATRABHARATI 3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
E-mail patrabharati@gmail.com
visit at www.facebook.com/ Patra Bharati

Price ₹ 200.00

ISBN 978-81-8374-492-8

আমার জননী ও আমার লেখালিখির জননী

শোভারাণী দেব-এর

স্মৃতির উদ্দেশে

এক মিনিট, আপনাকে বলছি

দশটা নতুন লেখা নিয়ে আবার আপনার সামনে এলাম ঃ ন'টা ছোটগল্প আর একটা নভেলেট। সাতরকম পত্রপত্রিকায় এই ন'টি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে একটি হল 'কবিতা ক্লাব' সংকলন। গল্পগুলোর কোনওটি ক্রাইম-কাহিনি, কোনওটি ফ্যানটাসি, আবার কয়েকটি ভৌতিক-অলৌকিক। এককথায় বলতে গেলে নানান স্বাদের গল্পের সংকলন।

সংকলনে সবার শেষে রয়েছে একটি ছোটমাপের উপন্যাস। উপন্যাসটি কয়েক বছর আগে 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'সংঘর্ষ যদি হয়' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ওই একই নামে আমার একটি গল্প ('কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র' সংকলনে) থাকায় নাম বদল করে 'সংঘর্ষ' নাম দিলাম।

এখন এই দশটা লেখা পড়ে বিচারের দায় আপনার। তারপর আপনার রায় শোনার জন্য আমি কিন্তু আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

সবশেষে 'পত্রভারতী'-র কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই, তাঁদের সুপ্রযোজনায় আমার এই বইটিকে প্রকাশের জন্য।

১৫ ডিসেম্বর ২০১৭

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ
কলকাতা ৭০০ ০০৯

অনীশ দেব

anishdeb2000@yahoo.co.in

লেখকের অন্যান্য বই

ভূতনাথের ডায়েরি
অনীশের সেরা ১০১
অশরীরী ভয়ংকর
তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট
ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
ভয়পাতাল
দুঃখী রাজকুমার
বারোটি রহস্য উপন্যাস
দেখা যায় না, শোনা যায়
ভৌতিক অলৌকিক
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
সেরা কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
রোমাঞ্চকর ধূমকেতু
সহজ কথায় রোবট
সহজ কথায় ইন্টারনেট
সহজ কথায় টেলিভিশন
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
বিজ্ঞানের হরেকরকম
পাই নিয়ে রূপকথা
বিশ্বের সেরা ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প
রক্ত ফোঁটা ফোঁটা (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ২ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ৩ (সম্পাদিত)
রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প (সম্পাদিত)

গল্প

আগুন রঙের বুলেট ১৩
কে কোথায় যায় ৩৩
মাটির নীচে ভালোবাসা ৪৩
ট্রেনের কামরায় দেখা লোকটা ৪৭
পাতায় পাতায় পাপ ৬৩
জল পড়ে, পাতা নড়ে ৭৯
খুনের আগে, খুনের পরে, এবং তারপর ৮১
আমি একা, তুমি একা ৯৫
অপারেশন সিলভার স্টার ১০৫

উপন্যাস

সংঘর্ষ ১২৯

boierpathshala.blogspot.com

গল্প

আগুন রঙের বুলেট

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রনিক। হাতে সিগারেট। জ্বলছে। সেই-সঙ্গে বুকের ভেতরটাও।

জানলার বাইরে বৃষ্টি। টপটপ করে ঝরে পড়ছে বড়-বড় ফোঁটা। সব কিছু ভিজছে, ঠান্ডা হচ্ছে। পিচের রাস্তা, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট-বড় গাছ, টিনের চালে বসে থাকা পায়রা, ইলেকট্রিকের তারে বসে থাকা কাক—সবাই ভিজছে।

কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে রনিকের মনে হচ্ছে আগুনের ফুলকি। সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। আর কিছু একটা করতে না পারার হতাশায় রনিকের ভেতরটা ফুঁসছে।

কথাটা মনে হতেই তেতো হাসি পেল ওর। ও একা ঢোঁড়া সাপ, অথচ ফোঁসফোঁস করছে। সোনার পাথরবাটি।

তিতিয়ার কথাই ভাবছিল ও। কারণ, তিতিয়ার কথা না ভেবে কোনও উপায় নেই। রনিকের সুন্দর-সুন্দর দিন আর রাতগুলো তিতিয়াকে দিয়ে ঘেরা।

এই তো সেদিন, মানে, কিছুদিন আগে...না, মানে কবে যেন? ও আর তিতিয়া লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়েছিল। নীল রঙের শেভ্রলে বিট। স্টিয়ারিং-এ রনিক—পাশে তিতিয়া।

সেদিনও বৃষ্টি পড়ছিল। তবে আজকের মতো এত জোরে নয়—ঝিরি-ঝিরি।

ওরা দিল্লি রোড ধরে যাচ্ছিল। আর তিতিয়া প্রচুর বকবক করছিল এবং অকারণে হি-হি করে হাসছিল।

হঠাৎই রনিককে বলল, 'অ্যাই, তুমি না ভালো করে ড্রাইভ করতে জানো না—।'

'কেন?' স্টিয়ারিং সামলে পলকের জন্য মুখ ফিরিয়ে তিতিয়ার দিকে তাকিয়েছে রনিক। ওর ভুরুতে সামান্য ভাঁজ পড়েছে, কারণ, ভালো ড্রাইভ করে বলে ওর অল্পবিস্তর ঘমন্ড্ আছে।

'আমার বন্ধু...মিলি। ওকে মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ, আছে—।' তিতিয়ার কাছে বহুবার মিলির নাম শুনেছে রনিক। মিলি স্কুল-লাইফ থেকে ওর বন্ধু। মিলির যে তন্ময় নামে একজন স্টেডি বয়ফ্রেন্ড আছে সেটাও শুনেছে।

'মিলির বয়ফ্রেন্ড...তন্ময়। ও দারুণ ড্রাইভ করে।'

'কীরকম দারুণ?' একটু হেসে জানতে চেয়েছিল রনিক।

'ও যখন ড্রাইভ করে তখন অ্যাট দ্য সেম টাইম মিলিকে আদর করে। তুমি সেটা পারো না—।'

লেগ পুল করার ব্যাপারটা রনিক এতক্ষণে বুঝতে পারে।

'তবে রে!' বলে বাঁ-হাতে তিতিয়াকে কাছে টেনে নেয়। রাস্তার দিকে একঝলক দেখে নিয়েই তিতিয়ার গালে একটা চুমু খায়। তারপর: 'এবার কি আমি ভালো ড্রাইভিং-এর সার্টিফিকেট পেলাম? নাকি আরও দু-চারবার এটা করে দেখাতে হবে?'

উত্তরে তিতিয়ার হাসি। মাথাটা পিছনে হেলিয়ে ও হাসছে। কী ফ্যান্টাসটিক দেখতে লাগছে।

বয়কাট চুল। ফরসা। একটু ভোঁতা মিষ্টি নাক। ফুলে থাকা পুরু ঠোঁট। আর সবসময় খিলখিল হাসিতে উচ্ছল। হালকা পাওয়ারের চশমা একটা আছে বটে, কিন্তু শত বললেও সেটা চোখে লাগাতে ভুলে যায়।

তিতিয়া এখন আর নেই—রনিককে ছেড়ে চলে গেছে। আর যেভাবে চলে গেছে সেটা লক্ষ-কোটি চেষ্টাতেও রনিক ভুলতে পারবে না—কোনওদিন না।

সেদিনও বৃষ্টি হচ্ছিল। সারাটা দিন ধরে চলছিল নিম্নচাপের বৃষ্টি। সঙ্গে হাওয়ার ঝাপট। দিনটা ছিল রবিবার। রাত তখন সওয়া আটটা কি সাড়ে আটটা।

এ. জে. সি. বোস রোড ধরে শিয়ালদহের দিকে ছুটে যাচ্ছিল রনিকের

boierpathshala.blogspot.com

বিট। গাড়িতে রনিক আর তিতিয়া। টিপটিপ করে একঘেয়েভাবে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির ফোঁটা বাতাসে উড়ছে। গাড়ির কাচ তোলা। চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এ.সি. চলছে।

সন্ধেটা নিজেদের মতো করে কাটাবে বলে ওরা বিকেল-বিকেল সাউথ সিটি মলের দিকে রওনা হয়েছিল। তিতিয়া ফেশিয়াল করবে আর একজোড়া জুতো কিনবে। আর রনিকের প্ল্যান ছিল একটা টি-শার্ট কেনার।

তো সেসব কাজ সেরে ফুড কোর্টে খাওয়াদাওয়া সেরে তারপর বাড়ি ফেরার পালা। রনিকের একটু টায়ার্ড লাগছিল, আর তিতিয়া তো তিনবার লম্বা-লম্বা তিনটে হাই তুলে ফেলেছে। তিতিয়ার ইন্‌ডাকশনে রনিকও আর হাইয়ের ঝোঁক চাপতে পারেনি। দু'বার হাই তুলে বোকা-বোকা হেসে ফেলেছে।

'ওঃ, তখন থেকে হাই চাপতে চেষ্টা করছি—তুমি আমার হাই তুলিয়ে ছাড়লে! জানো তো, হাতে স্টিয়ারিং থাকলে হাই তোলা খুব রিস্কি?'

'আমি ঠিক হাই তুলিনি—শুধু বড় করে হাঁ করেছি...।' তিতিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল।

'ও, আমারগুলো হাই, আর তোমারগুলো হাঁ! চমৎকার!'

এইরকম ছেলেমানুষি তর্কাতর্কিতে ক্লান্তির ভাবটা কেটে যাচ্ছিল বেশ। এন্টালি মার্কেটের কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে তখন হঠাৎ-ই একটা বোমার আওয়াজে রনিকের স্টিয়ারিং ধরা হাত কেঁপে উঠল। ওর বাঁ-পা যান্ত্রিকভাবে ব্রেক পেডালের ওপরে চেপে বসল। গাড়ির স্পিড কমে গেল পলকে।

ওদের গাড়ি থেকে তিরিশ কি চল্লিশ মিটার দূরে তৈরি হয়েছে একটা সাদা ধোঁয়ার মাশরুম। ধীরে-ধীরে ভেসে উঠছে ওপরদিকে।

রাস্তার লোকজন পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটছে। চিৎকার করছে।

আবার একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ। আবার সাদা ধোঁয়ার মেঘ। আগের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর থেকে হাতদশেক দূরে।

তারপরই ক্র্যাক-ক্র্যাক-ক্র্যাক! গুলির শব্দ!

রনিক গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু গাড়িটা সাইড করতে পারেনি। এদিক-ওদিকের আরও তিন-চারটে গাড়ি বোমার আওয়াজ এবং ধোঁয়ায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এ-সময়ে হয়তো রাস্তায় আরও গাড়ি-টাড়ি থাকার কথা কিন্তু একে ছুটির দিন, তার ওপরে বৃষ্টি।

রনিক ঠিক বুঝতে পারছিল না এখন ও কী করবে। পাশ থেকে তিতিয়া

ক্রমাগত জিগ্যেস করে চলেছে, 'রনিক, হোয়াট্‌স দ্য ম্যাটার? কীসের আওয়াজ? বোমার?'

রাস্তার দিকে চোখ রেখেই রনিক বলল, 'বোমা—তার সঙ্গে ফায়ারিং। আওয়াজ শুনে তাই তো মনে হচ্ছে...।'

'ওরে ব্বাবা। ফায়ারিং!'

ক্র্যাক-ক্র্যাক। আবার গুলির শব্দ। এবং উত্তরে একটা পালটা গুলি। ক্র্যাক।

জানলা আর উইন্ডস্ক্রিনের আড়াল থেকে এদিক-ওদিক নজর চালাল রনিক। কী হচ্ছে ব্যাপারটা? কে কাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে?

ডানদিকে, রাস্তার ওপারে একটা সাদা রঙের টাটা সুমো দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেভাবে গাড়ি পার্ক করা থাকে ঠিক সেভাবে নয়, কেমন যেন একটু তেরছাভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

উলটোদিকের লেনে একটা ছোট মারুতি গাড়ি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সেই গাড়িটা থেকে দুজন লোক বলতে গেলে ছিটকে বেরিয়ে এল বাইরে। তারপর পাগলের মতো ছুটে পালাতে লাগল।

আবার শব্দ শোনা গেল: ক্র্যাক! ক্র্যাক!

টাটা সুমোর আড়াল থেকে তিনজন লোক বেরিয়ে এসেছে। তাদের দুজনের হাতে রিভলভার। সামনে উঁচিয়ে রয়েছে। ছুটে পালানো লোক দুটোকে লক্ষ্য করে ফায়ার করে চলেছে।

একজন ভদ্রমহিলা রাস্তার বাঁ-পাশ ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ওঁর একহাতে ছাতা আর অন্যহাতে ধরে ছিলেন একটি বছর ছয়েকের মেয়ের হাত। হয়তো ওঁরই মেয়ে।

বোমার শব্দ হওয়ার একটু পরেই সেই ভদ্রমহিলা ছুটতে শুরু করেছিলেন। তখন ওঁর হাত থেকে খোলা ছাতাটা ছিটকে যায়। একইসঙ্গে ছেড়ে যায় মেয়ের হাত।

রঙিন ছাতাটা হাওয়ায় উড়ে ফুটপাথের ওপরে গিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

আর মেয়েটা?

মেয়েটা আওয়াজ আর ধোঁয়ায় ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটে চলে গেছে রাস্তার প্রায় মাঝখানে।

'ওই দ্যাখো! বাচ্চাটা কোথায় চলে গেছে!' তিতিয়া চিৎকরে করে উঠল।

'এই রে! কী হবে এবার! আশপাশে কোনও পুলিশও তো দেখছি না!'

কিন্তু আর কিছু বলে ওঠার আগেই তিতিয়া গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়েছে রাস্তায়। ছুট লাগিয়েছে বাচ্চা মেয়েটার দিকে।

ও এইরকম।

রনিকও আর দেরি করেনি। পড়িমড়ি করে গাড়ি থেকে নেমে ছুটেছে তিতিয়ার দিকে।

'তিতিয়া! তিতিয়া!'

ক্র্যাক! ক্র্যাক!

আবার ফায়ারিং-এর শব্দ।

বাচ্চা মেয়েটির কাছে পৌঁছোনোর আগেই তিতিয়ার ছুটন্ত শরীরটা শূন্যে একটা লাট খেয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তার। পড়েই একদম স্থির—ফ্রিজ শটের মতন।

রনিক হাহাকারের মতো একটা চিৎকার করে উঠল।

'তিতিয়া!'

চিত হয়ে পড়ে আছে তিতিয়ার শরীর। বৃষ্টিতে ভিজছে। আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

রনিক জাপটে ধরল ওকে। নাম ধরে ডাকতে লাগল বারবার। কিন্তু কোনও সাড়া নেই।

চারপাশটা ফাঁকা হয়ে গেছে। বাচ্চা মেয়েটিকে ওর মা ছুটে এসে ঝটকা মেরে টেনে নিয়ে গেছে।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। লাইটপোস্টের আলোয় রাস্তা চকচক করছে।

উথলে ওঠা কান্নার ঢেউ রনিককে কাঁপিয়ে দিল। গলার কাছে কী একটা দলা পাকিয়ে যাওয়ায় রনিকের গলা দিয়ে কোনও শব্দ বেরোচ্ছিল না।

ও শুধু থরথর করে কাঁপছিল।

ঝাপসা চোখে ও দেখল দু-জোড়া পা ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

রনিক মুখ তুলে তাকাল।

টাটা সুমোর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা তিনজনের দুজন। দুজনের হাতেই রিভলভার।

একজন উবু হয়ে বসে পড়ল তিতিয়ার মাথার কাছে। রনিককে কোনওরকম গ্রাহ্য না করে তিতিয়ার কপালের দিকে তাকাল। কপালের বাঁ-দিক ঘেঁষে একটা ফুটো। বুলেটের। অল্প-অল্প রক্ত বেরোচ্ছে সেখান থেকে। বৃষ্টির ফোঁটায় রক্ত ফিকে হয়ে যাচ্ছে।

সব বুঝতে পেরেও লোকটা তিতিয়ার পালস দেখল। তারপর এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল। অন্য জনকে বলল, 'ভাই, একদম ডেড।'

রনিক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল শুধু—কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারছিল না।

দ্বিতীয়জন রনিককে ধরে দাঁড় করাল। রিভলভারের নল দিয়ে তিতিয়ার দিকে দেখিয়ে জিগ্যেস করল, 'কে হয়?'

রনিক যন্ত্রের মতো উত্তর দিল, 'ওয়াইফ...।' একইসঙ্গে লোকটাকে দেখল।

গলায় দুটো মোটা সোনার চেন। বাঁ-হাতের আঙুলে তিনটে ডুমো-ডুমো আংটি। কবজিতে সোনার রিস্ট ব্যান্ড। গায়ে টি-শার্ট আর সাদা প্যান্ট। পায়ে স্নিকার।

লোকটার গায়ের রং কালো। মাথায় ছোট মাপের চুল। মোটা গোঁফ। চোয়ালের হাড় উঁচু। মুখটা তেলতেলে।

রনিকের কাঁধে আলতো চাপড় মারল লোকটা। ভারী গলায় বলল, 'সরি, বস—ব্যাড লাক। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। আপনার ওয়াইফ আমার গুলির লাইনে এসে পড়ল। যাই হোক, ডোন্ট মাইন্ড...।'

তারপর নিজের সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হরিয়া শুয়ারের বাচ্চা আজ খুব জোর জানে বেঁচে গেল। ব্যাড লাক। পরের বার কবজায় পেলে ওকে জানে খেয়ে দেব...।'

ব্যস, এইটুকুই। লোক দুটো চলে গেল। তার একটু পরে টাটা সুমোটা 'ইউ' টার্ন নিয়ে মল্লিকবাজারের দিকে উধাও হয়ে গেল।

রনিক এতক্ষণে চিৎকার করে কাঁদতে পারল।

ধীরে-ধীরে চারপাশে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। দুটো পুলিশের গাড়ি চলে এল অকুস্থলে।

তারপর শুরু হল বডি পোস্ট মর্টেম, জিজ্ঞাসাবাদ, তদন্ত। একমাস ধরে এসব চলতেই লাগল। এবং শেষ পর্যন্ত ফলাফল একটি অশ্বডিম্ব।

এরপর দুটো বছর কেটে গেছে। কিন্তু রনিক কিছুই ভোলেনি। সেদিন রাতের দৃশ্যটাই ওর রাত আর দিন ছেয়ে আছে। সেই অদ্ভুত সংলাপটাও কানের কাছে বেজে চলেছে অবিরাম ঃ '...আপনার ওয়াইফ আমার গুলির লাইনে এসে পড়ল।' যেন সব দোষ তিতিয়ার! ও কেন ফায়ারিং-এর লাইনে এসে পড়ল!

প্রতিশোধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে রনিকের বুকের ভেতরে। সেদিন থেকেই।

তিতিয়ার মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। রনিক পুলিশকে বলেছিল, ও কারও নামে এফ.আই.আর. করতে চায় না। কারণ ও জানত, পুলিশ কিছুই করতে পারবে না। তাই রনিক নিজেকে যতটা পারা যায় আড়ালে রাখতে চেয়েছিল। যা করার সেটা তো ওকেই করতে হবে!

সে-রাতে যে-গোলাবারি চলছিল সেটাকে মোটামুটিভাবে গ্যাং ওয়ার বলা যায়। হরিয়া যাদবের সঙ্গে নোনা সামন্তের এলাকা দখলের লড়াই। এদের দুজনের নামেই অনেক ক্রিমিনাল কেস রয়েছে, কিন্তু পুলিশ এদের ছুঁতে পারে না। কারণ, এদের পয়সা প্রতিপত্তি একেবারে আকাশছোঁওয়া। তাছাড়া এদের নিবিড় রাজনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে।

এই দু-বছরে রনিক কতকগুলো কাজ করেছে।

ওর পুরোনো ফ্ল্যাট ছেড়ে সি.আই.টি. রোডে লেডিজ পার্কের কাছাকাছি একটা এক কামরার ঘুপচি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। নিজের লুকটা সামান্য বদলাতে চোখে রিমলেস চশমা লাগিয়েছে, থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছে, আর মাথার চুলের ছাঁট একটু পালটেছে।

গাড়িটা রনিক বিক্রি করে দিয়েছে। পুরোনো সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সব টাকা তুলে নিয়ে অ্যাকাউন্টগুলো ক্লোজ করে দিয়েছে। তারপর টাকা খরচ করে নতুন নাম-ঠিকানায় নতুন একটা ভোটার কার্ড তৈরি করেছে। আগের চাকরি ছেড়ে একটা সফ্‌টওয়্যার কোম্পানিতে 'অফিস অ্যাট হোম' শর্তে চাকরি নিয়েছে।

এ ছাড়া দু-বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে যে-কাজটা রনিক করে চলেছে সেটা হল, নোনা সামন্তের ওপরে নজর রাখা আর ওর সম্পর্কে যখন যা তথ্য পাওয়া যায় সেটাকে ফাইলবন্দি করা।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোডের ওপরে নোনা সামন্তের তিনতলা বাড়ি। বাড়িটা বাইরে থেকে দেখতে পুরোনো হলেও ভেতরটা আধুনিক মার্বেল প্যালেস। লোকটার চারটে গাড়ি—তার মধ্যে একটা অডি, একটা ইনোভা, একটা স্করপিও, আর একটা সাদা রঙের টাটা সুমো।

নোনার ডেইলি লাইফের ওপরে নজরদারি করে একটা প্যাটার্ন খুঁজে পেতে চাইছিল রনিক। কিন্তু ডেইলি প্যাটার্ন তো দূরের কথা একটা উইক্‌লি প্যাটার্নও খুঁজে পেল না ও।

রনিক বুঝল, নোনা অনেক বড় প্লেয়ার। ওর শত্রুর সংখ্যা নিশ্চয়ই খুব একটা কম নয়। তারা যদি ওকে খতম করার কোনও ছক তৈরির চেষ্টা করে

তা হলে নোনা সামন্তের লাইফস্টাইলের একটা প্যাটার্ন খুঁজে বের করাটা অত্যন্ত জরুরি। আর নোনা সেটা জানে বলেই নিজের গতিবিধির কোনও নকশা তৈরি হতে দেয়নি।

সপ্তাহের প্রতিটি দিন ও কখন বাড়ি থেকে বেরোয়, কখন বাড়িতে ঢোকে সেসব একটা ডায়েরিতে রনিক নোট করেছে। কখনও-কখনও ওর গাড়িকে খুব সাবধানে ফলো করেছে—কখনও ওর গাড়ির পিছনে থেকে, কখনও ওর গাড়ির সামনে থেকে—যাতে নোনা সন্দেহ না করতে পারে।

নোনা সামন্তের ছ'-সাতটা বড়-বড় ব্যবসা। সবই অফিশয়াল। তার মধ্যে শরৎ বোস রোডে মারুতি-সুজুকির শো-রুম আছে, ধূলাগড়ে সারের ফ্যাক্টরি আছে, রেডিমেড গারমেন্টস্-এর ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা আছে, এবং আরও অনেক কিছু।

নোনা সামন্তের এরিয়ায় খুব চাপাভাবে খোঁজখবর করেছে রনিক। এবং তার জন্য পয়সা খরচও করেছে। ছ'মাসের ফারাকে নোনার দুজন ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলেছে, তাদের সিগারেট, বিড়ি, এমনকী মদও খাইয়েছে। তাতে জানা গেছে যে, নোনা সামন্ত বেআইন আর্মস আর ড্রাগের কারবার করে। তবে কীভাবে করে সে-ব্যাপারে ওরা কিছুই জানে না।

নোনার ক্যারেকটার সম্পর্কে যেটুকু জেনেছে, সেটা হল, লোকটার মদ খাওয়ার রোগ থাকলেও মেয়েছেলের রোগ নেই। খুব সন্দেহবাতিক। আর দুশমনদের বাঁচিয়ে রাখতে ও ভালোবাসে না।

নোনা সামন্তের লাইফস্টাইলের প্যাটার্ন খুঁজতে গিয়ে ওর বউয়ের লাইফস্টাইলের একটা নকশা খুঁজে পেল রনিক। চোদ্দোদিন অন্তর-অন্তর রবিবার নোনার বউ রেখা নানান কেনাকাটার জন্য সাউথ সিটি মলে যায়। বেশ কিছুদিন নজর রাখার পর এই রুটিনটা সম্পর্কে রনিক নিশ্চিত হল। তখন ও ভাবল, রেখার সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুব ভালো হয়। তা হলে হয়তো নোনার নিরাপত্তার দুর্গ ভেদ করা যাবে।

রনিক খোঁজখবর করে জেনেছে, নোনার কোনও ছেলেমেয়ে নেই। এছাড়া রেখাকে ও তেমন একটা সময় দিতে পারে না। তাই রনিক আলাপের সুযোগের জন্য তক্কেতক্কে রইল।

এবং সুযোগও এসে গেল এক রবিবার।

সাউথ সিটি মলে শপিং-এ গিয়েছিল রেখা। রনিক সেখানে বিকেল থেকে হাজির ছিল। সেকেন্ড ফ্লোরের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ও মলের ভিজিটরদের

ওপরে নজর রাখছিল—রেখাকে খুঁজছিল।

সাউথ সিটি মলে এলে রেখা সেকেন্ড ফ্লোরের একটা শাড়ির দোকান অবশ্যই ভিজিট করে। দোকানটার নাম 'আলিশান'। রনিকের চঞ্চল চোখ 'আলিশান'-এর দিকেও নজর রাখছিল।

রনিক জানে, রেখা শপিং-এ এলে কখনও একা আসে না। ওর সঙ্গে দুজন বডিগার্ড থাকে। ওরা অবশ্যই নোনার বিশ্বস্ত অনুচর।

হঠাৎই তিনজনকে দেখতে পেল রনিক। রেখা 'আলিশান'-এর সামনে দাঁড়িয়ে। কথা বলছে ওর দুজন বডিগার্ডের সঙ্গে।

রেখা যথেষ্ট তরুণী। গায়ের রং মাজা। একটা সবুজ শাড়ি পরে এসেছে। মাথায় লম্বা হওয়ায় শাড়িটা বেশ মানিয়েছে। সাজগোজ অতিরিক্ত না হলেও বেশ চটকদার। গায়ে অনেক গয়না। কাঁধে একটা সাইডব্যাগ, হাতে মোবাইল ফোন।

ওর সঙ্গে বডিগার্ড দুজন বেশ ফিটফাট পোশাক পরে এসেছে। তার মধ্যে একজন তো আবার ছাই রঙের সাফারি সুট! কিন্তু পোশাক পরিপাটি হলেও এদের চোখমুখের দু-নম্বরি দাগি ছাপটা ঢাকা পড়েনি।

রেখা 'আলিশান'-এ ঢুকে পড়ল। ও এখানে যখনই আসে তখনই দু-চারটে শাড়ি কেনে।

ওর বডিগার্ড দুজন দোকানের ভেতরটা একবার চক্কর মেরে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর রেলিং-এর কাছাকাছি এসে অলসভাবে দাঁড়িয়ে রইল—কিন্তু ওদের তীক্ষ্ণ নজর বসের স্ত্রীর দিকে।

রনিক এবারে দোকানটায় গিয়ে ঢুকল। দোকানের সব দেওয়ালই কাচের। তাই নানান রঙিন শাড়ির ডিসপ্লের ফাঁক দিয়ে রেখার বডিগার্ড দুজনকে দেখা যাচ্ছিল।

রেখা যে-কাউন্টারে শাড়ি দেখা শুরু করেছে রনিক তার ঠিক পাশের সেলসম্যানটির কাছে গেল। বলল, 'খুব ব্রাইট শিফন শাড়ি দেখান। ফোর থাউজ্যান্তের মধ্যে। একজনকে গিফ্‌ট করব...।'

রনিক শাড়ি দেখতে শুরু করল।

একটু পরে রেখা একটা শাড়ি পছন্দ করে সেটা আলাদা করে রাখতে বলল। তারপরে অন্য ডিজাইনের শাড়ি দেখতে অন্য একজন সেলস্‌ম্যানের কাছে চলে গেল।

রনিক জানত এটা হবে। ও এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ও

'শাড়ির কালার কম্বিনেশান পছন্দ হচ্ছে না' বলে রেখার ছেড়ে যাওয়া কাউন্টারে সরে গেল। নতুন সেল্‌সম্যান তখন কাউন্টারের ওপরে ছড়িয়ে থাকা শাড়িগুলো একে-একে ভাঁজ করছে।

তাকে শাড়ি দেখাতে বলল রনিক।

আর ঠিক তখনই ওর পায়ে কী একটা ঠেকল।

মেঝের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে একটা সুন্দর হার। দেখে অন্তত সোনার বলেই মনে হচ্ছে।

হারটা নিশ্চয়ই রেখার গলা থেকে খুলে পড়েছে। নয়তো ওর ব্যাগ থেকে।

ঝুঁকে পড়ে হারটা তুলে নিল রনিক। বেশ ভারী। অন্তত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গ্রাম।

কী করবে এখন? রেখাকে গিয়ে বলবে? জিগ্যেস করবে এটা ওর হার কি না?

রনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। হারটা নিয়ে ও সোজা চলে গেল রেখার কাছে।

'এক্সকিউজ মি, ম্যাম...।'

রেখা চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ঃ 'বলুন—।'

রনিক রেখার গলার দিকে দেখল। সেখানে একটা ঝিকিমিকি হার ঠিকঠাক শোভা পাচ্ছে। তা হলে...।

'আপনার ব্যাগ থেকে বোধহয় এই হারটা পড়ে গেছে...।' হারটা রেখার চোখের সামনে ধরল রনিক।

রেখার এক মুহূর্তের অভিব্যক্তি ওকে বলে দিল, হারটা রেখার নয়। আর তার পরের মুহূর্তেই চকচকে লোভ উঁকি মারল চোখে। কিন্তু সেই লোভের ঝলকটা সামলে নিল রেখা।

রনিকের চোখে চোখ রেখে বলল, 'না, এটা আমার নয়। দেখুন অন্য কারও হবে...।'

'তবুও আমার রিকোয়েস্ট, আপনি বাড়ি গিয়ে ভালো করে চেক করে দেখুন—তার পর না হয় এটা রিটার্ন করবেন। তখন আমরা এটা এই দোকানের ম্যানেজারের কাছে ডিপোজিট করে দেব...।'

রনিকের সততা রেখাকে অবাক করছিল। অনেক কম বয়েসে যখন নোনার সঙ্গে ওর ভালোবাসা হয় তখন নোনা রনিকের মতোই সৎ ছিল।

তারপর...তারপর...গত তেরো বছর ধরে নোনা একটু-একটু করে বদলে গেছে। লোভ আর ক্ষমতার লোভ ওকে পাগল করে দিয়েছে দিনের পর দিন। এই দুনিয়ায় নোনা সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে বুলেট-কে। ওর নীতি হচ্ছে 'শত্রুর শেষ রাখতে নেই।'

কথা বলতে-বলতে রনিকের চোখ গেল বডিগার্ড দুজনের দিকে। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। আর বারবার দেখছে রনিক আর রেখার দিকে।

'বাড়িতে চেক-টেক করার পর যদি দরকার হয় তা হলে কী করে আপনাকে কনট্যাক্ট করব?' রেখা জিগ্যেস করল।

সুযোগ পেলে রেখাকে ফোন নম্বর দিতে হবে, এটা রনিকের মাথায় ছিল। তাই ও একটা চিরকুটে ফোন নম্বর লিখে সেই কাগজের টুকরোটা একটা একশো টাকার নোটের মধ্যে ঢুকিয়ে নোটটা দু-ভাঁজ করে রেখেছিল। ও বডিগার্ড দুজনে নজরের আড়ালে পকেট থেকে সেই স্পেশাল নোটটা বের করল।

ম্যাম, আপনার সঙ্গে যে দুজন এসকর্ট আছে সেটা খেয়াল করেছি। তাই একটু কেয়ারফুল থাকা ভালো।...এটার ভাঁজের মধ্যে আমার ফোন নাম্বার লেখা একটা কাগজ আছে...।'

কথা বলতে-বলতে রনিক দেখল, কিছু একটা সন্দেহ হওয়াতে বডিগার্ড দুজন ব্যস্তভাবে দোকানের ভেতরে ঢুকে আসছে।

'নোটটা আমি মেঝেতে ফেলছি।' রনিক চাপা গলায় বলল, 'আপনি চট করে ওটা কুড়িয়ে নিন—যেন আপনার টাকা পড়ে গেছে। আপনার বডিগার্ডরা...।'

কথার মাঝখানে টাকাটা ফেলে দিল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে লোক চলে এল ওদের কাছে। দুজনের একজন বলল, 'কী? কী প্রবলমে হল, ম্যাডাম?'

রেখা একশো টাকার নোটটা কুড়িয়ে নিতে-নিতে বলল, 'তেমন কিছু নয়। বাইরে চলো, বলছি...।'

সাইডব্যাগ থেকে পার্স বের করে টাকাটা পার্সে ঢোকাল রেখা। তারপর দোকানের দরজার দিকে হাঁটা শুরু করল। রনিককে সংক্ষেপে বলল, 'বাইরে আসুন—।'

ওরা চারজন দোকানের বাইরে বেরোল। হারটা তখনও রনিকের হাতে।

রেখা সংক্ষেপে হারের ঘটনাটা বলল। বলল যে, ওরই হার—কখন যেন ব্যাগ থেকে পড়ে গিয়েছিল।

একজন বডিগার্ড মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। বোধহয় ভাবছিল, বসকে একটা ফোন লাগাবে কি না। তারপর কীভাবে রনিকের একটা ফটো তুলে নিল মোবাইলে।

রেখা কোনওরকম ঝুঁকি নিল না। সোজা রনিকের দিকে হাত বাড়াল।

'থ্যাংক ইউ। ভাগ্যিস আপনি দেখতে পেয়েছিলেন—নইলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেত। আবার হাজব্যান্ডের কাছেও চারটে কথা শুনতে হত—।'

রনিক হারটা রেখার হাতে দিল। সামান্য হেসে আবার ঢুকে গেল 'আলিশান'-এর ভেতরে। এবং শাড়ি পছন্দ করার ভান করতে লাগল।

তিতিয়ার কথা খুব মনে পড়ছিল। আজ শুধু একটা ফোন নম্বর দেওয়া-নেওয়ার সুযোগ বের করার জন্য তিতিয়ার একটা শখের হার হাতছাড়া করতে হল। গয়নাগুলো রেখে কী-ইবা করবে রনিক? তার চেয়ে তিতিয়ার গয়না তিতিয়ার জন্যই কাজে লাগুক।

তিতিয়া চলে যাওয়ার পর রনিক জ্বলেছে, পুড়েছে, সেইসঙ্গে অপেক্ষা করেছে। মনে পড়েছে সেই বিখ্যাত প্রবাদের কথা ঃ 'রিভেঞ্জ ইজ আ ডিশ বেস্ট সার্ভ্ড কোল্ড।'

সেই অপেক্ষা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। দু-বছর তিনমাস সময় পেরিয়ে গেছে। প্রতিশোধ ঠান্ডা থেকে আরও ঠান্ডা হয়েছে। নোনা সামন্ত সম্পর্কে তথ্যও জোগাড় করা গেছে কম নয়। এবার রনিক রেখাকে ধরে নোনা সামন্তের অন্দরমহলে ঢুকতে চায়, ওর অন্দরের কথা শুনতে চায়। তারপর...তারপর...মধুর প্রতিশোধের পালা।

রেখার ফোন আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল রনিক। একদিন... দু-দিন...তিনদিন।

চারদিনের দিন ফোনটা এল। বিকেল তিনটে নাগাদ।

'হ্যালো—।' অ্যাকসেপ্ট বোতাম টিপে কথা বলল রনিক।

'আমি বলছি। মানে, আপনার নাম তো জানি না...। আমরা নাম রেখা। সাউথ সিটিতে "আলিশান" শাড়ির দোকানে আমাদের আলাপ হয়েছিল।' রেখার গলা বেশ আড়ষ্ট।

'হ্যাঁ। একটা সোনার হার। একশো টাকার নোট। ফোন নাম্বার...। বলে জোরে হেসে উঠল রনিক।

রেখা এবার সহজ হল। তারপর ঃ 'বাড়িতে এসে চেক করেছি। ওই সোনার হারটা আমার নয়...।'

'তা হলে এখন কী করবেন?'

'আপনি ওই দোকানটায় আসুন। হারটা আপনাকে ফেরত দিই। তারপর আপনি যা ভালো বোঝেন করবেন—।'

'কিন্তু আপনি তো বডিগার্ড দুজনের সামনে মেনে নিয়েছেন যে, হারটা আপনার। এখন সেটা ফেরত দিলে সমস্যা হবে না?'

একটু চুপ করে থাকার পর রেখা বলল, 'হ্যাঁ, প্রবলেম তো হবে, কিন্তু...।'

'আচ্ছা, ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে বডিগার্ড থাকে কেন? আপনি কি কেউকেটা কেউ?'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। প্রায় পাঁচ সেকেন্ড পর রেখা বলল, 'কেউকেটা না। আমাকে জেলখানার বন্দির মতো থাকতে হয়। আমার স্বামী খুব সন্দেহ করে, তাই...।'

'কেন?'

'খুব শক্ত কোশ্চেন। আজ থাক। আজ আর এর জবাব দেব না।'

'আপনার সঙ্গে পরে কখনও ফোনে কথা হতে পারে?'

'হ্যাঁ, পারে। তবে আপনি ফোন করবেন না—আমিই ফোন করব। সুযোগ বুঝে...।'

ফোন ডিসকানেক্ট হয়ে গেল।

এরপর ফোন আসতে লাগল প্রায়ই। রনিককে ফোন করাটাই রেখার ঘেরাটোপের জীবনে একটিমাত্র বাইরের জানলা। রনিককে ফোন করার পর সমস্ত কল ডিটেইল্‌স ডিলিট করে দেয়। কারণ, নোনা মাঝে-মাঝেই রেখার ফেন নিয়ে ঘেঁটে দ্যাখে।

ধীরে-ধীরে রনিককে অনেক কথাই বলেছে রেখা। বলেছে ওর ডন স্বামীর কথা। বলেছে, নোনা কীরকম সন্দেহ করে সবাইকে, কীরকম হিংস্র—দয়ামায়ার ধার ধারে না। রেখা বহুবার ভেবেছে, এই দম বন্ধ করা বন্দি জীবনের বেড়া ভেঙে পালাবে, কিন্তু সেটা পারেনি। ভয়ে, কারণ, রেখা পালালে নোনা অবশ্যই ওকে খুন করে ফেলবে।

খুন করাটা নোনার কাছে একটা খেলা। নিজের বাড়ির-ই একটা ঘরে ও এই খেলার আয়োজন করে। খেলাটার নোনা নাম দিয়েছে 'ভগবানের লটারি'।

' "ভগবানের লটারি!" সেটা আবার কী জিনিস?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছে রনিক।

'একটা লটারি খেলার মোড়কে কোনও মানুষকে খুন করা...।' রেখা নীচু গলায় বলল।

নোনা ঘরটার নাম দিয়েছে 'লটারি' রুম। এই ঘরে যে-লটারি খেলা হয় তার নাম 'ভগবানের লটারি'। এই মুহূর্তে ঘরে একটা লটারি খেলার আয়োজন চলছিল।

ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে সময় রাত ন'টা। ছ'টা ফ্লুওরেসেন্ট টিউব আর আটটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এল.ই.ডি. বাতিতে গোটা ঘর ঝকঝক করছিল। লুকোনো মিউজিক সিস্টেমে নীচু গ্রামে সফ্‌ট মিউজিক বাজছিল। চোখ বুজে সেই মিউজিক শুনলে একটু-আধটু নেশা হয়ে যেতে পারে।

ঘরটা মাপে বেশ বড়। অন্তত পনেরো বাই পঁচিশ তো হবেই! মেঝেতে ডিজাইন তোলা ইটালিয়ান মার্বেল। ঘরে আসবাবপত্র বলতে একপ্রান্তে একটা সোফা সেট, তার সামনে ডার্ক গ্লাস আর রাবার উডে তৈরি শৌখিন সেন্টার টেব্‌ল। টেব্‌ল-এ দুটো হুইস্কির বোতল আর চারটে গ্লাস। তার মধ্যে দুটো গ্লাসে ইঞ্চিদুয়েক করে স্বচ্ছ বাদামি তরল—বাকি দুটো গ্লাস খালি।

সোফা সেট থেকে তেরছাভাবে সাত-আটফুট দূরত্বে একটা প্রকাণ্ড বড় মাপের কার্ভ্‌ড এল.ই.ডি. টিভি। টিভির সাউন্ড মিউট করা। তবে ছবিতে আফ্রিকার জঙ্গলের হিংস্র পশুদের দেখা যাচ্ছে। একটা সিংহ আর কুমিরে ভয়ঙ্কর লড়াই চলছে।

টিভি থেকে হাতদুয়েক দূরে দেওয়ালে মা কালীর একটা ফটো টাঙানো রয়েছে।

সোফা সেটের লম্বা সোফাটায় সামান্য কাত হয়ে বসে আছে নোনা। গায়ে সাদা ফুলশার্ট আর সাদা প্যান্ট। গলায় মোটা-মোটা দুটো ডগ চেন; বাঁ-হাতের আঙুলে তিনটে আংটি, আর কবজিতে রিস্ট ব্যান্ড।

ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় আড়াই ফুট উঁচু একটা বেদি। তার ওপরে ট্রে জাতীয় কিছু একটা রাখা আছে। সেটা বেশ বড় মাপের একটা রুমাল অথবা ছোট মাপের একটা টেব্‌লক্লথ দিয়ে ঢাকা। সেই ঢাকনার একদিকে এমব্রয়ডারির কাজ করে তিনটে গোলাপ ফুল আর তিনটে সবুজ পাতার নকশা তোলা।

নোনার বিপরীতে, বেদির ওপারে, প্রায় দশ-বারো ফুট দূরে একটা

লম্বামতন রোগা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখে ভয়ের অজস্র কাটাকুটি রেখা। তাকিয়ে আছে নোনার দিকে।

ছেলেটার দু-পাশে হাতচারেক তফাতে দাঁড়িয়ে আছে নোনার দুই শাগরেদ ঃ কাচার আর বিল্লু। ওদের মুখ দেখেই বোঝা যায় গুন্ডাগর্দির লাইনে ওদের ভালোরকম অভিজ্ঞতা রয়েছে।

নোনা কাচারকে বলল, 'অ্যাই, ঘরের দরজা বন্ধ করে দে—। নইলে লটারির সময় কে না কে ঢুকে পড়ে ডিসটার্ব করবে...।'

কাচার চটপট গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

নোনা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওর ভগবানের উদ্দেশে হাতজোড় করে প্রণাম করল। তারপর বিল্লুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'নে, এবার পলিথিন দুটো ঠিক করে পেতে দে। নইলে ঘরের মেঝেটা বিলা ছয়েল ছবিলা হয়ে যাবে...।'

ঘরের এক কোণে মেঝেতে দুটো নীল রঙের পলিথিনের চাদর ভাঁজ করে রাখা ছিল। বিল্লু তাড়াতাড়ি গিয়ে সে-দুটো নিয়ে এল।

রোগামতন ছেলেটা কাতর গলায় বলল, 'নোনাভাই, গলতি হয়ে গেছে। মাফ করে দাও। আর কখ্খনও হবে না...।'

'আমি মাফ করার কে? মাফ যদি করে তো ওপরওয়ালা করবে। সেইজন্যেই তো এই "ভগবানের লটারি" চালু করেছি। আমার হাতে কিছু নেই। সব ওপরওয়ালা। তবে কাশিমের হয়ে মেশিন চামানোর আগে তোর দু-তিনবার ভাবা দরকার ছিল...।'

ছেলেটা 'নোনাভাই! নোনাভাই!' করছিল। ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছিল। ও বুঝতে পারছিল, ওকে নিয়ে নোনা সামন্ত কোনও একটা খেলা খেলতে চলেছে। কিন্তু কী খেলা সেটা বুঝতে পারছিল না।

কাচার আর বিল্লু বেদির দুপাশে দুটো পলিথিনের চাদর সুন্দর করে বিছিয়ে দিল। তারপর রোগা ছেলেটাকে বলল, বেদির কাছাকাছি পলিথিনের ওপরে গিয়ে দাঁড়াতে।

নোনা সামন্তও বেদির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। এখন বেদিকে মাঝখানে রেখে দু-দিকে ওরা দুজন। এবার শুরু হবে লটারি।

নোনার ইশারায় কাচার বেদির ওপর থেকে ঢাকনাটা সরিয়ে নিল। একটা সুন্দর কারুকাজ করা স্টেইনলেস স্টিলের ট্রে-র ওপরে দুটো চকচকে রিভলভার—হুবহু এইরকম দেখতে। দুটো রিভলভার ট্রে-র দু-প্রান্তে রয়েছে

ঃ একটা রোগা ছেলেটার দিকে, আর-একটা নোনার দিকে।

কাচার ট্রে-টা আবার আগের মতন করে ঢাকা দিয়ে দিল।

নোনা বলল, 'লটারিটা খুব ইজি। বিল্লু একটা বোতাম টিপে দেবে। তা হলেই বেদিটা ঘুরতে শুরু করবে। দশ সেকেন্ড পর সুইচটা অফ করে দেবে ও। ট্রে তোমার-আমার দিক বরাবর থামবে। তখন কাচার ট্রে-র ওপরের ঢাকনাটা তুলে নেবে। তারপর...।' ওপরদিকে মুখ তুলে ওপরওয়ালাকে প্রণাম জানাল নোনা। তারপর ঃ 'তারপর আমি ট্রে থেকে যে-কোনও একটা মেশিন তুলে নেব। অন্যটা তুলে নেবে তুমি। এই দুটো মেশিনের মধ্যে একটার সবক'টা চেম্বারে গুলি ভরা আছে, আর অন্যটার সব চেম্বার খালি। কোনটা ভরতি কোনটা খালি আমরা কেউ জানি না।'

একটু চুপ করল নোনা। তিনজনের মুখের দিকে পালা করে তাকাল। তারপর বিল্লুকে বলল বেদি ঘোরানোর সুইচটা টিপতে।

বেদি ঘুরতে শুরু করল।

'প্রথমে রিভলভার তুলব আমি, তারপর তুই। তারপর রিভলভারের নল রগে ঠেকিয়ে ফায়ার করে আমরা দুজনেই সুইসাইড করার চেষ্টা করব। প্রথমে আমি, তারপর তুই। এবার ওপরওয়ালা যাকে আশীর্বাদ করবে সে থাকবে, আর অন্যজনের খুলি, ঘিলু সব ঘেঁটেঘুঁটে চৌচির হয়ে ছড়িয়ে পড়বে এই পলিথিনের ওপরে। ব্যস, "ভগবানের লটারি" শেষ।'

একচিলতে হাসল নোনা। তারপর বেদির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

একসময় ঘুরন্ত বেদি থামিয়ে দিল বিল্লু। কাচার ট্রে-র ওপর থেকে কাপড়ের ঢাকনাটা তুলে নিল। দুটো চকচকে রিভলভার—একইরকম দেখতে। তবে একটায় আছে মৃত্যু, অন্যটায় জীবন।

ওপরদিকে মুখ তুলে তিনবার নমস্কার জানাল নোনা। মা কালীর ফটোর দিকে তাকিয়ে একবার চোখ বুজল।

রোগা ছেলেটা তখন কাঁদছে। হিজিবিজি বকছে।

নোনা একটা রিভলভার তুলে নিল। নিজের ডানরগে ঠেকাল।

রোগা ছেলেটা অন্য রিভলভারটা তুলে নিল। নোনার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

নোনা চোখ বুজে ট্রিগার টিপল। 'ক্লিক' শব্দ হল। চেম্বার খালি—গুলি নেই।

'ভগবানের লটারি'-তে নোনা বেঁচে গেছে।

রোগা ছেলেটা এখন প্রবল কাঁদছে। নোন ওর দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

ফেরার আর কোনও পথ নেই।

ডানরগে রিভলভার ঠেকিয়ে ছেলেটা ট্রিগার টিপল।

গুলির শব্দে ঘরটা থরথর করে কেঁপে উঠল।

ছেলেটা কয়েক সেকেন্ড পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কাটা গাছের মতো দড়াম করে খসে পড়ল নীল পলিথিনের ওপরে।

'ভগবানের লটারি' শেষ হল।

নোনা সামন্তের ঠোঁটে একচিলতে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল।

রেখার কাছে লটারির গল্পটা শোনার পর রনিকের মনে হল, নোনা সামন্তকে যেভাবে ও তোলমোল করেছিল ও তার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং অনেক বেশি শয়তান। এই শয়তানটাকে খতম করার জন্য রনিক মনে-মনে নানান ফিকির খুঁজছিল।

কী করা যায়? কী করা যায়?

রেখার সঙ্গে ফোনে প্রায়ই কথা হয়। সেসব কথার মধ্যে নোনা সামন্ত থাকে না। থাকে রেখার দম আটকানো বন্দিজীবনের কথা, রেখার কিছু-কিছু শখ আর আহ্লাদের কথা।

কিন্তু একদিন রেখা নোনার কথা বলেই ফেলল।

'আজ আপনাকে এমন একটা কথা বলব যেটা আগে কখনও বলিনি...।'

'কী কথা?'

'আমার হাজব্যান্ড এন্টালি এরিয়ার ডন। নোনা সামন্ত। ওর নামে অনেক পুলিশ-কেস আছে। তার মধ্যে ছ'টা মার্ডার কেস...।'

রনিক কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। ছ'টার মধ্যে তিতিয়ারটা একটা। তিতিয়ার কথা বলবে নাকি রেখাকে?

খুব বলতে ইচ্ছে করছিল। কারণ, রনিকের জীবনে রেখাই একমাত্র বাইরের জানলা। তিতিয়ার দুঃখটা ওর রেখার সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও তিতিয়ার কথা রেখাকে বলল।

শুনে রেখা পাথর হয়ে গেল। তারপর পাথরের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

'এতদিন ধরে আমাদের পরিচয়, তবুও তুমি...তুমি এই দুঃখটার কথা আমাকে বলোনি!'

উত্তরে শুধু ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদল রনিক। নিজেকে আজ অনেক হালকা মনে হল। রোজ ফোনে কথা বলতে-বলতে কখন যেন ও আর রেখা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। একদিন রেখার ফোন না পেলে ওর মনটা কেমন ছটফট করতে থাকে। এইরকম একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে যাবে এমনটা ও আগে থেকে ভাবতে পারেনি। নোনা সামন্ত ওদের দুজনের কাছেই এখন এক ভয়ঙ্কর অসহ্য বস্তু।

এরপর থেকে রনিক আর রেখা প্রতিটি মুহূর্তে নোনা সামন্তকে মনে-মনে খতম করতে লাগল।

টেলিফোন-বন্ধুদের কথায়-কথায় দিন যায়, রাত যায়। ওদের মধ্যে বুদ্ধি আর যুক্তির নানান প্যাঁচের কাটাকুটি চলতে লাগল। একটাই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে দুজন।

একদিন রাতে আটটা নাগাদ নোনার বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করছিল রনিক। তখন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। রনিক ওই বৃষ্টির মধ্যেই মোবাইলে নোনার বাড়ির ফটো তুলছিল, বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চারটে গাড়ির নাম্বার প্লেটের ফটো তুলছিল।

ফটো তোলা শুরু করার আগে রনিক দেখে নিয়েছিল যে, আশেপাশে কেউ নেই। কিন্তু হঠাৎ-ই যেন মাটি ফুঁড়ে নোনার দুটো চ্যালা ওর সামনে হাজির হল। রনিক ধরা পড়ে গেল।

অল্পবিস্তর মারধোর করার পর ওকে দোতলায় নোনার ড্রয়িংরুমে নিয়ে যাওয়া হল। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর একজন শাগরেদ ওকে আবছা চিনতে পারল। তারপর সাউথ সিটি মলের ফটোগ্রাফের ফোল্ডারগুলো একে-একে চেক করতেই ওর পুরোনো ফটোটা খুঁজে পাওয়া গেল।

এরপর যা হওয়া উচিত তাই হল। সোজা 'লটারি' রুম। এবং শুরু হয়ে গেল 'ভগবানের লটারি'।

রনিকের ভেতর একটা অদ্ভুত টেনশন হচ্ছিল। ও দুরুদুরু বুকে আসল মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করছিল। তিতিয়ার মৃত্যুর প্রতিশোধের গল্প তা হলে এভাবেই শেষ হবে?

ওর সামনে বেদিটা ধীরে-ধীরে ঘুরছিল। তার ওপরে রাখা ট্রে-টা সাদা টেবলক্লথে ঢাকা। তার একদিকে সুতো দিয়ে আঁকা গোলাপফুল আর পাতা। বেদির একদিকে রনিক—নীল পলিথিনের ওপরে দাঁড়িয়ে। আর বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে নোনা। ওর পায়ের নীচেও নীল পলিথিন।

বিল্লু সুইচ টিপে ঘুরন্ত বেদিকে থামাল। কাচার ট্রে-র ওপর থেকে কাপড়ে ঢাকনাটা সরিয়ে নিল।

একইরকম দেখতে দুটো রিভলভার—একটা রনিকের দিকে, একটা নোনার দিকে।

ওপরদিকে মুখ তুলে তিনবার ওপরওয়ালাকে নমস্কার জানাল নোনা। মা-কালীর ফটোর দিকে তাকিয়ে একবার চোখ বুজল।

একটা রিভলভার তুলে নিল নোনা। নিজের ডানরগে ঠেকাল। ওর চোখ-মুখ শান্ত। আত্মবিশ্বাসের ছোঁওয়া এখনও লেগে আছে মুখে।

নোনা চোখ বুজে ট্রিগার টিপল।

এবং গুলির শব্দে গোটা ঘর থরথর করে কেঁপে উঠল। এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ায় নোনার দু-চোখ খুলে গেল। ওর শরীরটা দু-এক সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পড়ে গেল নীল পলিথিনের ওপর।

ততক্ষণে পলিথিন ওর রক্ত আর ঘিলুতে নোংরা হয়ে গেছে।

ঘটনার পর এক সপ্তাহ কেটে গেছে।

দক্ষিণ কলকাতার একটা কফিশপে মুখোমুখি বসে আছে রেখা আর রনিক। ওদের সামনে স্যান্ডউইচ আর কফি।

রেখা আজ খুব সেজে এসেছে।

কপালের ছোট্ট টিপ সেই সাজকে পূর্ণতা দিয়েছে।

রনিক রেখার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাউথ সিটি মলের সেই শাড়ির দোকানে দেখা হওয়ার পর...এতদিন পর...আবার আমাদের দেখা হল।'

রেখা হাসল ঃ 'হ্যাঁ। যখন আমাদের আর কোনও ভয়-টয় নেই..।'

'ওঃ! সেদিন রাতে ওই "লটারি" রুমে পলিথিনের ওপরে দাঁড়িয়ে যা ভয়টা পেয়েছিলাম! মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, বুক ধুকধুক করছিল...।'

'সেটা কেন? আমার ওপরে ভরসা রাখতে পারোনি? রেখা হাসল।

'না, তা না..।'

'নোনার কায়দাটা আমি বহুদিন ধরেই জানতাম। নকল লটারির খেলা খেলে খুনের দায়টা ভগবানের ঘাড়ে চাপানো—।' কফিতে চুমুক দিল রেখা। স্যান্ডউইচে কামড় বসাল। তারপর ঃ 'তোমাকে কায়দাটা আমি বলিনি...বললে পরে মুশকিল হত। লটারির সময় তোমার মুখের চেহারা দেখে নোনা সব ধরে ফেলত। বুঝে যেত যে, তুমি ইচ্ছে করে ওদের হাতে ধরা দিয়েছ—যাতে তোমাকে নিয়ে ও লটারি খেলে...।'

রনিক রেখার দিকে তাকিয়ে রইল, অপেক্ষা করতে লাগল।

'নোনার প্যাঁচটা ছিল রিভলভারের ট্রে-র ওপরে ঢাকা দেওয়ার যে-টেবিল-ক্লথটা, তার মধ্যে—।'

'মানে?'

'দাঁড়াও—বুঝিয়ে বলছি। লম্বাটে ট্রে-র একদিকে থাকত খালি রিভলভার, আর অন্যদিকে ভরতি রিভলভার। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, টেবিল-ক্লথটার একদিকে গোলাপফুল আর পাতা আঁকা ছিল—অন্যদিকটা ছিল ফাঁকা। ট্রে-টা ঢাকা দেওয়ার সময় নোনা গোলাপফুলের ডিজাইনটা খালি রিভলভারের দিকে রাখত। তাই ট্রে বেদিতে রাখার পর বেদি যতই ঘুরুক খালি বন্দুকটা বেছে নিতে 'নোনার একটুও ভুল হত না।'

'ভুল হল শুধু আমার বেলায়—।'

'হ্যাঁ। কারণ, নোনা টেবিল-ক্লথ ঢাকা দিয়ে ট্রে সাজানোর পর আমি ওকে লুকিয়ে টেবিল-ক্লথটাকে উলটে দিয়েছিলাম। যাতে গোলাপফুলের নকশাটা থাকে ভরতি রিভলভারের দিকে। তারপর যা হওয়ার তাই হয়েছে—।'

কফির কাপে চুমুক দিল রেখা।

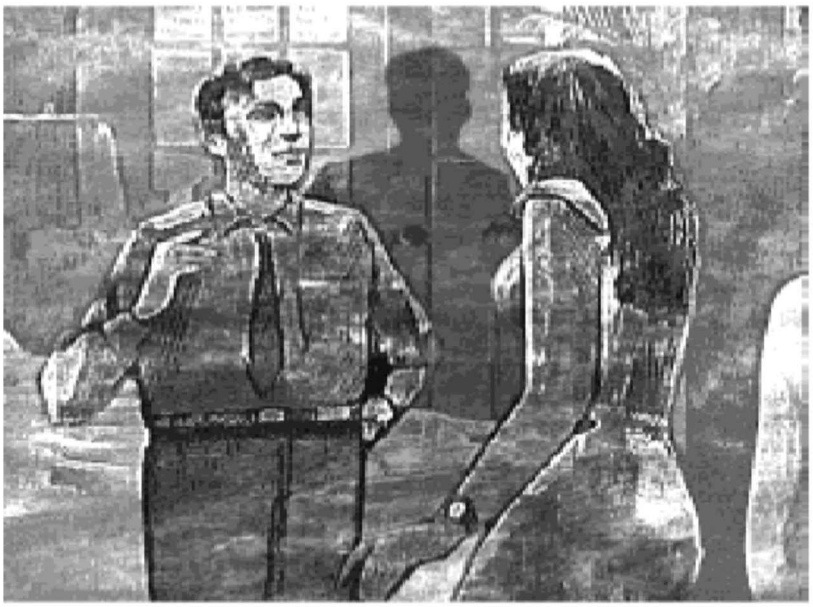

কে কোথায় যায়

আরভিন গ্লাসে চুমুক দিয়ে মাথা পিছনদিকে হেলিয়ে মাঝারি ঢঙে হেসে উঠল। তারপর শিনির দিকে আধখোলা চোখে তাকিয়ে বলল, 'শিনি, টেলিপোর্টেশান ব্যাপারটা তুমি এখনও হয়তো আইডিয়া করতে পারছ না। বিকজ, তুমি সায়েন্স নিয়ে পড়োনি। তা ছাড়া জ্ঞানীগুণী লোকজন বলে থাকেন, সৌন্দর্যের সঙ্গে আই. কিউ. ইন্‌ভার্সলি প্রোপোরশন্যাল —মানে, তুমি যত সুন্দর হবে তোমার বুদ্ধি-টুদ্ধি ততই নিম্নগামী হবে...।'

বেশ নাম-টামওয়ালা বিজ্ঞানী বলে আরভিনের হেভি ঘ্যাম। সবসময়েই ওর পকেটে দেশ-বিদেশের প্লেনের টিকিট। সারা বছরই পৃথিবীর যত্রতত্র ওর লেকচার দিয়ে বেড়ানোর অ্যাসাইনমেন্ট। দু-মাস আগেই ওর আবিষ্কার করা 'টেলিপোর্টেশান থিয়োরি' নিয়ে বিজ্ঞানের দুনিয়ায় ব্যাপক হইচই হয়ে গেছে। ও এখন পৃথিবীর প্রথম সারির একজন স্পেস-টাইম সায়েন্টিস্ট।

আরভিনের খোঁচা দেওয়া কথা শোনা শিনির অভ্যেস আছে। একসময় আরভিন শিনিকে পাগলের মতো চাইত। কিন্তু শিনির দিক থেকে সেরকম কোনও চাওয়ার ব্যাপার ছিল না। ও সেটা আরভিনকে বহুবার বোঝাতে চেষ্টা করেছে, ভালোবাসটা এখনও পর্যন্ত কোনও সায়েন্সের থিয়োরির আন্ডারে যায়নি। ভালোবাসার ক্ষেত্রে 'প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে' তত্ত্বটা খাটে না। কিন্তু সায়েন্টিস্ট আরভিন সেটা বুঝলে তো!

শিনি সবসময় আমার সঙ্গে সময় কাটাতে চাইত। কেন কে জানে! আমি পড়াশোনায় গঙ্গারাম। দেখতেও নিতান্ত মামুলি। তবে কবিতা লিখতে ভালোবাসি। কবিতা লিখে বেশ একটু নাম-টাম হয়েছে। তবে আরভিনের সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই হয় না। আরভিন ইন্টারন্যাশনাল সেলিব্রিটি। কিন্তু এসব কথা সত্যি হওয়া সত্ত্বেও শিনি আমার সঙ্গে লিভ-ইন করে। আমরা একটা লাভ বার্ড পেয়ার।

শিনি আরভিনের কথা শুনে হাসল। আমার হাতটা ওর বুকের কাছে টেনে নিয়ে আরভিনের বুকের জ্বালা বাড়িয়ে দিতে চাইল। তারপর ঠাট্টার গলায় বলল, 'তোমার ঊর্ধ্বগামী আই.কিউ. দিয়ে ব্যাপারটা এই দুই হাঁদাকে একটু বুঝিয়ে দাও—।'

আমি শিনির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ওকে দেখলেই নানান রকমের ভালোবাসা জেগে ওঠে মনে। শরীরেও।

কী একটা ইম্‌পালসে আমি ঝুঁকে পড়লাম শিনির দিকে। ওর গালে, ঠোঁটে পরপর দুটো চুমু খেলাম। চাপা গলায় বললাম, 'আই লাভ ইউ, লাভ্‌লি।'

শিনি হাসল।

হঠাৎই খেয়াল করলাম, আরভিন ঠান্ডা চোখে আমাকে দেখছে। আচ্ছা, এখনও কি আমাকে হিংসে না করলেই নয়।

আরভিন ওর চাউনির মতোই ঠান্ডা গলায় বলল, 'রোমান, তোকে আর শিনিকে এসব ডেমো দেওয়ার জন্যে আমার ল্যাবে ডাকিনি। আমার "টেলিপোর্টেশান থিয়োরি"-র ওপরে বেস করে একটা মেশিন আমি তৈরি করেছি। টেলিপোর্টেশান মেশিনের প্রোটোটাইপ মডেল। ওই যে, ওখানটায় রাখা আছে। ওটার ডেমো দেখাব বলে তোদের আজ ডেকেছি। তবে শুধু দেখা নয়, তার সঙ্গে অন্য একটা কাজ আছে।'

একটু দূরে একটা ওয়ার্ক-টেব্‌লের কাছে একটা প্রকাণ্ড হিজিবিজি মেশিন দাঁড়িয়েছিল। তার গাদা-গাদা কম্পোনেন্ট আর গাদা-গাদা মেকানিক্যাল পার্টস। মেশিনটার বিশাল জটপাকানো চেহারা দেখেই মনে ভয় ধরে যায়। মেশিনের গায়ে লাগানো রয়েছে বেশ বড় মাপের কন্ট্রোল প্যানেল। তাতে সারি-সারি পুশ্‌বাট্‌ন আর ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প। প্যানেলের মাথায় ইংরেজিতে লেখা ঃ 'কিপ সেফ ডিসট্যান্স।'

'রোমান, শিনি—প্লিজ, মন দিয়ে শোনো। ওই মেশিনটার ইনপুট চেম্বারে

কোনও জিনিস রেখে সেটাকে অন্য কোনও জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া যায়। এর ফান্ডাটা হল, প্রথমে ম্যাটারকে এনার্জিতে কনভার্ট করা হয়। তারপর সেই এনার্জিকে লাইটের স্পিডে—মানে, থ্রি ইনটু টেন টু দ্য পাওয়ার ফাইভ কিলোমিটার পার সেকেন্ড ভেলোসিটিতে অন্য কোনও জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমার টি-মেশিন, মানে, টেলিপোর্টেশান মেশিনের সেটিং অনুযায়ী সেই স্পেসিফিক জায়গায় পৌঁছে এনার্জি আবার রি-কনভার্ট হয়ে যায় ম্যাটারে। ফলে জিনিসটা আলোর স্পিডে পৌঁছে যায় আর-এক জায়গায়—অর্থাৎ, টেলিপোর্টেশান। মেশিনটা ফাংশান করতে প্রচুর এনার্জি নেয়। তাই হাজার মেগা ওয়াটের একটা স্পেশাল ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটার মেশিনটার সঙ্গে কানেক্ট করা আছে।' শিনির দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা হাসল আরভিন ঃ 'বলো এবার, আমার উর্দ্ধগামী আই.কিউ. দিয়ে আমি কি ব্যাপারটা দুই হাঁদাকে একটু-আধটু বোঝাতে পেরেছি?'

শিনি ঘাড় কাত করে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, পেরেছ। তা এবার আমাদের কী করতে হবে?'

আরভিনের ল্যাবরেটরিটা মাপে এত বড় যে, ওটার কোনও শেষ আছে বলে বোঝা যায় না। ল্যাবরেটরির একপাশে অফিস কাম ড্রয়িংরুম। কোথাও কোনও পার্টিশান নেই। তাই আমি আর শিনি ড্রয়িং স্পেসে বসেই গোটা ল্যাবটা দেখতে পাচ্ছিলাম—সেইসঙ্গে ওই টেলিপোর্টেশান মেশিনটা। আরভিন আমাদের নেমন্তন্ন করেছে মেশিনের ডেমো দেখাবে বলে, সেইসঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার নেমন্তন্নও। খাওয়াদাওয়া ব্যাপারটা শেষ হয়েছে। আমরা সামনে ফ্রেশ লাইমের গ্লাস নিয়ে বসে আছি। মাঝে-মাঝে গ্লাসে আরামের চুমুক দিচ্ছি।

কিন্তু টি-মেশিনের ডেমোটা এখনও বাকি।

'চল, মেশিনটার কাছে যাই—' হাত নেড়ে আমাদের ডাকল আরভিন। আমরা তিনজনে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম মেশিনটার দিকে।

আমি আর শিনি হাঁ করে টি-মেশিনটা দেখতে লাগলাম।

এক কথায় যাকে বলে অ'সাম।

'আমার মেশিনে ইনপুট চেম্বার আছে দুটো—একটা ছোট ক্যাপসুল—তার ভেতরে শুধু একটা টেবিল রাখা আছে। টেবিলে কোনও অবজেক্ট রেখে কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপে ঠিকঠাকভাবে অপারেট করলে ওই ক্যাপসুলটা, মানে, ইনপুট চেম্বারটা অন্য কোনও জায়গায় টেলিপোর্ট হয়ে

যাবে। যাতে টেবিলে রাখা জিনিসটাকে সবসময় দেখা যায় সেইজন্যে চেম্বারের দেওয়ালগুলো হাই কোয়ালিটি কাচের মতো ট্রান্সপারেন্ট। ওই যে—' আঙুল তুলে দেখাল আরভিন।

হ্যাঁ, দেখলাম। মেশিনটার বাঁ-দিকে রয়েছে ঘনকের মতো একটা স্বচ্ছ কিউবিক্‌ল—তার এক-একটা সাইড ফুটচারেক হবে। তার ভেতরে রাখা আছে একটা ছোট কিউট টেবিল।

'এবারে ডানদিকে তাকিয়ে দ্যাখ—' কথা বলতে-বলতে কী একটা বোতাম টিপল আরভিন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা পরদা সরে গেল। দেখা গেল একটা বেশ বড় মাপের ক্যাপসুল। স্বচ্ছ দেওয়াল দিয়ে তৈরি ছোটখাটো একটা স্টুডিয়ো ফ্ল্যাট যেন। সহজ-সরলভাবে সাজানা।

আরভিন হেসে বলল, 'এটা হল সেকেন্ড ইনপুট চেম্বার—হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশানের জন্য তৈরি করেছি। তবে এই চেম্বারদুটোর দেওয়াল কাচের তৈরি বলে ভাবিস না। এই ওয়ালগুলো অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে। এর মেটিরিয়ালটা অক্টাগন্যাল চেইন স্ট্রাকচারের একটা পলিমার, যার এক্সপ্যান্‌শন বা কমপ্রেশন খুবই নগণ্য, এবং যেটা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের ভ্যারিয়েশান হেলফেলা করে সইতে পারে। কারণ, টেলিপোর্টেশানের পর ওটা কোন এনভায়রনমেন্টে যাবে কে জানে!

'ছোটখাটো মেটিরিয়াল অবজেক্ট দিয়ে আমি মেশিনটা টেস্ট করেছি। তাতে রিজনেব্‌ল রেজাল্ট পেয়েছি...' মেশিনের দিকে আঙুল দেখিয়ে আরভিন বলতে লাগল, 'তারপর লিভিং অবজেক্ট নিয়েছি—লাইক ইঁদুর, গিনিপিগ, খরগোশ, বেড়াল, এমনকী একটা বড়সড় ডালমেশিয়ান কুকুর পর্যন্ত। সবক'টা টেস্ট-ই সাকসেসফুল! অল দ্য অ্যানিম্যাল্‌স কেম ব্যাক হেল্‌দি। আই অ্যাম সো হ্যাপি! রিসার্চে সাক্‌সেসফুল হওয়াটা একটা দারুণ ব্যাপার। বাট কাউকে আমি মেশিনটার কথা বলিনি, এইসব টেস্টের কথাও বলিনি। আর মিডিয়া? মিডিয়াকে জানানোর তো কোনও প্রশ্নই নেই! সবসময় ওরা তিলকে তাল করে ছাড়ে। যাকগে, বাদ দে ওসব কথা। আয় এবারে তোদের ছোট্ট একটা ডেমো দেখাই...।'

ছোট ক্যাপসুলটার কাছে গেল আরভিন। ওর বুকপকেটে সোনালি রঙের একটা ফাউন্টেন পেন ছিল। সেটা হাতে নিয়ে ক্যাপসুলের ভেতরে হাত বাড়িয়ে টেবিলটার ওপরে রাখল। তারপর কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে এসে

একটা বোতাম টিপতেই চেম্বারের দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

'শিনি, এবার মন দিয়ে লক্ষ করো। রোমান, তুইও পেনটার দিকে ভালো করে নজর রাখ। আমি এখন এই ছোট ইনপুট চেম্বারটাকে ওই টেবিল আর পেনসমেত ল্যাবরেটরির শেষের ওই ফাঁকা জায়গাটায় পাঠিয়ে দেব। ও কে? ওয়াচ। ওয়ান, টু, থ্রি—।' কন্ট্রোল প্যানেলের কয়েকটা বোতাম টিপল আরভিন।

আশ্চর্য! আমাদের চোখের সামনে ছোট ইনপুট চেম্বারটা ধীরে-ধীরে ঝাপসা হয়ে একেবারে হান্ড্রেড পারসেন্ট মিলিয়ে গেল।

আরভিন আমার আর শিনির দিকে তাকিয়ে হাসল। পেশাদার ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে বাও করে বলল, 'ভ্যানিশ। টেলিপোর্টেশান।' একটু থেমে তারপর বলল, 'এবার ল্যাবের এন্ডের ওই ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাক...।'

আমরা তাকিয়ে রইলাম।

মিনিট চার-পাঁচ পরেই দেখলাম ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া ইনপুট চেম্বারটা ল্যাবের শেষের ফাঁকা জায়গাটায় নাস্তি থেকে ধীরে-ধীরে অস্তি হয়ে উঠল।

আশ্চর্য!

আমি আরভিনের কাছে গিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরলাম ঃ 'কনগ্র্যাচুলেশান্স, আরভিন—তুই সত্যি-সত্যিই একজন ঘ্যাম 'সায়েন্টিস্ট।'

'শিনি, তোমার ওপিনিয়ানটা যদি একটু বলো...।' আরভিন শিনির দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল।

'আমি বিজ্ঞান-টিগ্যান অত না বুঝলেও এটুকু বুঝতে পারছি, ইতিহাসে তোমার জায়গা বাঁধা। নোবেল প্রাইজ তোমরা জন্যে যথেষ্ট নয়...।' একটু চুপ করে থেকে শিনি আবার বলল, 'বাট তোমার এই আশ্চর্য ইন্‌ভেন্‌শান তুমি এখনও সিক্রেট রেখেছ কেন? লেট দ্য ওয়ার্ল্ড নো অ্যাবাউট ইট—।'

'তুমি ঠিক বলেছ, শিনি। কিন্তু মিডিয়াকে আমি জানাতে চাই না। এই সাকসেসফুল এক্সপিরেমেন্টের মর্ম বোঝার পক্ষে ওরা বড্ড মূর্খ। তবে সায়েন্টিস্টদের এই আবিষ্কারের কথা আমি জানাব। তোমার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, তাঁদের কাছে এই আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা কেন আমি এখনও সিক্রেট রেখেছি।' রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠল আরভিনের ঠোটে ঃ 'সিক্রেট রেখেছি কারণ আমি এখনও কোনও মানুষ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখিনি। তবে আমি জানি, সেই টেস্টও হান্ড্রেড পারসেন্ট সাক্‌সেসফুল হবে। ইয়েস,

আই অ্যাম শিয়োর অফ ইট।' খুশিতে হাতে হাত ঘষল আরভিন ঃ 'তখন—তখন আমি সারা পৃথিবীকে আমার এই আশ্চর্য টেলিপোর্টেশান মেশিনটার কথা জানাব। তখন কেমন হবে বল?' জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে শেষের প্রশ্নটা করল আরভিন। ওর মুখে খুশিতে টগবগে এক শিশু ছায়া ফেলেছে।

আমি ওর পিঠে আলতো একটা চাপড় মেরে বললাম, তোর এই আর্থ শ্যাটারিং ইনভেন্‌শানের কথা শুনে সারা দুনিয়া চমকে উঠবে। তোকে নিয়ে শোরগোল পড়ে যাবে। সবাই তোকে সংবর্ধনা দেবে, অ্যাওয়ার্ড দেবে, এছাড়া সামনের বছরের নোবেল প্রাইজটাও এখন থেকেই তোর নামে লেখা হয়ে যাবে। আর শিনি যেমন বলল, ইতিহাসের পাতায় তোর নাম উঠে যাবে...।'

'যদি আমি আমার ফাইনাল লেভেল এক্সপেরিমেন্টে সাকসেসফুল হই তা হলে তোদের নামও থাকবে আমার পাশাপাশি—আমরা তিনজনে ইতিহাসে জায়গা করে নেব।'

'কীসব হাবিজাবি বলছ, আরভিন!' শিনি চোখ বড়-বড় করে মন্তব্য করল, 'আমাদের নাম তোমার সঙ্গে জড়াচ্ছে কেমন করে?'

হাসল আরভিন ঃ 'এই যে ইতিহাসের পাতায় তোমাদের নাম তোলার ব্যবস্থা করব, এটা আমার তরফ থেকে একটা গিফ্‌ট, শিনি—তোমার জন্যে—তোমাদের জন্যে।' শিনির কাছে এগিয়ে এল আরভিন। পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল শিনির দিকে। তারপর বলল, 'মনে আছে, সুন্দরী, তুমি আমার কাছ থেকে কখনও কোনও গিফ্‌ট অ্যাকসেপ্ট করোনি—রোমানের থেকে করেছ। সে যাক্‌গে—আই ডোন্ট মাইন্ড।

মাইন্ড যদি করতাম তা হলে তোমার আর রোমানের সঙ্গে এত সুন্দর বন্ধুত্ব কি মেইনটেইন করতে পারতাম? ওঃ, কাম অন, শিনি। ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দিস গিফ্‌ট। তোমরা দুজন এই টি-মেশিনের দু-নম্বর ক্যাপসুলে, মানে, বড় ইনপুট চেম্বারে ঢুকবে। তোমাদের টেলিপোর্ট করব আমি। তোমরাই হবে আমার মেশিনে টেলিপোর্ট করা প্রথম মানুষ। অ্যান্ড সো ইউ টু উইল মেক হিস্ট্রি—।' কথা শেষ করে আনন্দে হাততালি দিল আরভিন।

শিনি একটু ভয় পেয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখে আরভিন বলল, 'কোনও ভয় নেই। ডোন্ট উয়ারি, বেবি। তোমরা কিচ্ছু টের পাবে না। তোমাদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগবে না। ওই পেনটার মতো। এবারে এসো,

ইনপুট চেম্বারে ঢোকো। এসো—।'

আমি মাথা নাড়লাম ঃ 'না, আরভিন, সরি। আমি আর শিনি তোমার এক্সপেরিমেন্টের গিনিপিগ হতে পারব না। শিনি, চলে এসো। উই আর লিভিং—।'

শিনির হাত ধরে রওনা হওয়ার আগেই আরভিন বাজে ভাবে হাসল। পকেট থেকে একটা ছোট্ট লেসার গান বের করে বলল, 'নো, রোমান, ইউ আর নট লিভিং। আমি চাই তোমরা দুজনেই ইতিহাসের পাতায় ঢুকে পড়ো। এবারে এসো, ইনপুট চেম্বারে ঢোকো...।'

শিনির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ভয় পাওয়া চোখে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমি তখন ডানদিকের ইনপুট চেম্বারটার দিকে তাকিয়ে আছি।

আরভিন টি-মেশিনের কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর চোখ-মুখের মরিয়া ভাব আমার মোটেই ভালো ঠেকছিল না। এইসব বিজ্ঞান ঘেঁটে-ঘেঁটে ও কি অ্যাবনরম্যাল হয়ে গেছে?

'আরভিন, তুই কিন্তু এভাবে আমাদের ফোর্স করতে পারিস না। ইট ইজ এগেইন্স্ট দ্য ল'...।' আমি ওকে হাত নেড়ে বোঝাতে চাইলাম।

'টু হেল উইথ ইয়োর ল'। কে আর জানতে যাচ্ছে! তা ছাড়া তোদের তো আমি চার ঘণ্টা কি পাঁচ ঘণ্টার জন্যে অন্য জায়গায় পাঠাব। কোনও ভয় নেই। অন্য জায়গা মানে আমার ল্যাবের একেবারে শেষের ওই ফাঁকা জায়গাটাতে...ওই যে। এবার নে—ঢুকে পড় এই ক্যাপসুলে...।' লেসার গানটা নাচাল আরভিন।

শিনি হঠাৎ আরভিনের কাছে এগিয়ে গেল। আমাকে আড়াল করে দাঁড়াল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'আরভিন, আরভিন, তুমি কি পারবে ওই লেসার গান দিয়ে আমাকে শুট করতে? বলো, পারবে?'

আরভিন হাসল ঃ 'খুব পারব। তবে ঠিক-ই, দু-বছর আগে হলে পারতাম না—।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই ও খুব রাফভাবে ধাক্কা মারল শিনিকে। ক্যাপসুলের দরজা খোলা ছিল—শিনি সেই ধাক্কার চোটে ক্যাপসুলের ভেতরে গিয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

শিনির শরীরের ধাক্কায় আমি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলাম,

আরভিনের জামার হাতা খামচে ধরে কোনওরকমে সামলে নিলাম।

আরভিন 'গো টু হেল!' বলে আমাকে ক্যাপসুলের দরজা লক্ষ করে প্রচণ্ড জোরে এক ধাক্কা মারল। আমি পেছনদিকে পড়ে যেতে-যেতে আরভিনকে ডানপায়ে এক লাথি মারলাম। নিউটনের তিন নম্বর সূত্রের ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার নিয়ম মেনে আমরা দুজনে দু-দিকে ছিটকে পড়লাম।

আমি পড়লাম ইনপুট চেম্বারের ভেতরে, আর আরভিন হুমড়ি খেয়ে পড়ল কন্ট্রোল প্যানেলের একগাদা পুশবাট্‌ন আর ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পের ওপরে। ওর দু-হাতের দশ আঙুল বিশেষ কয়েকটা পুশবাট্‌ন টেপার চেষ্টায় প্যানেলের ওপরে এলোমেলোভাবে হাতড়াতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে ওর শরীরের ভারে বেশ কয়েকটা উলটোপালটা বোতামে চাপ পড়ে গেছে।

আমাদের ক্যাপসুলের দরজা পলকে বন্ধ হয়ে গেল। আর দেখলাম, নীল বিদ্যুৎ জ্যান্ত সাপ হয়ে খেলে বেড়াচ্ছে আরভিনের শরীরে।

কোনও শব্দ ক্যাপসুলের ভেতরে না ঢুকলেও আরভিনের বিকৃত হয়ে যাওয়া বীভৎস মুখ স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছিল ও ভয়ে আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। ওর গায়ে ততক্ষণে আগুন ধরে গেছে।

আমার কান ভোঁ-ভোঁ করছিল। মাথার ভেতরে জ্বালা করতে লাগল। চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে এল।

কথা বলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু জিভটা যেন সিসের তৈরি।

শিনির দিকে তাকিয়ে দেখি ওরও কেমন বেসামাল অবস্থা।

আমি চিৎকার করে উঠতে চাইলাম, 'শিনি! শিনি!' কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোল না। সব ঝাপসা, ঝাপসা, আরও ঝাপসা...।

এর-ই নাম কি টেলিপোর্টেশান?

উন্মাদ আরভিন কোথায় পাঠিয়ে দিল আমাদের? ক'ঘণ্টার জন্যে? ক'দিনের জন্যে? নাকি কয়েক মাস কিংবা বছরের জন্যে?

হে ভগবান!

একসময় চারপাশের ঝাপসা আবরণ পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখলাম, আমি আর শিনি ক্যাপসুলের ভেতরে বিছানায় জড়াজড়ি করে শুয়ে আছি। মাথা ঝিমঝিম করছে, শরীরটা কী অদ্ভুত হালকা লাগছে।

কোথায় চলে এসেছি আমরা!

শিনিকে ডাকলাম, 'শিনি! শিনি!'

'উঁ—' ঘুম জড়ানো গলায় ও জবাব দিল।

আমি ওকে ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। আবার ডাকলাম, 'ওঠো! ওঠো! আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে...চলো...।'

ঝাঁকুনি দেওয়ার সময় শিনিকে কেমন হালকা লাগল।

আমি বিছানা থেকে মেঝেতে নামলাম। নেমে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ব্যালান্সের গোলমাল হয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। পাশে রাখা একটা টি টেবিল ধরে সামলে নিতে চাইলাম। টেবিলটা কাত হয়ে যেতেই টেবিলে রাখা একটা গ্লাস পড়ে গেল। আমি গ্লাসটার পড়ে যাওয়া দেখতে-দেখতে হতবাক হয়ে গেলাম।

গ্লাসটা পড়ছে তো পড়ছেই!

ঠিক যেন স্লো মোশানে সিনেমা দেখছি!

আমার হাঁ-হয়ে যাওয়া অবস্থা দেখে শিনি তাড়াহুড়ো করে বিছানা ছেড়ে নামল। কিন্তু নামার সঙ্গে-সঙ্গে বাউন্স করে শূন্যে কয়েক ইঞ্চি লাফিয়ে উঠল। আবার নীচে পড়ল। আবার ইঞ্চিখানেক শূন্যে উঠল। তারপর...।

'হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস?' শিনি।

'কোথায় এলাম আমরা? কোথায়? কোথায়?' আমি।

ক্যাপসুলের স্বচ্ছ দেওয়াল ভেদ করে বাইরে তাকালাম আমরা দুজনে।

ধূসর ধুলোময় প্রান্তর। তার জায়গায়-জায়গায় গর্ত আর খানাখন্দ। দিগন্ত পর্যন্ত শুধু শূন্যতা।

কালো আকাশে দেখা যাচ্ছে নীল রঙের একটা ভাঙা চাঁদ। আমরা দুজনে অবাক হয়ে সেই অদ্ভুত নীল চাঁদ দেখতে লাগলাম।

কিন্তু চাঁদ কি কখনও নীল রঙের হয়?

আমরা খুব সাবধানে ক্যাপসুলের এক দেওয়াল থেকে আর-এক দেওয়ালে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কারও মুখে কোনও কথা নেই। হাঁটার সময় কিছু একটা ধরে ব্যালান্স ঠিক রাখার চেষ্টা করছি, আর এইসব আজব ব্যাপার ডিকোড করার চেষ্টা করছি।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল একটা পতাকা। ক্যাপসুলের একটা দেওয়ালের খুব কাছেই। ওটা পুঁতে দেওয়া আছে রুক্ষ ধূসর মাটিতে।

পতাকাটা আমেরিকার। আর তার ফ্ল্যাগমাস্টের গোড়ায় বসানো রয়েছে একটা প্লেট। তাতে লেখা ঃ

নীল এ. আর্মস্ট্রং
এডুইন এ. অলড্রিন
২০ জুলাই, ১৯৬৯

এবারে সবকিছু বুঝতে পারলাম। হতাশায় আমার চোখে জল এসে গেল। গলার স্বর হারিয়ে গেল। আকাশে ভেসে থাকা নীল জ্যোতিষ্কটার দিকে অপলকে চেয়ে রইলাম।

শিনি পাশ থেকে বলে উঠল, 'কী ব্যাপার, রোমান? ওই নীল চাঁদটার দিকে হাঁ-করে চেয়ে আছ কেন?'

আমি কান্না চেপে রুদ্ধ কাঁপা গলায় ওকে বললাম, 'ওটা চাঁদ নয়, শিনি—ওটা আমাদের পৃথিবী...। চাঁদ এখন আমাদের পায়ের নীচে...।'

মাটির নীচে ভালোবাসা

আকাশে মেঘ দেখলেই মল্লিকার মন খারাপ হয়, আজ আবার তার সঙ্গে বৃষ্টি। জানলার গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে ও চুপচাপ বসে ছিল, বাইরের ভেজা গাছপালা দেখছিল আর রূপানের কথা ভাবছিল। ভাবতে-ভাবতে কখন যেন বিকেলের আলো ফুরিয়ে অন্ধকারে নেমে এসেছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি তখনও চলছে।

রূপান কী করছে এখন?

বকুলতলা চিলড্রেন্স পার্কের বাগানের ধারে বসে আছে? বসে-বসে বাগানের গাছগুলোকে দেখছে, যাতে ওরা বেশি ভিজে না যায়? রূপান তাকিয়ে থাকলেই কি গাছগুলো বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবে?

গাছ আর ফুলগাছ রূপানের প্রাণ। ও এমনভাবে চিলড্রেন্স পার্কের বাগানের গাছগুলোর যত্ন করে যেন ওরা রূপানের ভালোবাসার মানুষ। দিন-রাত ওইসব গাছ নিয়ে পড়ে আছে—এমনই গাছপাগল।

যেদিন চিলড্রেন্স পার্কে বেড়াতে গিয়ে রূপানের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় সেদিনই মানুষটা ওর দিকে তাকিয়ে কেমন নিষ্পাপভাবে বলেছিল, তোমাকে দেখতে খুব ফুটফুটে—চন্দ্রমল্লিকার মতন। শুধু 'মল্লিকা' তোমাকে মানায় না—।

মল্লিকার সঙ্গে আরও দু-বন্ধু ছিল—অরুণা আর শিরিন। ওরা সবাই সবে আঠেরো। ওরা মল্লিকাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলেছিল, চলে আয়। আগেই

শুনেছি এই বাগানের মালিটা একটু ক্রেজি টাইপের। তোকে দেখে আউট হয়ে গেছে...।

মালি! যে এত সুন্দর-সুন্দর ফুল ফোটায় তাকে কখনও স্রেফ 'মালি' বলে দুরছাই করা যায়!

তাই অরুণা আর শিরিনের কথাগুলো পাত্তা দেয়নি মল্লিকা। ও যেন চন্দ্রমল্লিকা হতে চেয়েছিল। তাই অনেক কথা বলেছিল রূপানের সঙ্গে। অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল ওকে।

মল্লিকাদের বাড়ি থেকেও দেখা যেত পার্কের ওই আশ্চর্য বাগানটা। ওটার গাছপালা আর ফুল সবসময় মল্লিকাকে টানত। ওর চন্দ্রমল্লিকা হয়ে যেতে ইচ্ছে করত। রূপানকে ও দেখত প্রাণভরে। রূপানের হাতের ছোঁয়ায় ও ফুল হয়ে ফুটে উঠতে চাইত।

পার্কে রূপানের সঙ্গে যখনই ওর দেখা হত রূপান বলত, চন্দ্রমল্লিকা, তোমার জন্যে আরও-আরও ফুল ফোটাতে ইচ্ছে করে—।

মল্লিকা রূপানের জামা থেকে পারফিউমের কড়া গন্ধ পেত। বুনো ফুলের গন্ধ। কী পারফিউম কে জানে! কিন্তু মল্লিকার ভালো লাগত।

রূপান ওকে মাঝে-মাঝেই একটা সাদা চন্দ্রমল্লিকা লুকিয়ে-লুকিয়ে উপহার দিত। সেটা হাতে নেওয়ার সময় মল্লিকার গায়ে কাঁটা দিত।

ভালোবাসার ব্যাপারটা বাড়িতে জানাজানি হওয়ামাত্রই তুলকালাম। বাবা, কাকা, জেঠা থেকে শুরু করে একান্নবর্তী পরিবারের একান্নজন বলতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল মল্লিকার ওপরে।

শেষ পর্যন্ত মালির সঙ্গে!

পরদিনই ওকে নিয়ে মা চলে গেল হরিনগরে, দেশের বাড়িতে। চন্দ্রমল্লিকা ফুলটা অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল, শুকিয়ে গেল।

তারপর থেকেই মল্লিকার শুধু কান্না আর মনখারাপ। বিষাদের একটা ঘোরের মধ্যে ও দিন কাটায়, রাত কাটায়। মায়ের কথা সবসময় কানে ঢোকে কি ঢোকে না। ও বসে থাকে এই জানলার সামনে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে বাইরের একচিলতে বাগানের দিকে, তার দু-চারটে গাছপালার দিকে।

হঠাৎই বৃষ্টি থেমে গেল। মেঘও সরে গেল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। অলৌকিক চাঁদের আলো ছড়িয়ে গেল যেখানে-সেখানে। গাছের পাতা

চিকচিক করতে লাগল। মল্লিকার চোখের জলও।

চাঁদের আলোয় গাছগুলোর ছায়া মাটিতে এলোমেলো লুটিয়ে পড়েছে। আনমনে সেদিকে তাকিয়ে ছিল মল্লিকা। হঠাৎই দেখল, ছায়ার কাটাকুটির ভেতর থেকে একটা ছায়া মাথা তুলে দাঁড়াল। বাতাসে পা ফেলে মল্লিকার জানলার দিকে খানিকটা এগিয়ে এল।

ফিসফিস করে ডেকে উঠল ছায়া ঃ 'চন্দ্রমল্লিকা!'

মল্লিকার গায়ে কাঁটা দিল। রূপান। এখানে কী করে এল ফুল-ফোটানো মানুষটা! মল্লিকার গলা বুজে এল আবেগে।

ছায়া-মানুষটা ফিসফিসে গলায় বলল, 'আমি এখন মাটির নীচে। কিন্তু সেখান থেকেও তোমায় ভালোবাসি...।'

মল্লিকা কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু জিভ পাথর।

ছায়াটা হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে দু-হাতে ভিজে মাটি খুঁড়তে লাগল। একটা গর্ত তৈরি হয়ে যেতে লাগল চটপট।

সেই গর্তে ঢুকে পড়ল ছায়াটা। মাটি খুঁড়তেই লাগল। গর্তের চারপাশে জমতে লাগল মাটির স্তূপ। ছায়াটা ক্রমে আড়াল হয়ে যেতে লাগল। দেখা যাচ্ছিল শুধু ওর ব্যস্ত হাত দুটো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেকে কবর দিয়ে ফেলল ছায়াটা। কিন্তু ওর লম্বা হাতদুটো আরও লম্বা হয়ে কবরের ওপরের মাটি থাপড়ে সমান করতে লাগল। মাটির ওপরে জেগে রইল শুধু দুটো লিকলিকে হাত। কাজ শেষ করে হাতদুটো এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরতে চাইছে।

হাতদুটোকে গাছ মনে হচ্ছিল মল্লিকার। তেমন করে কিছু না বুঝেই ও বাচ্চা মেয়ের মতো কাঁদতে লাগল। মা-কে কিছু বলতে পারল না।

পরদিন ভোরবেলা ঘর ছেড়ে ছুটে বাইরে এল মল্লিকা। আকাশে মুখ তোলা হাতদুটো এখন দুটো ছোট-ছোট গাছ। তাদের গায়ে দু-একটা ছোট্ট সবুজ পাতা। আর গাছ দুটোর গা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে বুনো ফুলের গন্ধ।

ঘরে ফিরে আসতেই মা জানাল, বকুলতলা পার্কের পাশ দিয়ে মেট্রো

রেলের টানেল খোঁড়া হয়েছিল। হঠাৎই ধস নেমে পার্কের অনেকটা জায়গা তলিয়ে গেছে। পার্কের একজন কর্মী বাগানে কাজ করছিল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ট্রেনের কামরায় দেখা লোকটা

ট্রেনের কামরায় লোকটাকে, মানে ভদ্রলোককে, প্রথম যখন দেখি তখন আমার একটু অবাক লেগেছিল। জানলার ধার ঘেঁষে বসে আছে, অথচ জানলা দিয়ে বাইরে একবারও তাকাচ্ছে না। চুপচাপ সামনের দিকে চেয়ে আছে। চোখের দৃষ্টিটা এমন যেন, দেখছে, অথচ কিছুই দেখছে না।

সম্প্রতি চাকরি বদল করায় আমি শিয়ালদা স্টেশনের নিত্যযাত্রীদের খাতায় নাম লিখিয়েছি। রোজ সকালে আমার টার্গেট সকাল আটটা দশের বজবজ লোকাল। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দেওয়ামাত্রই তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়ি। জানলার ধারে একটা সিট বেছে নিয়ে বসে পড়ি।

আমি সাধারণত হাওয়ার ঝাপটা এড়াতে ট্রেন যেদিকে যায় সেদিকে পিঠ দিয়ে বসি। প্রথম দিনও সেরকম একটা সিটে বসেছি। আর আমার মুখোমুখি বসেছে সেই ভদ্রলোক। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। আমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ আমাকে দেখছে না।

প্রথম দিন ওকে দেখার ব্যাপারটা হয়তো ভুলেই যেতাম যদি-না পরদিন ভদ্রলোককে আবার দেখতাম। এবং তার পরদিন আবার। এবং আবার।

আশ্চর্য ব্যাপার তো! আমি কি রোজই ভদ্রলোককে আমার মুখোমুখি সিটে দেখতে পাব? সে আমি যে-কামরাতেই উঠি না কেন!

লোকটার বয়েস আমারই মতো ষাট পেরোনো। মাথায় ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা চুল। গায়ের রং মাঝারি। রোগা চেহারা। চোখে পুরোনো ধাঁচের

কালো ফ্রেমের চশমা। গাল বসা। ঠোঁটের ওপরে অল্পবিস্তর কাঁচাপাকা গোঁফ। গাল আর থুতনিতে খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ি।

ভদ্রলোকের গায়ে নীল-কালো-সাদা চেক-চেক ডিজাইনের একটা শার্ট। আর পায়ে ছাই রঙের একটা প্যান্ট। জামা আর প্যান্ট দুটোরই অবস্থা বেশ ময়লা। দেখে মনে হয়, অনেকদিন সেগুলো কাচা হয়নি। ওর কাঁধে নীল রঙের কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ। ব্যাগটা জিনিসপত্রে বেশ ঠাসা।

ভদ্রলোকের চশমার যে বেশ পাওয়ার আছে সেটা কাচদুটোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

আমি ভদ্রলোককে মাঝে-মাঝে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, ওর নিত্যযাত্রার বয়েস বোধহয় অনেক বেশি। কারণ, ওর চোখমুখ এবং ভাবভঙ্গিতে কেমন যেন একটা পোড়খাওয়া ছাপ রয়েছে। তবে তার সঙ্গে মিশে রয়েছে হালকা ক্লান্তির প্রলেপ।

ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে গিয়ে রোজই লোকটিকে আমার মুখোমুখি সিটে দেখতে পেয়ে আমি বেশ অবাক হতাম। শুধু যে শিয়ালদা থেকে বজবজ যাওয়ার সময় অবাক হতাম তা নয়, বজবজ থেকে শিয়ালদার ট্রেন ধরার সময়েও আর-এক দফা তাজ্জব হতাম। চাকরি চুকিয়ে স্টেশনে আসতে-আসতে আমার পাঁচটা চল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ হয়ে যায়—বা কোনও-কোনও দিন আরও একটু দেরি। তাই আমাকে পাঁচটা বাহান্ন কিংবা ছ'টা বারোর ট্রেন ধরতে হয়। তবে আমি যে ট্রেন-ই ধরি না কেন, যে-কামরাতেই উঠি না কেন, জানলার ধারে বসে আছে সেই লোকটা। আমি রোজ জানলার ধারে সিট পাই বা না পাই লোকটা কিন্তু সবসময় জানলার পাশেই বসার জায়গাটি পায়।

এসব কাণ্ডকারখানায় আমি যতই অবাক হই না কেন, ভদ্রলোকের মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতাম, সে ছিটেফোঁটাও অবাক হয়নি। অবাক হওয়া তো দূরের কথা, ওর সেই স্ট্যান্ডার্ড ভাবলেশহীন মুখ, এবং চোখে সেই স্ট্যাডার্ড শূন্য উদাসীন দৃষ্টি। রোজ সকাল-বিকেল দেখে-দেখে আমার মুখটুকু যে অন্তত তার চেনা সেইরকম কোনও প্রতিক্রিয়ার একটি কণাও লোকটির মুখে ছায়া ফেলেনি।

আমার মনে হয়েছিল, লোকটি আমারই মতো বজবজে কোনও চাকরি-টাকরি করতে আসে। সকালে শিয়ালদা থেকে রওনা হয়, আবার বিকেলে কাজের শেষে বজবজ থেকে ব্যাক টু শিয়ালদা—বাড়ি ফেরার পালা।

কিন্তু আমার এই ভাবনাটাও ধাক্কা খেল একদিন।

অফিসে কাজের চাপ বেশি থাকায় একদিন ছুটি পেতে-পেতে ঘণ্টাখানেকের ওপর দেরি হয়ে গেল। বজবজ স্টেশনে যখন এলাম তখন প্রায় সাতটা কুড়ি বাজে। ঘড়ি দেখে বুঝলাম, আজ সাতটা আঠাশের ট্রেন ছাড়া গতি নেই।

প্ল্যাটফর্মে লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে। তারই মধ্যে দু-একটি চেনামুখ—আমার অফিস কলিগ। কেউ-কেউ কানে মোবাইল ফোন লাগিয়ে কথা বলছে। কেউ বা প্ল্যাটফর্মে ফলের পসরা সাজিয়ে বসা ফলওয়ালার থেকে ব্যস্তভাবে ফল কিনছে।

পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে অ্যানাউন্সমেন্ট শোনা গেল। ট্রেন স্টেশনে ঢুকছে। লোকজন চঞ্চল হয়ে উঠল।

একটু পরেই ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল। যাত্রীর ভিড়ে ট্রেন একেবারে টইটম্বুর। কিন্তু বজবজটাই শেষ স্টেশন। তাই ট্রেন খালি হতে শুরু করল। পিলপিল করে লোক নামতে লাগল। সবাই নেমে গেলে তারপর আমাদের ওঠার পালা। ট্রেন আবার রওনা হবে উলটোদিকে।

সুযোগ পেতেই একটা কামরায় উঠে বসলাম। জানলার ধারে একটা মনের মতো সিট পেয়ে বসে পড়লাম।

এবার তারপরই দেখি সেই লোকটা! আমার মুখোমুখি সিটে চুপচাপ বসে আছে। গায়ে একই জামা, একই প্যান্ট, আর কাঁধে সেই নীল রঙের ঝোলাব্যাগ। যখনই ওকে ট্রেনের কামরায় দেখেছি, সেই এক-ই পোশাক আর এক-ই ব্যাগ। কে জানে, হয়তো লোকটা খুব গরিব।

একটা কথা ভেবে আমার বেশ খটকা লাগছিল।

আমার না হয় আজ অফিস থেকে বেরোতে দেরি হয়েছে, কিন্তু এই লোকটারও কি তাই? আমার কাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কি ওর কাজের সময় ঠিক হয়? কী আশ্চর্য!

তাছাড়া লোকটা এই কামরায় উঠল কখন? আমি তো ওকে উঠতে দেখিনি! তা হলে কি ও আগে থেকেই এই কামরায় বসে ছিল? পার্ক সার্কাস, বালিগঞ্জের দিক থেকে বজবজ আসছিল?

তাই যদি হয় তা হলে ও বজবজে অফিস করল কখন?

নাকি বজবজে যে ওর অফিস বলে আমি আইডিয়া করেছি সেই আইডিয়াটাই ভুল?

ট্রেন চলতে শুরু করল। জানলার ঘোলাটে কাচ তোলা। হু-হু করে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। বাতাস লোকটার চোখে-মুখে ঝাপট মেরে পিছলে যাচ্ছে

এদিক-ওদিক। কিন্তু তাতে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং ওর পাশের মানুষটি কুঁকড়ে গেছে, গলায় একটা বাদামি রঙের মাফলার জড়িয়ে নিয়েছে।

দিনসাতেক হল বাতাসে বদল এসেছে, পাতা ঝারার সময় শুরু হয়ে গেছে। বিকেলের পর শীতের কড়া নাড়া দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছে—অথচ এই লোকটা কেমন উদাসীন। জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে।

তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। কোনও স্টেশন এলেই লোকটা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠছে। জানলা দিয়ে লোকজনের ওঠা-নামা দেখতে চেষ্টা করছে। জানলার রডের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে খুব মনোযোগে দেখতে চাইছে ট্রেনে কে উঠল, কে নামল।

তারপর, ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাওয়ার পর, গলা উঁচু করে কামরার দরজার কাছটা দেখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু কেন কে জানে!

ট্রেনে যাতায়াতের সময় আমি আশপাশের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করতে বা খুচরো কথাবার্তা বলতে একেবারেই ভালোবাসি না। বেশিরভাগ সময়েই একটা বই-টই হাতে নিয়ে তাতে মনোযোগ দিই। তবে ফেরার সময় ট্রেনে আলো কমজোরি থাকে বলে সেটা আর হয়ে ওঠে না। তাই খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি, আর জানলার কাচ নামানো থাকলে অন্ধকারের পটভূমিতে হালকা প্রতিবিম্ব দেখি।

কিন্তু আজ আমি লোকটাকে দেখতে লাগলাম। ওর চোখে-মুখে কেমন এক হতাশা আর বিষণ্ণতা ছেয়ে আছে। চোখের কোণও মন হল ভেজা। নাকি আমার কল্পনা?

আজ লোকটার সঙ্গে আমার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছিল।

টালিগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছিল। বেশ কিছু লোক নেমে গেল ট্রেন থেকে। দু-চারজন হয়তো উঠল—কে জানে!

লোকটার বিষাদ-মাখা চোখ উতলা হয়ে আবার কাউকে খুঁজল। তারপর খুঁজে না পেয়ে হতাশ হল, ক্লান্ত হল। একপলক আমার দিকে তাকাল, কিন্তু আমাকে দেখেও যেন দেখল না।

আমি আর থাকতে পারলাম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কাউকে খুঁজছেন?'

ধীরে-ধীরে আমার দিকে তাকাল। চোখ দুটো ফাঁকা মাঠের মতো—প্রাণের ছিটেফোঁটাও ছোঁওয়া নেই সেখানে।

তারপর মাথা নাড়ল ওপর-নীচে। বলল নীচু গলায়, 'হ্যাঁ, খুঁজছি—পাপিয়াকে খুঁজছি। এই লাইনের ট্রেনেই ওর ওঠার কথা ছিল। কেন যে এখনও আসছে না...।'

শেষ কথাটা আপনমনেই বলল—বিড়বিড় করে।

আমি মানুষটাকে আবার ভালো করে দেখলাম। কে পাপিয়া? ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সরাসরি জিগ্যেস করতেও কেমন বাধো-বাধো ঠেকছিল।

কৌতূহলের একটা ছায়া বোধহয় আমার মুখের পরদায় ধরা পড়েছিল। কারণ, লোকটা মরা মাছের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাবছেন, কে পাপিয়া—তাই না?'

আমি সংকোচের আড়াল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মাথা নেড়ে ইশারায় বললাম, হ্যাঁ—।

ট্রেনের কামরায় লোক কমে এসেছে। দু-চারটে বসার জায়গা এখন খালি। তা সত্ত্বেও তিনটে ছেলে কামরার ডানদিকের দরজায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে, হাসাহাসি করছে। দূরের জানলার কাছাকাছি দুজন ভদ্রলোক মোবাইল ফোনে কথা বলছে। একজন ফোনের ওপরে হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়ে এমনভাবে কথা বলছে যে, কেউ তার কোলে বসে থাকলেও কোনও কথা শুনতে পাবে না। ভদ্রলোকের ভঙ্গি দেখে হঠাৎ করে মনে হতে পারে, সে রাস্তার কোনও কল থেকে আঁজলা ভরে জল খাচ্ছে।

আর দ্বিতীয়জন? প্রথমজনের ঠিক উলটো—এমন গাঁকগাঁক করে কথা বলছে যেন জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছে। তার বউয়ের হাত থেকে গুড়ো সাবান উলটে পড়ে ঘরময় ছড়িয়ে গেছে। তার ওপর মেঝেতে আবার জল ছিল। তাই শৌহর ভদ্রলোক বউকে পরামর্শ দিচ্ছেন যে, 'সাবানটা নষ্ট হতে দিয়ো না। দু-চারটে ময়লা জামাকাপড় মেঝেতে ছড়িয়ে চট করে কেচে ফ্যালো।'

আমার মুখোমুখি বসা লোকটা এসব ব্যাপার এতটুকুও খেয়াল করছে বলে মনে হল না। বাইরের অন্ধকারের দিকে একবার দেখে নিয়ে মুখ মুছল। তারপর...।

জানেন, পাপিয়ার সব কথা বেশ পুরোনো হলেও মনে হয় যেন জাস্ট গতকালের ঘটনা। বুঝতেই পারছেন, আমার সঙ্গে ওর প্রেম-ভালোবাসা ছিল।

ওর বয়েস কতই বা হবে? ছাব্বিশ কি সাতাশ। আর আমার তখন হিসেবমতো একচল্লিশ। সাতাশ আর একচল্লিশ! চোদ্দো বছরের ডিফারেন্স। কিন্তু মনের কোনও ডিফারেন্স ছিল না। ও আমাকে ভালোবেসে ফেলল, আর আমি ওকে।

আমি থাকি কোথায়? এই তো এই ট্রেনে। কী বললেন? আমার বাড়ি কোথায় জানতে চাইছেন? ও—। আমার বাড়ি এই লাইনেই—আকড়া আর সন্তোষপুরের মাঝামাঝি—কমলগাছিতে। আমি বাজারের কাছে একটা অশথগাছের নীচে বসে জ্যোতিষীগিরি করতাম। সবটাই অ্যাক্টিং—লোকঠকানো বুজরুকি। কিন্তু ওই যে—পেটের জ্বালা বড় জ্বালা!

আমার বাবা চাষিবাসি মানুষ ছিল। চাষবাস করে কোনওরকমে আমাদের ফ্যামিলির দু-বেলা পেট চলত। কিন্তু একবছর আলুচাষে বাবা একেবারে ডাহা লস খেয়ে গেল। মহাজনের ঘরের দেনা মেটাতে পারল না। মনের দুঃখে রেললাইনে গিয়ে মাথা দিল। তারপর ট্রেন আসতে দেখে শেষমুহূর্তে ভয়-টয় পেয়ে কী মনে হয়েছিল কে জানে! লাইন থেকে উঠে পালাতে গিয়েছিল। কিন্তু কপাল খারাপ। লাইনের ওপরে উলটে পড়ে গেল। তখন ট্রেনটা একেবারে ঘাড়ের ওপরে এসে গেছে।

বাবার মাথা গেল না। গেল একটা পা—ডান পা—একেবারে হাঁটুর নীচ থেকে। তারপর ডাক্তার, হাসপাতাল, বোতল-বোতল রক্ত, অপারেশন। বাবা প্রাণে বাঁচল, তবে মরে বেঁচে রইল। দিন-রাত ওই কাটা পা-টার জন্যে মেয়েছেলের মতো ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদত। যেন খুব আদরের একটা জিনিস হঠাৎ করে খোয়া গেছে।

আমার মা ছিল রোগাসোগা ছোটখাটো মানুষ। বাড়িময় ঘুরঘুর করে বেড়ালেও কোনও আওয়াজ-টাওয়াজ পাওয়া যেত না। বাবা অকেজো হয়ে যাওয়ার পর মা মুখ বুজে স্বামীর সেবা করত।

এসব যখন হয়, তখন আমার বয়েস তেইশ। তখনও রোজগার-টোজগার করি না। লেখাপড়াও ছেড়ে দিয়েছি বেশকয়েক বছর হল।

বাবার অ্যাক্সিডেন্টের পর আমি কেমন যেন বেসামাল হয়ে গিয়েছিলাম। মাথার মধ্যে শুধু একটাই কথা ঘুরত ঃ যা হোক করে কিছু না কিছু ইনকাম করতে হবে।

জ্যোতিষের ব্যাপারে একটু ইন্টারেস্ট ছিল। দু-চারটে বই-টই পড়েও ফেলেছিলাম। তাছাড়া আমাদের এলাকায় একজন তান্ত্রিক ছিল—নরেনবাবা।

তাঁর কাছেও মাঝে-মধ্যে যেতাম। আমার হাত দেখিয়ে ভাগ্য জিগ্যেস করতাম। জানতে চাইতাম, কোনও চাকরি-বাকরি বা কাজ-টাজ পাব কি না। কারণ, চাষবাষের কাজ আমার ভালো লাগত না।

নরেনবাবা নানান কথা বলতেন—আমি সেগুলো মন দিয়ে শুনতাম। আর মনে-মনে টাকা ইনকামের একটা পথ খুঁজতাম। কারণ, রোজ রাতে বাবার ওই হারানো পায়ের জন্য ইনিয়েবিনিয়ে কান্না আমার কানে যেন বিষ ঢালত।

এইভাবে, পাগল-পাগল অবস্থায় দিন কাটছিল। তারপর একদিন—বাবার অ্যাক্সিডেন্টের ছ'মাসের মাথায়—আমি জ্যোতিষী হয়ে গেলাম। বাজারের কাছে একটা অশথগাছের তলায় লাল কাপড় পেতে বসতে শুরু করালম। পাখির 'ইয়ে' আর বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে সবুজ পলিথিনের একটা 'চাঁদোয়া' বানিয়ে নিয়েছিলাম।

আয়-টায় যে খুব একটা হবে সেটা ভাবিনি, কিন্তু হতে লাগল। আমি জ্যোতিষী সাজার জন্যে আলাদা কোনও ভেক ধরিনি, সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরেই বসতাম। তবে লাল কাপড়ের ওপরে সাজানো থাকত বারোটা কড়ি, ছোট পেতলের আসনে বসানো নারায়ণ শিলা, আর চারটে জ্যোতিষের বই। এছাড়া আমার কপালে থাকত চন্দনের টিপ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

প্রথম-প্রথম এলাকার চেনা লোকজন ঠাট্টা-টিটকিরি এসব করত, কিন্তু আমি কখ্খনও তার উত্তরে রাগি জবাব দিতাম না। হেসে মোলায়েম উত্তর দিতাম—কারণ, বাবার কষ্টের কথা মনে পড়ত, কাটা পায়ের কথা মনে পড়ত।

যখন খদ্দেরপাতি থাকত না তখন আমি চুপচাপ বসে জ্যোতিষশাস্ত্রের বইগুলো চর্চা করতাম। একইসঙ্গে ভাবতাম, আমি তো অন্যের ভাগ্য-টাগ্য দেখার চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার ভাগ্যে শেষপর্যন্ত কী আছে?

ধীরে-ধীরে টুকটাক করে লোকজন আসতে লাগল। কেউ-কেউ চেনা, কেউ বা অচেনা। আমি তাদের জন্মতারিখ জেনে নিয়ে কাগজে ছক কেটে নানান গ্রহের প্রভাব-টভাব বিচার করে ভালো-মন্দ বলতাম।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। আমার বয়েস বাড়তে লাগল। আমার দুটো ছোট ভাই ছিল, কিন্তু বড় হতেই ওরা অন্যরকম হয়ে গেল। জমিজমার ভাগাভাগি নিয়ে দিন-রাত আমার সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, ছোট মুখে বড়-বড় কথা। মা আর বাবার শরীরের তখন এমনই হালকা-পলকা অবস্থা যে, ওরা সেইসব চেঁচামেচি ঝগড়া শুধু চেয়ে-চেয়ে দ্যাখে আর কান দিয়ে শোনে—মুখে কোনও কথা বলে না, বলতে পারে না।

শেষপর্যন্ত আমি হাল ছেড়ে দিলাম। ওরা যা চায় সেইসব কাগজপত্রে সইসাবুদ করে দিলাম। ওরা একমাসের মধ্যে যার-যার হাঁড়ি আলাদা করে নিল। তারপর দু-বছরের মধ্যে জমি-টমি সব বেচেবুচে গ্রাম ছেড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

আমি রুগ্ন পা-কাটা বাবা আর নানান রোগব্যাধিতে কাবু জবুথবু মা-কে নিয়ে পড়ে রইলাম। রোজ অশথগাছের তলায় বসে থাকতাম আর ভাবতাম, সত্যি, কী বিচিত্র আমার ভাগ্য! জ্যোতিষীদের ভাগ্য কি এরকমই কানা-খোঁড়া হয়? অন্যের ভাগ্য আমি যা হোক কিছু বলছি, আন্দাজে ঢিল ছুড়ছি—অনেক সময় জায়গামতো সেটা লেগেও যাচ্ছে। অথচ নিজের বেলায়? তাই রোজ আমি অন্ধকার ভবিষ্যতের অন্দরে আমার ভাগ্যকে হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে বেড়াতাম।

দিনের পরে দিন গড়িয়ে যেতে লাগল। আমার পসার বাড়তে লাগল। তার সঙ্গে-সঙ্গে বয়েসও।

বেশ কিছু মানুষের ভবিষ্যতের শুভ-অশুভ আমার গণনার সঙ্গে মিলে যেতে লাগল। আবার অনেকের বেলায় কিছুই মিলল না। কিন্তু যাদের মিলেছে তারা আমার হয়ে পজেটিভ পাবলিসিটি করতে লাগল। ফলে আমার ওপরে চাপ বাড়তে লাগল, সেইসঙ্গে দাবিও। ভাগ্যবিচার ছাড়াও অনেক অদ্ভুত দাবি কিংবা আবদার আমার কাছে এসে পৌঁছোতে লাগল। যেমন, কারও বাড়ির পুবদিকের উঠোনে নিমগাছ লাগালেই সেটা একমাসের মধ্যে মরে যাচ্ছে। কারও বিয়ের পর আটবছর কেটে গেছে অথচ কোনও ছেলেপিলে হচ্ছে না। কারও আবার বাইশ বছরের ছেলে সাড়ে তিন মাস আগে ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে—এখনও পযন্ত কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কারও বাড়ির একটা ঘর ভুতুড়ে—সেটাকে তুকতাক করে ঝেড়ে শুদ্ধ করে দিতে হবে।

বুঝতেই পারছেন, এইসবও অলবিস্তর করতে হত আমাকে। কোনও-কোনও কেসে লাকিলি কাজ হচ্ছিল, আবার কতগুলোয় আমি ডাহা ফেল। এইভাবে জ্যোতিষী, ঝাড়ফুঁক আর তুকতাক মিলিয়ে মিশিয়ে আমার কাজ চলছিল। নাম-টামও একটু-আধটু ছড়িয়েছিল।

এইরকম একটা সময়ে পাপিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

কোঁকড়ানো চুল, ফরসা ছোটখাটো চেহারা। দেখতে বেশ ফুরফুরে। চড়ুই পাখির মতো চঞ্চল। সবসময়েই হাত-পা কিংবা মুখ কিছু একটা নাড়ছে।

আমার ওকে ভালো লেগে গেল।

পাপিয়া আমার কাছে এসেছিল ওর বাবা কেশবপতি আর দাদা মন্টুর সঙ্গে। কেশববাবুকে আমি হাটেবাজারে বেশ কয়েকবার দেখে থাকলেও মন্টু বা পাপিয়াকে কখনও দেখিনি।

কেশবপতি আমার কাছে সমস্যা নিয়েই এসেছিলেন। মাসছয়েক হল আকড়া স্টেশনের কাছে তিনি একটা শাড়ির দোকান খুলেছেন। দোকান খোলার জন্যে আর মহাজনের থেকে মাল তোলার জন্যে ওঁর যা কিছু সঞ্চয় ছিল সব লাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দোকানটা মোটেই চলছে না। একেবারেই বিক্রিবাটা নেই। অথচ বাবা আর ছেলে নিয়ম করে রোজ দোকানে বসে। তা ছাড়া সপ্তাহে তিনদিন সন্ধেবেলা পাপিয়াও থাকে দোকানে। কিন্তু দোকানের বলতে গেলে কোনও সেল নেই।

কেশবপতি দোকানের নাম রেখেছেন 'শাড়িঘর', কিন্তু এলাকার লোকজন আড়ালে-আবডালে ঠাট্টা করে বলে 'মাছিঘর'।

কেশবপতি বললেন, ছ'মাস ধরে এই দোকানের বোঝা তিনি টেনে চলেছেন—আর পারছেন না। এবার বোধহয় দেনার দায়ে সবই যাবে। দু-বেলা ভাতটুকু জুটবে কিনা ভগবান জানেন। কেশবপতির মনে হয় দোকানটায় কোনওরকম দোষ লেগেছে। মন্টু আর পাপিয়াও বলল যে, ওদেরও একইরকম বিশ্বাস।

আমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কেশবপতি কেঁদে ফেলেছিলেন। আবেগে আমার হাত মুঠো করে ধরে ফেলেছিলেন। ভাঙা গলায় বলেছিলেন, 'যে করে হোক, আমাদের দোকানটাকে বাঁচান...আমাদের ফ্যামিলিটাকে বাঁচান...।'

বাবার দেখাদেখি পাপিয়ার চোখেও জল এসে গিয়েছিল। ওর চোখে জল দেখে আমার বুকের ভেতরে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, একটা পিকিউলিয়ার জেদ যেন আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। কিছু একটা আমাকে করতেই হবে। যেভাবে হোক দোকানটা আমাকে বাঁচাতেই হবে!

আমি যে জ্যোতিষ, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক করতাম সেগুলো যে বুজরুকির আর-একরকম নাম, সে আমি জানতাম। কিন্তু ব্যবসা করতে-করতে, পসার জমতে-জমতে, আমার সেই জানার ওপরে ছানি পড়েছিল। একসময় তো আমার মনে এমন বিশ্বাসও তৈরি হয়ে গেল যে, আমার মধ্যে সত্যি-সত্যি অলৌকিক ক্রিয়াকরমের ক্ষমতা আছে। আমার ক্ষমতা দিয়ে আমি অশুভ ক্ষমতার সঙ্গে লড়তে পারি। অশুভ ক্ষমতাকে বশও করতে পারি।

তো কেশববাবুর কথায় রাজি হয়ে আমি লড়াই শুরু করলাম। ওদের 'শাড়িঘর' দোকানে আমি যাতায়াত শুরু করলাম। দোকানের অশুভ লক্ষণগুলো খুঁজে-খুঁজে বের করতে লাগলাম। আর একইসঙ্গে সেগুলোর প্রতিকারের ব্যবস্থাও করতে লাগলাম।

দোকানের বেশ কিছু ট্রিটমেন্টের পর বাড়ি। আমি বললাম যে, অনেক সময় দোকানের ওপরে বানমারা কি তুকতাকের শেকড় বাসস্থানের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। তাই আমাকে কেশবপতিবাবুর বাড়িটাও ভিজিট করতে হবে, আর ওটার পূর্ণমাত্রা পূর্ণসত্তা শোধন করাতে হবে।

'শাড়িঘর' দোকানে যে আমি 'ছু মন্তর' করতে যেতাম তখন কখনও-কখনও আমার পাপিয়ার সঙ্গে দেখা হত। এরকম দু-চারবার দেখা হওয়ার পরই পাপিয়া আমার চোখে ধরে গেল। কী করে যেন মেয়েটা আগাম কোনও জানান না দিয়ে আমার বুকের ভেতরে ঢুকে গেল। সেখান থেকে আর বেরোল না।

তখন আমার এমন দশা হল যাকে বলা যায় মরণদশা। দিনরাত্তির ওকে চোখের সামনে দেখি। বুকের ভেতর থেকে ওর কথা শুনতে পাই। যখনই আশেপাশে লোকজন থাকে না, তখনই ওর সঙ্গে আমি একা-একা কথা বলি।

তাই পাপিয়াকে দেখার জন্যেই আমি কেশববাবুর বাড়িতে শোধনের বাহানায় যেতে চেয়েছিলাম।

পাপিয়া আমার টান বুঝতে পেরেছিল। সেই টানের জবাবে ওর ভেতরেও যে একটা পালটি টান তৈরি হয়েছিল সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম—মানে, পাপিয়া বুঝিয়ে দিয়েছিল। যেমন, উঠোনে আমার গলার আওয়াজ পেলেই ও ঘরের ভেতর থেকে কোনও না কোনও কাজের ছুতোয় বাইরে বেরিয়ে আসত। তারপর বাড়িতে শোধনের কাজ-টাজ সেরে আমি যখন বাকি কাজটুকু করার জন্যে মন্টুকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে যেতাম তখন পাপিয়া আমাদের সঙ্গে জুড়ে যেত। মন্টু হাজার বারণ বা বকাবকি করলেও ও শুনত না। আমার মনটা তখন নেচে উঠত।

এইভাবে আমি আর পাপিয়া জড়িয়ে গেলাম।

কিন্তু আমরা কাছাকাছি আসতে পারিনি। যে-সামান্য কথা-টথা আমাদের হত তার সবটুকুই ছিল চোখে-চোখে। আমি দিনকে দিন পাগল হয়ে যেতে লাগলাম। পাপিয়ার সঙ্গে এক মিনিট সামনাসামনি কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে যে-কাউকে আমি হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি ছিলাম। আমার রাতের ঘুম চলে গিয়েছিল। রাতে শোওয়ার সময় তিনটে কি চারটে বেলফুল

আমাদের উঠোনের গাছ থেকে ছিঁড়ে নিতাম। রাতের অন্ধকারে সেই ফুলগুলোই ছিল আমার শয্যাসঙ্গী। আমি বড়বড় শ্বাস টেনে ওদের গন্ধ শুকতাম। ভাবতাম ওটা পাপিয়ার গায়ের গন্ধ। এইভাবে গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে আমি একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম।

একদিন আর থাকতে না পেরে আমি একটা কাঁচা রাস্তার ধারে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। দুপুরবেলা পাপিয়া এই রাস্তা ধরে বাড়ি থেকে দোকানের দিকে যায়। ওর হাতে থাকে টিফিন কেরিয়ার—কেশববাবু আর মন্টুর দুপুরের খাবার।

ফেরার পথে পাপিয়াকে ধরলাম। টেনে নিলাম গাছের আড়ালে।

'পাপিয়া, এভাবে আমি আর পারছি না...।'

পাপিয়া চুপ করে রইল।

আমি আবার বললাম, 'এভাবে আমি আর পারছি না। সত্যি পারছি না—।'

'আমিও পারছি না।' ও মুখ নীচু করে বলল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছিল। তাতে আমার বুকের ভেতরটা যেন আরও ফাঁকা লাগছিল।

'কী হল? কিছু বলো...।'

'আমার দাদা আর বাবাকে তুমি চেনো না। এসব ওরা পছন্দ করে না। ওরা রেগে গেলে একেবারে চণ্ডাল। আমাদের এটা জানতে পারলে আমাকে একেবারে কেটে ফেলবে।'

আমি থমকে গেলাম। কেশবপতিদের ঘরে ভালোবাসা তা হলে পাপ!

পাপিয়া আমাকে 'তুমি' বলায় মনে খুব আনন্দ হচ্ছিল। কিন্তু একইসঙ্গে ভয়ও পাচ্ছিলাম।

কী হবে এখন?

পাপিয়া কাঁদতে শুরু করল। ওর গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল।

হঠাৎই ও বলল, 'আমি এবার যাই। দেরি হলে মা বকবে...।'

ও চলে যাওয়ার পরেও আমি অনেকক্ষণ গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইলাম। বুঝতে পারছিলাম না এবার আমি কোনদিকে যাব। যেদিকে আমি যেতে চাই সেদিকে যাওয়ার কোনও পথ নেই। আমার আর পাপিয়ার মাঝে যেন একটা কাচের দেওয়াল। আমরা কত কাছে, অথচ কত দূরে!

আমার দিনগুলো ক্রমশ খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে উঠতে লাগল।

আর 'শাড়িঘর'-এর অবস্থা ক্রমশ ভালো থেকে আরও ভালো হয়ে উঠতে লাগল। দিনের পর দিন খদ্দেরের ভিড় বেড়ে চলল। কেশববাবু আর মন্টু আমার কাছে এসে বারবার ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল। আমাকে গুনে-গুনে তিনশো টাকা দিয়েছিলেন কেশবপতি। দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'এ তো কিছুই নয়! আপনি যা চাইবেন আমি তাই দেব। আমার মরে কাঠ হয়ে যাওয়া দোকানটাকে আপনি বাঁচিয়ে তুলেছেন—।'

তুকতাক ঝাড়ফুঁক এসবের বুজরুকিতে আমার কোনওকালেই বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আমার ওইসব মিথ্যে-মিথ্যে মন্ত্রতন্ত্রে পজেটিভ কাজ হওয়ায় আমার বেশ ভালো লেগেছিল। তবে তার সঙ্গে একটু দুঃখও পেয়েছিলাম। কারণ, কেশবপতি যে বলেছেন, 'আপনি যা চাইবেন আমি তাই দেব।', সেই লিস্টের মধ্যে পাপিয়া ছিল না।

আমি মিনমিন করে প্রস্তাবটা দিয়েছিলাম ঃ 'আপনার মেয়ে পাপিয়া যদি আমার স্ত্রী হয়, মানে, যদি আপনার পারমিশান থাকে...তা হলে...।'

কেশবপতি আমাকে থামিয়ে দিয়ে মাথা নেড়েছেন ঃ 'না, সেটা হয় না। তা ছাড়া আপনাকে "যা চাইবেন" বলেছি মানে "যা জিনিস চাইবেন"। আমার মেয়ে পাপিয়া কি "জিনিস" না কি?'

ব্যস, সেখানেই সব শেষ।

আমার মাথায় আগুন জ্বলতে লাগল। আমি 'শাড়িঘর'-এর সর্বনাশের চিন্তা করতে লাগলাম।

যেসব ক্রিয়াকরমকে বুজরুকি বলে ভাবতাম সেগুলোকেই বিশ্বাস করতে শুরু করলাম। 'শাড়িঘর'-কে ঘিরে নানান তুকতাক আর তন্ত্রমন্ত্র, মারণ, উচাটন ইত্যাদি শুরু করে দিলাম। আমি 'মনোস্কামনা মন্ত্র' ব্যবহার করেছি, 'শত্রু নাশ মন্ত্র' ব্যবহার করেছি, পাপিয়াকে পাওয়ার জন্যে 'স্ত্রী লাভ মন্ত্র' লাল বস্ত্র পরে মুগার মালা ধারণ করে রোজ ছ'হাজার বার করে টানা আটদিন জপ করেছি, এমনকী 'মারণ প্রয়োগ' মন্ত্রও নিয়ম মেনে জপ করেছি।

এসব করছিলাম আর 'শাড়িঘর', কেশবপতি, আর মন্টুর সর্বনাশের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। পাপিয়াকে বলেছিলাম যে, সুযোগ পেলেই আমরা দুজনে কমলগাছি ছেড়ে পালাব। দূরে কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধব।

প্রায় মাসখানেক অপেক্ষা করার পর ভারী অদ্ভুতভাবে 'শাড়িঘর'-এর সর্বনাশ শুরু হল।

কমলগাছির একটা মেয়ে, নাম ঝুমরি, সিলিংফ্যানের সঙ্গে একটা নতুন

শাড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস দিয়ে সুইসাইড করল। শাড়িটা ও নিজে পছন্দ করে 'শাড়িঘর' থেকে কিনেছিল।

সুইসাইড নিয়ে গ্রামে বেশ হইচই হল। কিন্তু ঝুমরি কেন আত্মহত্যা করেছে সেটা জানা গেল না। তাছাড়া কোনও সুইসাইড নোটও মেয়েটা রেখে যায়নি।

ঠিক একমাস পরের ঘটনা। প্রথম সুইসাইডের উত্তেজনার রেশ তখন প্রায় থিতিয়ে গেছে। হঠাৎই দ্বিতীয় সুইসাইডের ঘটনা ঘেটে গেল কমলগাছিতে। উঠোনোর গাছের ডালে একটা নতুন শাড়ি বেঁধে সেটার ফাঁস গলায় লাগিয়ে পূর্ণিমা নামে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করল।

এবারেও শাড়িটা কয়েকদিন আগে 'শাড়িঘর' থেকে কেনা হয়েছিল। পূর্ণিমা নিজেই পছন্দ করে কিনেছিল।

পুলিশ অনেক তদন্ত করেও আত্মহত্যার কোনও কারণ খুঁজে পেল না। তাছাড়া আগেরবারের মতো এবারেও কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি।

এই সুইসাইডের পর হইচই কিছুটা বেশি হল। লোকে 'শাড়িঘর'-এর দিকে আঙুল তুলল। কেশবপতি আর মন্টুও বাদ গেল না। আর এলাকার উত্তেজনাও সহজে থিতিয়ে পড়ল না।

এরকম একটা অবস্থার মধ্যে একমাস গড়াতে না গড়াতেই আবার আর-একটা সুইসাইড। আবার সিলিংফ্যান। আবার নতুন শাড়ি। আবার 'শাড়িঘর'।

এবারেও সুইসাইডের কোনও কারণ জানা যায়নি। কোনও সুইসাইড নোট নেই। পুলিশও আগের মতোই হতভম্ব।

পাবলিক এবারে বেশ খেপে গেল। তারা কেশবপতির বাড়িতে গিয়ে হুজ্জুতি করল। কেশবপতি আর তার ছেলের দিকে রাগের আঙুল তুলল।

কিন্তু এতসব হওয়া সত্ত্বেও 'শাড়িঘর' বন্ধ হয়নি। যদিও কেশবপতির তখন পাগল হওয়ার জোগাড়। তিনি বারবার ছুটে আসতে লাগলেন আমার কাছে। বলতে লাগলেন, 'কেন এইসব বারবার হচ্ছে? কীসের কুনজর পড়ল আমার দোকানে? আপনি একটু দেখুন...আমায় বাঁচান...।'

আমি মনে মনে খুশি হলেও মুখে বললাম, 'আমি তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি বড় কোনও তান্ত্রিকের কাছে যান...।'

ভাঙাচোরা কেশবপতিকে দেখে আমার খারাপ লাগছিল। এর মধ্যেই মানুষটা পাঁচ টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু এরকম সুইসাইডের ঘটনা পরপর কেন

হচ্ছিল তার কারণ তো আমারও জানা নেই! সামনের মাসে যদি আবার একটা মেয়ে সুইসাইড করে? যদি তার গলায় প্যাঁচানো থাকে 'শাড়িঘর'-এর শাড়ি!

পাপিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ আমার ছিলই। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ কম হলেও আমরা লুকিয়ে চিরকুট চালাচালি করতে পারতাম। ওর এক বন্ধু আভা আমাদের দুজনের মধ্যে পিয়োনের কাজ করত। তো আমি ঠিক করলাম, আর নয়—এবার আমাদের কমলগাছি ছেড়ে পালাতেই হবে। পাপিয়াকে সেই মতন খবর পাঠালাম, সামনের বুধবার আকড়া স্টেশন থেকে আমরা দুজনে সকাল ন'টা কুড়ির শেয়ালদা লোকাল ধরব। ট্রেনের একেবারে লাস্ট কামরায় আমি উঠব। ও যেন সময়মতো এসে ট্রেনটা ধরে।

ও সে-কথায় রাজি হয়ে পালটা খবর পাঠাল।

কিন্তু বুধবার আসার আগেই আবার ঘটে গেল সেই সর্বনেশে ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে আমাদের এক অঞ্চল-নেতার মেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে মরল। 'শাড়িঘর'-এর নতুন শাড়ির ফাঁস।

বুধবার ভোরবেলা খারাপ খবরটা চাউর হতেই চারদিকে উত্তেজনা। শোরগোল। শুনলাম, কেশববাবুরা সবাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন। আমি একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে আভার খোঁজে ছুটলাম। ওর সঙ্গে দেখা করলাম। জিগ্যেস করলাম, 'পাপিয়া কোথায় তুমি জানো?'

'হ্যাঁ, জানি। সবিতাদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। ওখানে কোনও ভয় নেই। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না...।'

'আমি এখনই স্টেশনে চলে যাচ্ছি। ওকে বোলো, ন'টা কুড়ির শেয়ালদা লোকাল। লাস্ট কামরায় আমি উঠব। ও যেন টাইমমতো এসে ট্রেন ধরে। যদি একটু দেরি-টেরি হয়ে যায় তা হলে যেন যে-কোনও কামরায় উঠে পড়ে—আমি ওকে ঠিক খুঁজে নেব...।'

'আপনি, কোনও দুশ্চিন্তা করবেন না, দাদা। আমি নিজে ওকে স্টেশনে পৌঁছে দেব—।'

আমি আর সময় নষ্ট না করে ছুটলাম স্টেশনের দিকে। ন'টা কুড়ির ট্রেন। ন'টা কুড়ির ট্রেন।

স্টেশনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম।

পাপিয়া এল না।

আমি বারবার ঘড়ি দেখতে লাগলাম। স্টেশনে আসার পথের দিকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলাম।

পাপিয়া এল না।

এমন সময় স্টেশনে একজন লোকের মুখে শুনলাম, পাবলিক খেপে গিয়ে কেশবপতির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

ন'টা কুড়ির ট্রেন এসে গেল। আমি স্টেশনের লোকজনের ভিড়ে পাপিয়াকে খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু ওকে দেখতে পেলাম না।

ট্রেন ছেড়ে দিতেই আমি লাস্ট কামরায় উঠে পড়লাম। পাপিয়ার কথা ভেবে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি মন শক্ত করে সন্তোষপুর স্টেশনের অপেক্ষা বসে রইলাম। যদি পাপিয়া সন্তোষপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠে!

কিন্তু উঠল না।

ট্রেন ছুটে চলল ব্রেসব্রিজ, মাঝেরহাট ছাড়িয়ে। আর আমার মনটা পাগলের মতো হয়ে গেল, টগবগ করে ফুটতে লাগল। ভাবছি কোনও একটা স্টেশনে নেমে যাব, আবার ফিরে যাব কমলগাছিতে, কিন্তু সেটা আর হয়ে উঠল না। একটা কানফাটানো শব্দ হল—লোহার সঙ্গে লোহার সংঘর্ষ। তার সঙ্গে প্রবল এক ঝটকা। গোটা দুনিয়াটা যেন কয়েকবার পাক খেয়ে গেল। আমি কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম।

ঘোর কাটলে দেখি আমি ট্রেনের কামরায় বসে আছি। পাপিয়ার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি।

আমার বিশ্বাস, পাপিয়া হয়তো এই বজবজ লাইনের কোনও না কোনও ট্রেনে উঠবে। আমার খোঁজ করবে। তাই আমি এই লাইনের সব ট্রেনের সব কামরায় বসে থাকি। আমার ভালোবাসার মেয়েটার খোঁজ করি।

আমি লোকটার গল্প শুনতে-শুনতে কোথায় যেন ভেসে গিয়েছিলাম। হঠাৎই খেয়াল করলাম আমাদের ট্রেনটা কোন একটা স্টেশনে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ লাইনে রোজ যাতায়াত করলেও স্টেশনটা আমি একেবারেই চিনতে পারছি না। তাছাড়া ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকলেও খোলা জানলা দিয়ে হুহু করে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে।

আমি অবাক হয়ে কামরার চারপাশে তাকালাম। কামরায় মাত্র পাঁচ-ছ'জন মানুষ বসে আছে। তারা প্রত্যেকেই এমনভাবে মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে আছে যে, তাদের কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না।

ট্রেনের কামরাটা কখন এরকম পালটে গেল?

আমি লোকটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, 'আপনি সেদিন পাপিয়াকে ওর মোবাইলে ফোন করে দেখতে পারতেন। জিগ্যেস করতে পারতেন, ও কোথায় আছে? কী করছে?'

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর বলল, 'আপনি বোধহয় আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি। আমি যখনকার কথা বলছি তখন মোবাইল ফোন-টোন এদেশে চালুই হয়নি...।'

আমি ভীষণ অবাক হলাম। লোকটা তা হলে কবেকার কথা বলছে?

লোকটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারল। একটু হেসে বলল, 'চলুন, একটু স্টেশনে নামি...।'

কথা শেষ হতে না হতেই লোকটা চট করে সিট থেকে উঠে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। আমিও নেমে পড়লাম ওর পেছন-পেছন।

প্ল্যাটফর্মে কয়েকটা আলো থাকলেও সে ছাড়া যেদিকেই চোখ যায় গাঢ় অন্ধকার। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা সারা শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। বাতাসের শব্দ ছাড়া চারপাশে আর কোনও শব্দ নেই। প্ল্যাটফর্মে এদিক-ওদিক কয়েকজন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের সবারই মাথায় সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া। কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না।

এ আমি কোন স্টেশনে এসে নামলাম?

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তখন অন্য বোগিগুলোর দিকে আঙুল দেখাচ্ছিল লোকটা ঃ 'ওই দেখুন—।'

তাকিয়ে দেখি, অন্য বোগিগুলো থেকে হুবহু এই লোকটার মতন দেখতে এক-একজন লোক প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়েছে। হুবহু এক তাদের পোশাক, একইরকম তাদের চেহারা, কাঁধে একইরকম নীল ঝোলাব্যাগ!

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে বলল, 'বললাম না, এই লাইনের সব ট্রেনের সব কামরায় আমি সবসময় বসে থাকি। পাপিয়াকে খোঁজার জন্যে। বিশ্বাস করুন মরে গিয়েও আমার শান্তি নেই...।'

পাতায় পাতায় পাপ

'তোর জীবনের পাতায়-পাতায় পাপ।'

এটা আমার কথা না—বাপির কথা। মা-কে খালি এই কথা বলে। আর মা তখন খেপে গিয়ে বাপিকে যা-তা বলে গালাগাল দেয়। গালাগালগুলো এত খারাপ যে, আমার সেগুলো বলতে লজ্জা করে। এমন লজ্জা যে, স্কুলের ক্লোজ ফ্রেন্ডদেরও বলতে পারব না।

মা আরও যেসব কথা বলে সেগুলোর আমি মানে বুঝি না। তবে বাপি বোধহয় বোঝে। বিকজ কথাগুলো শোনার পর বাপি খ্যাপা কুত্তা হয়ে ওঠে, শুধু ঘেউঘেউ করতে থাকে।

মায়ের কথাগুলোর কয়েকটা মনে আছে। যেমন, 'ঢ্যামনা সাপের বাচ্চা, তার আবার ছোবল মারার শখ!' 'জলে ভেজা সুতো কি আর ছুঁচে পরানো যায়!' তো এইসব কথা। ব্যস, এগুলো শোনামাত্রই বাপি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।

তখন মা-কে ধরে মারতে থাকে জানোয়ারটা।

আমার বাপিটা একেবারেই সুবিধের নয়। সাইকেল নিয়ে কুরিয়ার কোম্পানির চিঠিপত্তর বিলি করে বেড়ায়। সবসময় ঠোঁটে সিগারেট—টানছে তো টানছেই।

কাজ-টাজ সেরে যখন বাপি বাড়ি ফেরে তখন একটা প্লেটে আলুভাজা আর পলতার বড়া নিয়ে বসে যায়—গ্লাস থেকে চুকুস-চুকুস করে মাল টানে,

হেঁড়ে গলায় শ্যামাসঙ্গীত গায়।

আমি তখন ভেতরের ঘরে মায়ের কাছে লুকিয়ে থাকি। বাপির সামনে যেতে ভয় করে। লোকটা তখন রাক্ষসের বাচ্চা হয়ে যায়।

একদিন সন্ধের পর খাটের তলা থেকে আমার ফুটবলটা বের করে নিয়ে আসছি, বাপি খপ করে আমার হাত চেপে ধরল।

একটু আগেই দেখলাম লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে ঝিম মেরে বসে আছে। সামনের ভাঙা টেবিলে 'দাদাগিরি'র বোতল আর গ্লাস। জড়ানো গলায় হিজিবিজি বকছে। এক্কেবারে বেহেড পেঁচো মাতাল।

সেই লোকটা কী করে টের পেল আমি ওর হাতের নাগাল দিয়ে যাচ্ছি?

বাপি খুব জোরে আমার বাঁ-হাতের কবজিটা চেপে ধরল। জড়ানো গলায় বলল, 'বেটা, বল খেলবি? তোর বলের জোর আছে? বল আছে?'

আমি চুপ করে রইলাম। হাতটা ব্যাপক ব্যথা করছে। বাপির তো ওই খ্যাঁচা চেহারা! তাতে এত জোর পেল কোথায়?

বাপি তখনও একই কথা বলে চলেছে, 'বল, তোর বল আছে? বল...!'

'আঃ, বাপি, ছাড়ো—লাগছে!' ব্যথায় আমার চোখ-মুখ বোধহয় কুঁচকে যাচ্ছিল।

'বাপি!' হেসে উঠল মাতালটা। লোকটাকে আমি তখন আর চিনতে পারছি না।

'কাকে তুই বাপি বলছিস্? আমি তোর বাপি না। জানিস না, আমার বল নেই? আমি ঢ্যামনা সাপের বাচ্চা, আমি ভেজা সুতো! কিন্তু তোর রিয়েল বাপকে তুই কখনও খুঁজে পাবি না। কেন জানিস?'

আমি ফ্যালফ্যাল করে বাপির ঘোলাটে চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। কোনও কথা বলতে পারলাম না।

'শোন, আমি বলে দিচ্ছি।' বাপির মুখ থেকে ভকভক করে বিচ্ছিরি গন্ধের দমকা ঝাপট ভেসে আসছিল।

'তোর মা হাফডজন মদ্দার সঙ্গে খাটবাজি করে। তো তার মধ্যে কোনটা তোর আসল বাপ কেউ জানে না। তুই পালা করে ওই ছ'জনকে "বাপি" বলে ডাকিস।' কথাটা শেষ করেই বাপি আমার পেছনে একটা লাথি কষাল।

আমি কিন্তু তাতে পড়ে গেলাম না। কারণ, আমি খুব মোটা আর ভারী—বাপির মতন খ্যাংরাকাঠি না। সেইজন্যেই বাপি আমাকে সবসময় 'মোটা', 'মাথামোটা', 'হোঁৎকা' এইসব বলে ডাকে।

বাপি আমাকে অনেক সময় সিগারেট খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। জ্বলন্ত সিগারেট দু-আঙুলে ধরে আমার ঠোঁটে চেপে বলেছে, 'টান, টান! দেখবি কী আরাম লাগবে...।'

বাপির আঙুলে সিগারেটের কী বিচ্ছিরি গন্ধ! আমি জোর করে মুখ সরিয়ে নিয়েছি। উঃ!

বাপি তখন মুখ বেঁকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলেছে, 'শালা সতী লজ্জাবতী! ক্লাস সিক্সে পড়িস, এত লজ্জা কীসের? এখনই তো বড় হওয়ার বয়েস! নিজের চেহারা দেখিস্ না আয়নায়? দিনে-দিনে খোদার খাসি তৈরি হয়েছে...!' কথা শেষ করেই আবার লাথি।

মাঝে-মাঝে মনে হয়, ঘুরিয়ে আমিও একটা পালটা লাথি কষাই। কিন্তু সেটা করি না। কারণ, করলে পরে আমার বাপি দেওয়ালে লেপটে গিয়ে ক্যালেন্ডার হয়ে যাবে। তা ছাড়া 'বাবা' মানে গুরুজন—সে আসল বাবা না হলেও।

মা কিন্তু আমার আসল মা—সত্যিকারের মা। সেটা বুঝতে পারি মায়ের ভালোবাসা দেখে। মা ভীষণ ভালোবাসে আমাকে। যখনই খিদে পায় তখনই খেতে দেয়। আর বাড়িতে মা যখন থাকে না তখন খাবার রেখে যায়। এমন খাবার যে-খাবার সহজে নষ্ট হবে না।

ফ্রিজ আর কালার টিভি আছে আমাদের। মা কিনে দিয়েছে—আমার জন্যে। টিভি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। মা বলেছে, পড়াশোনা করে বড় হয়ে আমি একদিন টিভিতে প্রোগ্রাম করব। আমি তখন থাকব টিভির ভেতরে, আর মা বাইরে থেকে আমাকে দেখবে।

মা 'আই-কেয়ার' নার্সিংহোমে কাজ করে। নার্স। সপ্তাহে পাঁচদিন ডিউটি। সেই ডিউটির টাইম আবার পালটে-পালটে যায়। কখনও ডে ডিউটি, কখনও নাইট ডিউটি। মা একসময় ডাক্তার হওয়ার চেষ্টা করেছিল—পারেনি। তারপর অন্য কীসব পড়াশোনা করে-টরে শেষ পর্যন্ত নার্স।

মায়ের যখন নাইট টিউটি থাকে তখন রাতে আমাকে একা শুতে হয়। কিন্তু তাতে আমার একটুও ভয় করে না। কারণ, মা বলে, আমি নাকি বড় হয়ে গেছি। তাছাড়া আমাদের একটা পাশবালিশ আছে। ওটাকে আমরা জড়িয়ে ধরে শুই—কখনও আমি, কখনও মা। মা যখন থাকে না তখন আমি পাশবালিশটাকে মা বলে ভাবি। ওটা থেকে মায়ের গন্ধ বেরোয়।

মা খুব ভালো নার্স। আমার যখন মাথা ফেটে গিয়েছিল তখন বুঝতে পেরেছি।

আমরা একটা বাড়ির একতলায় দুটো ঘর নিয়ে ভাড়া থাকি। একটা ঘরে আমি আর মা থাকি, আর অন্য ঘরটায় বাবা। ঘর দুটোর পেছনে একটা যেমন-তেমন রান্নাঘর আর বাথরুম, কলতলা এইসব। কলতলার পরেই রয়েছে ছোট্ট একটা বাগান মতন জায়গা। সেখানে চারটে বড়-বড় গাছ আছে ঃ দুটো আমগাছ, একটা কাঁঠাল গাছ, আর একটা জামগাছ। এ ছাড়া ছোট-ছোট বেশ কয়েকটা গাছ আছে ঃ সাদা করবীগাছ, লাল জবাফুলের গাছ, একটা ডালিমগাছ, নয়নতারা, বেলফুল, আর একটা পেঁপেগাছ। এরমধ্যে কয়েকটা গাছ মা লাগিয়েছে, আর বাকিগুলো আমি। মা গাছ ভালোবাসে, মায়ের দেখাদেখি আমিও। ওই বাগানে গিয়ে আমি ঘোরাঘুরি করি, ছুটোছুটি করি। পাখি আর প্রজাপতির সঙ্গে কথা বলি। আমার খুব ভালো লাগে।

তো এক রবিবার বিকেলে আমি বাগানে ছুটোছুটি করছিলাম। হাতে একটা ক্রিকেট ব্যাট ছিল। হঠাৎই একটা উঁচুমতন ঢিবিতে হোঁচট খেয়ে পড়লাম। এমনই কপাল যে, আমার হাতের ব্যাটটা খসে পড়ে গেল, আর আমি সেই ব্যাটের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। ব্যস্, কপালটা ফেটে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে গলগল করে রক্ত। আমি ভয় পেয়ে 'মা! মা!' বলে চিৎকার করে উঠলাম।

'কী হয়েছে রে? কী হয়েছে? বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে মা ছুটে এল।

ভাগ্যিস, সেদিন মায়ের ডিউটি ছিল না—মা বাড়িতে ছিল! তারপর তো মা আমার দখল নিল। আমি মায়ের আদরের জগতে চলে গেলাম।

মা দিনরাত্তির আমার পাশটিতে ছিল। দু-দিন নার্সিংহোম কামাই করে দিল। কাটা জায়গাটা অনেকটা সেরে যাওয়ার পরেও সেকেন্ড দিন রাতে মাথায় টনটনে ব্যথা হচ্ছিল। তাই মা সে রাতে সারাক্ষণ ধরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। মনে আছে, বাপি তিনবার মা-কে ডাকতে এসেছিল। জড়ানো গলায় বলেছিল, 'ছেলের তো অনেক সেবা করলে—এবার আমার একটু সেবা করো...।'

মা বলল, 'তুমি চুপচাপ শুয়ে পড়ো। ওকে ছেড়ে এখন যেতে পারব না। ওর মাথা টনটন করছে...।'

বাপি কেমন নোংরাভাবে হাসল, বলল, 'আমারও তো ইয়ের মাথা টনটন করছে—।'

'নোংরা জানোয়ার কোথাকার!' মা হিস্‌হিস্‌ করে উঠেছিল, 'এক্ষুনি বেরোও ঘর থেকে। নইলে চেঁচিয়ে সাতপাড়া মাথায় করব!'

'দাঁড়াও। কাল তোমাকে দেখাচ্ছি! তোমার সব তেল বের করে ছাড়ব!' জানোয়ারটা গরগর করতে-করতে চলে গিয়েছিল।

মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিল। বারবার বলছিল, 'তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই! তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই রে...!'

বাপির ওপর আমার খুব রাগ হচ্ছিল তখন।

মনে আছে, স্পষ্ট মনে আছে, পরদিন বাপি মা-কে ধরে পিটিয়েছিল। ধোপারা যেমন করে কাপড় কাচে, সেইভাবে।

আমি তখন ইস্কুলে যাওয়ার জন্যে বেরোচ্ছিলাম। মা আমাকে রেডি করে দেওয়ার ঠিক পরে-পরেই বাপি হুট করে ঘরে এল। 'চল, দরকার আছে—।' বলে মা-কে হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

প্রচণ্ড মারধোরের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। সেইসঙ্গে বাপির কাঁচা গালাগাল। আর তার পাশাপাশি মায়ের পালটা গালিগালাজ, যন্ত্রণার কাতরানি। ওঃ!

আমি মাথার পাশটা টিপে ধরে বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না এখন কী করব—কী করা উচিত।

তারপরই ঘরের ভেতর থেকে অন্যরকম আওয়াজ আসতে লাগল। মায়ের 'উঃ! 'আঃ!' আর বাপির চাপা গোঙানি।

একটু পরেই বাপির 'ও-ও-ও-ওঃ।' শব্দ শোনা গেল।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে মায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মায়ের সঙ্গে দেখা না করে আমি ইস্কুলে যাব না। কিছুতেই না!

মিনিট পাঁচেক পরে দরজা খুলল।

মা দরজায় দাঁড়িয়ে। মুখ নামানো, চোখে জল। দেখেই মনে হচ্ছিল, মা খুব ক্লান্ত।

আমি ডেকে উঠলাম, 'মা!'

মা মুখ তুলে তাকাল। তখনই চোখে পড়ল মায়ের বাঁ-চোখের পাশটা লাল হয়ে ফুলে আছে। ঠোঁটের কোণ কেটে গেছে।

জানোয়ারটা মা-কে এভাবে মেরেছে!

ঠিক তখনই বাপির মুখটা দরজার ফ্রেমের পাশ থেকে উঁকি মারল। খালি

গা আর লুঙ্গি। যেন কিছুই জানে না এমন নিষ্পাপ ন্যাকাচৈতন্য মুখ। মা-কে এমনভাবে মেরেছে বলে এতটুকুও দুঃখ-টুঃখের ছাপ নেই সেখানে।

আমাকে দেখেই বাপি খিঁচিয়ে উঠল, 'কীরে মাথামোটা! কী চাই তোর এখানে? যা, ফোট!'

কথাগুলো বলতে-বলতে লোকটা দরজা পেরিয়ে বাইরে এল। আমি এক অদ্ভুত ঘেন্না নিয়ে আমার নকল বাবার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'ড্যাবড্যাব করে দেখছিস কী?' বলেই বাপি ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে দিল আমার গালে।

মা চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার, আমার ছেলের গায়ে হাত তুলবে না! ও তোমার কী করেছে?'

আমার শরীরের ভেতরে কী একটা যেন হয়ে গেল। কোনও কন্ট্রোল আর রইল না। সপাটে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলাম বাপির গালে। আমার দু-নম্বরি বাপির গালে।

ওই তো পলকা বডি! বাপি তিনহাত দূরে ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল। লুঙ্গিটা উরু পর্যন্ত উঠে গেল। আর একটু হলেই ডেঞ্জার লাইন পেরিয়ে যেত।

মা ছুটে এসে আমাকে জাপটে ধরল। বলল, 'কী করছিস্! কী করছিস্! তোর বাবা! বাবার গায়ে এমনি করে হাত তুলতে আছে?'

বাপি তখন গালে হাত বোলাতে-বোলাতে উঠে দাঁড়াচ্ছে। আমি বাপির দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললাম, 'এরপর যদি কখনও মায়ের গায়ে হাত তুলতে দেখি তা হলে ব্যাট দিয়ে চোরের পেটান পেটাব আর হুকশট প্র্যাকটিস করব...।'

বাপি দেখলাম কেমন একটা ভয়ের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

মা আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ইস্কুলে রওনা করিয়ে দিল। তারপর বাপির সঙ্গে শুরু করল। এই ভেবে যে, আমি শোনাশুনির আওতার বাইরে চলে গেছি।

কিন্তু আমি রাস্তার দিকে যেতে-যেতে মায়ের কয়েকটা কথা শুনতে পেলাম। ভীষণ নোংরা-নোংরা কথা, খোঁটা দেওয়া কথা। সব কথার মানে আমার মাথায় ঢুকল না। যেমন, 'কোন স্বাধীনতা দিবসের দিন পতাকা খাড়া হবে সেই আশায় সারাবছর হাঁ করে বসে থাকো।'

কীসের স্বাধীনতা, আর কীসের পতাকা?

সেদিন স্কুলে টিফিনের সময় টিফিন বাক্স খুলে দেখি মা চারটে চিকেন স্যান্ডউইচ দিয়েছে। স্যান্ডউইচগুলো দেখেই আমার জিভে জল এসে গেল। মাথার ব্যথা-ট্যাথা সব ভুলে গেলাম।

প্রথম স্যান্ডউইচটায় একটা বাঘাকামড় সবে বসিয়েছি, তখন খেয়াল করলাম, একটু দূরে দাঁড়িয়ে চম্পক লোভের চোখে আমার স্যান্ডউইচের দিকে তাকিয়ে। চম্পক আমার খুব বন্ধু।

আমি মুখের স্যান্টউইচটাকে ম্যানজ করতে-করতে একটু হাসলাম। হাসিটাকে গেটপাস ভেবে চম্পক আমার কাছে এল। দুবার ঢোঁক গিলল। তারপর বলল, 'অ্যাই, আমায় এক কামড় দিবি?'

আমি চট করে ওর দিকে পিঠ ফেরালাম। স্যান্ডউইচ খেতে-খেতে জড়ানো গলায় বললাম, 'না রে, অন্যদিন দেব। আজ আমারই টিফিন কম পড়ে যাবে...।'

আড়চোখে চম্পকের দিকে তাকিয়ে দেখি আর মুখটা চুপসে গেছে।

যায় যাক্—তাতে আমার কী!

ইস্কুল থেকে ফিরে আমার কাজ হল জামাকাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে টিফিন খেতে বসা। মা টিফিন তৈরি করে রেখে যায়। জানে যে, স্কুল থেকে ফেরার পর আমার খিদে পাবে।

টিফিন খেয়ে আমি ব্যাটটা হাতে নিয়ে পেছনদিকের বাগানে যাই। সেখানে ব্যাটিং প্র্যাকটিস্ করি—মানে, শ্যাডো প্র্যাকটিস করি। আবার কখনও-কখনও চুপচাপ বসে থাকি। বাগানের একপাশে খাটো একা ইটের পাঁজা রয়েছে। তার ইটগুলো সব শ্যাওলা ধরা, কালো-কালো হয়ে গেছে। তার ওপরে দু-টুকরো প্লাস্টিক পেতে নিয়েছি আমরা—আমরা মানে, আমি আর মা। বাবা এসবের মধ্যে নেই। একে তো রোজ দেরি করে ফেরে—আর যদি বা কখনও আগে ফেরে তো সিগারেট, গ্লাস আর 'দাদাগিরি'। বাবার যা চেহারা তাতে আমার মনে হয়, এইসব নেশা করতে-করতে মানুষটা কোনওদিন গণেশ ওলটাবে।

বাগানে এসে চুপচাপ বসে থাকি আমি। গোটা বাড়িটা চুপচাপ, আমিও চুপচাপ, চারপাশে হাওয়ার ছুটোছুটি। গাছের পাতাগুলো নড়ছে। তার সঙ্গে প্রজাপতি, ফড়িং, পাখির ছটফটে ওড়াউড়ি। ওদের কী মজা। যখন-তখন

যেখানে খুশি উড়ে চলা যেতে পারে। আমরা যদি ওদের মতন হতাম তা হলে আমি আর মা কোথাও একটা উড়ে চলে যেতাম।

আচ্ছা, গাছের মতো জীবনেরও কি পাতা আছে? বাবা মা-কে কেন বলে, 'তোর জীবনের পাতায়-পাতায় পাপ?' মা-কে জিগ্যেস করলে মা বলে, 'তোর বাবার ওসব নোংরা কথা বাদ দে তো! যদি আমার জীবনের পাতায়-পাতায় পাপ থাকত তা হলে আমি তোকে এমন পাগলের মতো ভালোবাসতে পারতাম না রে...!

জামগাছ থেকে একটা জাম খসে পড়ল। জাম পড়ে-পড়ে জামগাছের তলাটা কী সুন্দর বেগুনি হয়ে গেছে। জামগাছটায় অনেক বাদুড় আছে। ছোটবড় নানান মাপের বাদুড়। কী সুন্দর উলটো হয়ে ঝুলে থাকে! পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে ওদের দেখা যায়। আবার সন্ধে নামলেই ওরা বেরিয়ে পড়ে এদিক-সেদিক। কেউ-কেউ আবার গাছের ডালপালা আঁকড়ে ঘুরে বেড়ায়, পাকা জাম খায়।

আমি গাছগুলোর দিকে ঘোর-লাগা চোখে তাকিয়েছিলাম।

করবীগাছে সাদা-সাদা ফুল ফুটে আছে। গাছের লম্বা-লম্বা ডাল, সরু-সরু পাতা। তার পাশেই জবাগাছ—অন্যরকম দেখতে। আর ডালে একটা লাল রঙের ফুল ফুটে আছে। কী লাল! কী টকটকে! করবী গাছের ফুলগুলো যদি এরকম সুন্দর লাল রঙের হত তা হলে কী দারুণ হত!

মা বলেছে, করবীগাছ দু-তিন রকমের হয়—সাদা ফুলের, হলদে ফুলের আর লালফুলের রক্তকরবী। শুধু গাছ দেখে বোঝা যায় না সে-গাছে কোন রঙের ফুল হবে। আমি লালফুল ভালোবাসি বলে মা বলেছে রক্তকরবীর গাছ এনে সাদা করবীর পাশে লাগিয়ে দেবে। তারপর পাশাপাশি দুটো গাছে দু-রঙের ফুল ফুটে থাকবে। কী বিউটিফুল দেখাবে!

পরপর গাছগুলো দেখতে লাগলাম। ডালিম, নয়নতারা, বেলফুল। তারপরেই একটা একমানুষ সমান পেঁপেগাছ।

ডালিমগাছে ছোট-ছোট সবুজ ডালিম ধরেছে কয়েকটা। আর নয়নতারায় কয়েকটা গোলাপি ফুল।

বারবার মনে হচ্ছিল, আমাদের বাড়ি আর বাগান কী সুন্দর! আমার মা কী সুন্দর! শুধু বাবাটাই সবকিছু গোলমাল করে দেয়। মা তো খারাপ-খারাপ কথা এখনও বলতে চায় না—কিন্তু বলে ফেলে বাবার জন্যে—বলতে বাধ্য হয়।

এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠল। বাজানোর ধরণ শুনেই বুঝলাম, মা এসেছে। তাই ছুট্টে গিয়ে দরজা খুললাম।

যা ভেবেছি তাই। মা।

মা আমার জন্যে একটা বল নিয়ে এসেছে। বলটা আমার হাতে দিয়ে বলল, 'তোর আগের বলটা তো ফেটে গেছে। তুই এটা দিয়ে ব্যাট-বল খেলবি। আচ্ছা, টিফিন খেয়েছিস্ তো?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ—খেয়েছি।'

মা বলল, 'তুই ব্যাট-বল নিয়ে বাগানে যা। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।'

আমি চলে গেলাম।

মা এসে যাওয়াতে বাড়িটা এখন আরও বেশি ভালো লাগছে। কী সুন্দর শান্ত বাড়িটা! ঠিক যেন ফুলের মতো। কিন্তু রাত আটটার সময় বাবা যেই এসে ঢুকবে অমনি বাড়িটা খারাপ হয়ে যাবে। পচা গন্ধওলা বাথরুমের মতো।

বাবা মাঝে-মাঝে মা-কে হুমকি দেয়। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে, 'ধুস্ সালা! নিকুচি করেছে এই হারামখোর বাড়ির। মুতে দিই সালা এই মাদার** সংসারের মুখে। এ-সংসারের মুখে সাত লাথি মেরে সালা চলে যাব! তখন দেখব মাগির তেল!'

'দাদাগিরি'-তে চুমুক দেয়, আর এইসব বাজে-বাজে কথা বলতে থাকে বাবাটা। সত্যি, লোকটা চলে গেলে আমরা একটু শান্তি পাই। আমরা মানে আমি আর মা।

লোকটা এতবার বলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যায় না কেন কে জানে! মায়ের সঙ্গে ঝগড়ার সময় যখন বাবা এসব কথা বলে হুমকি দেয় তখন মা-ও পালটা চেঁচিয়ে বলে, 'যাও না! যেতে কে বারণ করেছে! আমার সেরকম ক্ষমতা থাকলে ছেলেকে নিয়ে আমিই চলে যেতাম! এই জানোয়ারের খোঁয়াড়ে কোনও মানুষের থাকতে ভালো লাগে!

'আমি চলে গেলে তোর তো রাম সুবিধে! তোর পেছনে ছোঁকছোঁক করা মদ্দাগুলো তখন এ বাড়িতে এসে ঘাঁটি গাড়বে!'

'ছিঃ! এসব নোংরা কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?'

'নোংরা কাজকে নোংরা কথা ছাড়া আর কোন কথা দিয়ে বোঝাব? তোর জীবনের পাতায়-পাতায় পাপ।'

মা তারপর কাঁদতে শুরু করে। শেষ কথাটায় ব্যথা পেয়ে মায়ের ঝগড়ার তেজ ফুরিয়ে যায়।

মা যে এরকম মাঝে-মাঝে ভেঙে পড়ে তাতে আমার খুব দুঃখ হয়।

এখন বাগানে বসে আমার মনে হচ্ছিল, ইস্, বাবাটা যদি সত্যিই না থাকত! যদি চোখের পলকে লোকটা একদিন 'নেই' হয়ে যেত!

মা বাগানে এসেই কাজ শুরু করে দিল। গাছের শুকনো পাতা আর ডালপালার টুকরো কুড়িয়ে-কুড়িয়ে এক কোণে জড়ো করতে লাগল। একটা লোহার শিক নিয়ে গাছগুলোর গোড়ার মাটি আলগা করে দিল। তারপর গাছের গোড়ায় অল্প-অল্প করে জল দিল।

মায়ের কাছ থেকে এসব কাজ আমি কবেই শিখে গেছি। বাগানের একপাশে পাঁচিল ঘেঁষে বাগান করার জিনিসপত্র রাখা ঃ কোদাল, শাবল, খোন্তা, কাঁচি, একটা মগ, আরও সব টুকিটাকি। এগুলো কী করে ইউজ করতে হয় আমি সব জানি।

সন্ধে হয়ে আসছিল। জামগাছে বাদুড়ের চলাফেরা শুরু হয়েছে। আমি মা-কে ডেকে ডেকে বাদুড় দেখাচ্ছিলাম। মা দেখে খুব মজা পাচ্ছিল। খুব হাসছিল। মা-কে হাসি-খুশি দেখে আমার মনের মধ্যে যে কীরকম একটা শিরশিরে আনন্দ হচ্ছিল সেটা বলে বোঝাতে পারব না।

সন্ধে নেমে গেলে আমরা ঘরে চলে এলাম। বাবা বাড়িতে নেই। সেইজন্যেই বোধহয় ঘরগুলো খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। আর ঘরের বাতাসে শান্তির গন্ধ মাখা।

এরপর মা কিছুক্ষণ টিভি দ্যাখে, আমি বই-টই নিয়ে পড়তে বসে যাই। মা এক ফাঁকে আমাকে টিফিন খেতে দেয়। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে।

একসময় কলিংবল বাজল। পরপর তিনবার। ব্যস্ত রাগি ঢং। বাবা।

ব্যস্, সঙ্গে-সঙ্গে সুখশান্তির সব গল্প শেষ!

আমাদের বাড়িটা যখন শান্তির আওতা থেকে অশান্তির কবজায় চলে যায়, তখন আমার ভীষণ রাগ হয়। বাবার ওপরে। লোকটা চলে যায় না কেন? লোকটা একেবারে চলে যায় না কেন?

রোজ রাতে অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে আমি ভগবানকে ডাকি। হে ভগবান! তুমি কিছু একটা করো! আমাকে আর মা-কে বাঁচাও!

ভগবান আমার প্রেয়ার শুনতে পান কি না কে জানে! তবে মায়ের কাছে শুনেছি, ভগবান নিজে সরাসরি কিছু করেন না—কাউকে দিয়ে করিয়ে দেন।

একদিন আমি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে কলিংবেল বাজাচ্ছি, কিন্তু কেউ দরজা খুলছে না।

আমার খুব অবাক লাগল। কারণ, মায়ের দরজা খোলার কথা—মায়ের আজ নাইট ডিউটি।

আবার বেল বাজালাম। আবার।

সাতবার বেল বাজানোর পর, আটবারের বার, মা দরজা খুলল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'তুই এসেছিস?' আর তারপরই টলে পড়ে গেল মেঝেতে।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি মায়ের সারা গায়ে চেরা-চেরা দাগ—আর সেইসব দাগ থেকে ফুটে বেরোচ্ছে রক্ত। রক্তে মায়ের গা বলতে গেলে ভেসে যাচ্ছে।

আমি 'মা!' বলে চিৎকার করে উঠলাম। সেই চিৎকারটা আমার কানে বেশ ভয়ের শোনাল। এই চিৎকারকে সবাই ভয় পায়।

মা ভাঙা-ভাঙা গলায় কোনওরকমে বলল, 'ও-ঘরের তাক থেকে তুলো নিয়ে আয়। তার পাশেই আছে স্যাভলনের শিশি—ওটাও নিয়ে আয়। তারপর দেখছি...।'

একটু পরে মায়ের কাছ থেকে ব্যাপারটা জানতে পারলাম।

মায়ের আজ নাইট ডিউটি—তাই দুপুরে মা বাড়িতেই ছিল। বাবা বাড়িতে ভাত খেতে আসে। মুখের দুর্গন্ধে মা বুঝতে পারে, বাবা উলটোপালটা জিনিস গিলে এসেছে।

তারপর খেতে বসে পায়ে পা লাগিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়। দুজনেই মুখ চালাতে থাকে। কিন্তু তারই মাঝে বাবা হঠাৎ ব্লেড চালিয়ে দেয়। এলোপাতাড়ি। একবার নয়। বারবার।

তারপর খ্যাপা জন্তুটা দুদ্দাড় করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মা সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের দরজায় ভেতর থেকে ছিটকিনি এঁটে দেয়। যদি শয়তানটা আবার ফিসে আসে! তার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণায় চিৎকার করতে-করতে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

তার একটু পরেই আমি এসে কলিংবেল বাজিয়েছি। কলিংবেলের শব্দে মায়ের জ্ঞান ফেরে।

মায়ের যন্ত্রণা কমানোর জন্যে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম।

মা আমাকে বলল, আলমারি থেকে টাকা নিয়ে বারোটা ব্যান্ড-এইড, টেট ভ্যাক ইনজেক্শন আর ডিসফোভ্যান সিরিঞ্জ কিনে আনতে। কিনে আনার পর মা নিজে-নিজেই বাঁ-পায়ের থাইয়ের কাছটায় টেট ভ্যাক নিয়ে নিল। কাটা জায়গাগুলোয় ব্যান্ড-এইড লাগিয়ে নিল। তার কিছুক্ষণ পর নার্সিংহোমে ফোন করে কাকে যেন বলল, প্রচণ্ড মাথা ধরেছে—সেইসঙ্গে জ্বর। তাই দু-দিন ডিউটিতে যেতে পারবে না।

লাকিলি মায়ের মুখটা ব্লেডের অ্যাটাক থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

সে-রাতে আমরা দুজনে তাড়াতাড়ি খেয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। তবে সারারাত আমরা কেউ-ই ঘুমোতে পারিনি।

অনেক রাতে বাবা যখন ফিরল আমরা পাশের ঘর থেকে তার আওয়াজ পেলাম।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। দেওয়ালের কোণ থেকে ক্রিকেট ব্যাটটা হাতে তুলে নিলাম।

মা বলল, 'কী করছিস? কী করছিস?'

আমি বললাম, 'বাবার মুন্ডু নিয়ে হুক শট প্র্যাকটিস করব। জানোয়ারটাকে আজ জানোয়ারের মতো পিটিয়ে খতম করব...।'

মা বলল, 'না, না—খবরদার! ওসব করলে পুলিশ তোকে ধরবে। তোর জেল-টেল হয়ে যাবে। তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না!'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। মা ঠিকই বলেছে। আমার জেল হয়ে গেলে মা তো কাঁদতে-কাঁদতে মরেই যাবে। আর জেলে গেলে আমও বাঁচব না। শুনেছি ওখানে পেট ভরে খেতে দেয় না। তা ছাড়া মা-কে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

তাই দেওয়ালের কোণে ব্যাট রেখে আবার বিছানায় মায়ের পাশে ফিরে এলাম।

অন্ধকার ঘরে চাঁদের আলো জানলা দিয়ে ছিটকে এসে পড়েছে। তার খানিকটা মায়ের মুখে। দেখলাম মায়ের চোখ খোলা। মা আপনমনে কথা বলছিল।

'সারাজীবন লোকটা আমাকে সন্দেহ করে-করেই গেল। ওর সঙ্গে ঝগড়া করতে-করতে আমিও কত নেমে গেছি। দিন-রাত কত নোংরা কথা বলি। কিন্তু তোকে আমি ভীষণ ভালোবাসি রে! কতবার ভেবেছি সুইসাইড করব, কিন্তু তোর জন্যে পারিনি। আমি মরে গেলে তোর কী হবে? ওই...ওই

শয়তানটা তোকে শেষ করে দেবে। তাই...তাই...থাকলে আমরা দুজনেই থাকব। যত কষ্টই হোক আমাদের।...কী রে, পারবি না?'

আমি 'মা!' বলে মা-কে জাপটে ধরলাম। মায়ের শাড়িতে মুখ গুঁজে বললাম, 'পারব, মা—পারব।'

আমার মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে মা বলল, 'শুধু ওই একটা লোক আমাদের জীবনটা ছারখার করে দেবে। দিনের পর দিন...মাসের পর মাস...বছরের পর বছর...উঃ!'

মা চুপ করে গেল। আমার মাথায় বুলিয়ে চলল। বোধহয় আমাকে ঘুম পাড়াতে চাইল।

আমি তখন চুপিচুপি ভগবানকে ডাকছিলাম ঃ 'হে ভগবান! কিছু একটা করো! কিছু একটা তো করো...প্লিজ!' আর একইসঙ্গে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম।

একসময় আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। রাতটাও কীভাবে যেন গড়িয়ে-গড়িয়ে ফুরিয়ে গেল।

এরপর একদিন সকালে উঠে দেখি বাবা নেই!

মা-কে ব্লেড নিয়ে অ্যাটাকের পর কুড়ি না একুশ দিন তখন পার হয়েছে।

কোথায় গেল বাবা?

মা তখন নাইট ডিউটি সেরে ফিরে সবে বাথরুমে ঢুকেছে। আমি এ-ঘর, ও-ঘর, বাগান, সব জায়গায় দেখার পর বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে চাপা গলায় মা-কে ডাকলাম।

'মা! মা! বাবাকে কোথাও দেখতে পারিছ না—।'

মা তাড়াহুড়ো করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ঃ 'সে কী রে! কোথায় গেল!'

আমি এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লাম। কে জানে!

ব্যাপারটা সত্যি কি না বোঝার জন্য আমি আর মা এবার তল্লাশিতে নামলাম।

আমি প্রথমেই দেখলাম, বাবার চটি আর সাইকেল নেই। তারপর জামাকাপড়ের আলনা আর আলমারি ঘেঁটেঘুঁটে মা বলল, তিনসেট জামা-প্যান্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শুধু তাই নয়, রিস্টওয়াচ নেই, চশমা নেই, মোবাইল নেই, আলমারির যে-লকারে টাকাপয়সা রাখত সেটা হাট করে খোলা—ভেতরটা ভোঁ-ভাঁ—সব হাপিস!

একঘণ্টা, দু-ঘণ্টা, তিনঘণ্টা কেটে গেল। বাবা ফিরল না।

আমি আর মা এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

মা একটু অবাক টাইপের হয়ে গিয়েছিল। যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না বাবা সত্যি-সত্যিই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আমাদের মুক্তি দিয়ে চলে গেছে।

পুলিশে খবর দেওয়ার তো কোনও প্রশ্নই নেই! আর পাড়াপড়শিদের বছরখানেক ধরে আমরা জানিয়ে এসেছি আমাদের দুঃখ-কষ্টের কথা। বলেছি, বাবা প্রায়ই আমাকে আর মা-কে হুমকি দেয় যে, আমাদের ছেড়ে চলে যাবে।

তিনঘণ্টা পেরিয়ে ছ'ঘণ্টা হল, ছ'ঘণ্টা পেরিয়ে ন'ঘণ্টা, তারপর নয় পেরিয়ে বারো। বাবা এল না।

সে-রাতটা আমি বাড়িতে একা থাকতে ভয় পাচ্ছিলাম। তখন মা নার্সিংহোমে ফোন করে নাইট ডিউটি অফ করিয়ে নিল। তারপর আমরা ভীষণ টেনশনে রাত কাটালাম। কোনও একটা খুটখাট আওয়াজ হলেই মনে হচ্ছিল এই বোধহয় বাবা ফিরে এল।

কিন্তু না। সারা রাতে কেউ আমাদের বাড়ির কলিংবেল বাজাল না।

পরপর তিন-চারটে দিন আমরা এইরকম টেনশনে কাটালাম। একফোঁটা আনন্দ করলাম না।

তারপর তিন-চারদিন থেকে দশদিন। দশ থেকে পনেরো। পনেরো থেকে কুড়ি।

হ্যাঁ, এবার বোধহয় আমরা একটু আনন্দ করতে পারি, বুক ভরে বাতাস নিতে পারি, মন খুলে কথা বলতে পারি, হাসতে পারি।

একসময় মা ভালো গান করত। তারপর বহু বছর গান-টান ভুলে গেছে, ছেড়ে দিয়েছে। মায়ের একটা হারমোনিয়াম ছিল। সেটাও সেই কোন কালে খাটের তলায় আস্তানা গেড়েছে। তার সারা গায়ে ধুলোর চাদর।

একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে দেখি মা হারমোনিয়াম নিয়ে বসে আছে। ওটা ঝেড়ে-পুঁছে বাজাচ্ছে। গান গাইছে।

দেখে খুব ভালো লাগল। মনে একটা খুশি ছড়িয়ে গেল।

এরকমই খুশির একটা দিনে আমি আর মা বাগানে বসেছিলাম। মা

আমাকে নানারকম গল্প শোনাচ্ছিল। তখন বিকেল আবছা হয়ে সন্ধে নামছে।

হঠাৎই দেখি করবীগাছটায় তিনটে ছোট-ছোট বাদুড় এসে বসেছে। ওরা করবীগাছের পাতা খাচ্ছে বলে মনে হল। কিন্তু আগে তো বাদুড় কখনও এ-গাছটায় এসে বসত না!

মা-কে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা দেখালাম।

মা বলল, 'বাদুড় করবীগাছের পাতা খায় বলে কখনও শুনিনি...। কী অদ্ভুত!'

আমিও বেশ অবাক হয়ে গেলাম। এর কী কারণ হতে পারে সেটা ভাবতে লাগলাম।

এর পাঁচ-ছ'দিন পর আরও একটা আশ্চর্য কাণ্ড হল।

বেশ কিছুদিন ধরে করবীগাছটায় কোনও ফুল ফুটছিল না। বাগানে এলে মা শুধু আপনমনে বলে, 'গাছটার ফুল ফোটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল কেন রে?'

'আমি কী করে জানব! ওটার গোড়ায় বেশি-বেশি করে জল দিয়ে দ্যাখো...।'

মা হেসে বলে, 'তোর যা বুদ্ধি!'

তারপর একদিন হল সেই আশ্চর্য কাণ্ড।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাগানে এসেছি। মা তখন মগে করে গাছগুলোতে জল দিচ্ছিল।

হঠাৎই চোখ গেল করবীগাছটার দিকে। গাছে ফুটে আছে লালরঙের করবী ফুল! লালরঙের ফুল! আশ্চর্য!

মা-কে তাড়াতাড়ি ডেকে দেখলাম ঃ 'মা! দ্যাখো! দ্যাখো—!'

মা-ও দেখে আশ্চর্য আর অবাক।

অবাক হয়ে মা তাকিয়ে রইল পিকিউলিয়ার করবীগাছটার দিকে। গাছটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বারবার নজর চালাল। কিন্তু মাথা-মুন্ডু কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে।

আমিও চুপচাপ মায়ের দিকে চেয়ে রইলাম।

সেইদিন মায়ের নাইট ডিউটি ছিল।

আমার ক্রিকেট ব্যাটটার কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল কোদাল, শাবল আর খুরপির কথা। মনে পড়ল, সে-রাতে আমার জামা আর প্যান্ট মাটিতে

মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। বাবার সাইকেলটা আমি চালিয়ে দূরে বাজারের কাছে রেখে এসেছিলাম—লক না করে, যাতে কেউ ওটা চুরি করে নেয়। আর বাবার জামা, প্যান্ট, চটি সব বাথরুমে নিয়ে গিয়ে অনেক সময় নিয়ে ধীরে-ধীরে একে-একে পুড়িয়ে ফেলেছিলাম।

মা সবসময় আমার দেখাশোনা করে, খেয়াল রাখে, যখনই খিদে পায় তখনই খাবার তৈরি করে মুখের সামনে জোগান দেয়, আমাকে ভালোবাসে, আমার ভালো চায়। আমিও মা-কে দারুণ ভালোবাসি।

তো সেই মায়ের জন্যে অনায়াসে এটুকু করা যায়—যেটুকু আমি করেছি।

মায়ের চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। আমার চোখে তাকিয়ে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছিল।

অনেকক্ষণ পর মা জিগ্যেস করল, 'তুই জানিস, তোর বাবা কোথায় গেছে?'

আমি কি মা-কে বলব?

বললে পরেই তো মা বুঝে যাবে, বাদুড় কেন করবীগাছের পাতা খায়, আর সাদা করবী কেমন করে রক্তকরবী হয়ে যায়!

'জল পড়ে, পাতা নড়ে

—তোমার কথা মনে পড়ে।' এ-কথাই সবসময় বলে শ্রাবণী, 'মনে পড়াটা কখনও থামে না।'

আমি কোনও উত্তর না দিয়ে ওর কানের পাশে চট করে একটা চুমু খাই। তার আগে অবশ্য দেখে নিতাম কেউ আমাদের দেখছে কি না। যদিও জানি, দেখার লোক থাকবে না। কারণ, আউটরাম ঘাট, বর্ষার বিকেল, মিহি বৃষ্টিতে ঝাপসা গাছপালা, আর তার সঙ্গে ঝাপসা গঙ্গার জলধারা।

একটা ইউক্যালিপটাস গাছের নীচে ভিজে কাঠের বেঞ্চে পাশাপাশি বসেছিলাম দুজনে। মাথায় একটাই ছাতা। আমার।

হঠাৎই শ্রাবণী বলল, 'অ্যাই, যদি হঠাৎ এখানে একটা বাজ পড়ে!'

'ধুস, এসব বাজে কথা বলতে নেই...।' বলে ওর নরম হাতটা মুঠোয় ধরেছি: 'এই হাত কখনও ছাড়ব না!'

কিন্তু ছাড়তেই হল।

গোপন ভালোবাসাটা জানাজানি হল। ওর বাবা একেবারে মিলিটারি মেজাজের মানুষ। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ি বদল করলেন। শ্রাবণীর মোবাইল ফোনটাও বোধহয় কেড়ে নিয়েছিলেন, কারণ যখনই ফোন করি ফোন সুইচ্‌ড অফ।

চোখের জল একমাত্র বন্ধু হয়ে আমার পাশে রইল। কিন্তু তাতেও যে বৃষ্টির কথা মনে পড়ছিল। বুকের হাহাকারটা বেড়ে যাচ্ছিল।

ছ'দিন পর হঠাৎই শ্রাবণীর একটা এস-এম-এস পেলাম।

'আজ সন্ধে সাতটায় চলে এসো আউটরাম ঘাটে, আমাদের সেই গাছের নীচে। অনেক কথা আছে।'

পাগলের মতো ছুটলাম সেখানে।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু শ্রাবণীকে চিনতে কোনও অসুবিধে হল না। আমার ফেভারিট নীল চুড়িদারটা পরেছে।

ওর কাছে ছুটে গেলাম। বললাম, 'তোমার এস-এম-এস-টা পেয়েই ছুটে আসছি।'

কোথা থেকে একটুকরো আলো ছিটকে এসে পড়েছে শ্রাবণীর পায়ের কাছে। সেখানে বৃষ্টির ফোঁটা ছটফট করছে। ছটফট করছি আমিও।

'শ্রাবণী! শ্রাবণী! তুমি তো জানো তোমার চোখে মেঘ করলে আমার চোখে বৃষ্টি হয়।'

শ্রাবণীকে ছায়া-ছায়া ঝাপসা দেখাচ্ছিল।

ও নীচু গলায় বলল, 'এস-এম-এস-টা পাঁচ দিনের পুরোনো। সেদিন আমি এখানে এসেছিলাম। খুব বৃষ্টি পড়ছিল...।' ওর গলা আবেগহীন, রোবটের মতো, ঠান্ডা।

'...তারপর আমার মাথায় বাজ পড়ল। কিন্তু তাও আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। কারণ, আমি জানতাম, তুমি আসবেই। আমাদের শেষ দেখাটা হবে...।'

শ্রাবণীর শরীরটা ধীরে ধীরে আবছা হয়ে শ্রাবণের সঙ্গে মিশে গেল।

খুনের আগে, খুনের পরে, এবং তারপর

১. খুনের আগে

খুন করা মোটেই ভালো কাজ নয়। কিন্তু আমাদের এই পুরোনো পৃথিবীটাকে একটু বেটার করার জন্যে মাঝে-মাঝে খুন করাটা খুব জরুরি। যেমন এখন। রণদেব মজুমদার—রনি। ওকে মাইনাস করতে এসেছি। না, এমনি-এমনি নয়—সুপারি নিয়েছি। অনেক টাকা। ওই টাকায় দু-দুটো রনিকে খুন করা যায়। কিন্তু আমার রেট বরাবরই একটু হাই-ফাই।

তবে রণদেবও কম হাই-ফাই নয়। কলকাতার ড্রাগ নেটওয়ার্কের মেগা সাইজের মাফিয়া। ওর নেটওয়ার্ক বলতে গেলে কলকাতার অলিগলি পর্যন্ত ছড়ানো ছিল। আর ওর টাকাপয়সার কোনও হিসেব ছিল না। 'ছিল'-'ছিল' বলছি কারণ, রনি সাত-আটমাস হল লাইন ছেড়ে দিয়েছে। রিটায়ার করেছে। তারপর শত্রুদের নজর থেকে বাঁচতে নাম পালটেছে, ঠিকানা পালটেছে। কলকাতার নানান জায়গায় ওর আট-দশটা বাড়ি আর ফ্ল্যাট আছে। ও পালা করে সেইসব আস্তানায় থাকে। কোনও একটা জায়গায় দু-তিন রাত্তিরের বেশি কাটায় না। ওই যে—সেফ্‌টি। শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। শত্রু বলতে আঠেরো বছর ধরে ড্রাগের কারবার করতে-করতে যেসব শত্রু ও জেনারেট করেছে।

না, আমি ওর শত্রু নই। বরং বলা যায় বন্ধু। সেইজন্যেই ওর মুভমেন্টের

অনেক খবরই আমি জানি। ওর সঙ্গে ফোনেও কথা হয়। ওর কাছ থেকে একটা টাকাও পাই প্রতি মাসে। আমার মুখ বন্ধ রাখার জন্যে। প্রোটেকশান মানি।

বাট সুপারি বড় সাংঘাতিক জিনিস। আচ্ছা-আচ্ছা লোকের নিয়ত খারাপ করে দেয়। তেমনই আমারও। তাই আজ রনির নিয়ত পালটে দেব।

রনি আজ রাতে যেখানে আছে সেটা সাউথ সিটি মলের কাছাকাছি একটা আলট্রামডার্ন হাই রাইজ। মেন গেট ডিঙোনোর পরেই বাঁ-দিকে সিকিওরিটি কিয়োস্ক। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘড়িতে তখন রাত আটটা বাজতে পাঁচমিনিট বাকি।

আমার হাতে একটা কালো রঙের ডাফেল ব্যাগ। ব্যাগে অনেক রকমের জিনিসপত্র। আমি জানি, এই হাই রাইজের সিকিওরিটির লোকেরা ব্যাগের জিপ খুলে ভেতরে উঁকি মারে, কখনও-কখনও ভেতরে হাত-টাতও চালিয়ে দেয়। যখন ওরা এগুলো করে তখন ব্যাগের জিপটাকে আমার কোনও মেয়ের ব্ল্যাক জিন্‌সের জিপ বলে মনে হয়। সেটা খুলে ইউনিফর্ম পরা একটা পুরুষ উঁকিঝুঁকি মারছে, ভেতরে হাতড়াচ্ছে।

এটাকে পারভারশান ভাবলে আমার কিছু করার নেই। কারণ, আমার প্রফেশানে এত বছর কাটিয়ে দেওয়ার পর আমার বিশ্বাস সব মানুষই থোড়াবহুত পারভারটেড। হয়তো আমি একটু বেশি।

ব্যাগের মধ্যে একটা লম্বা টেলিস্কোপ ছিল। পেতলের বডি। ওটা দেখিয়ে সিকিওরিটির ছেলেটা জানতে চাইল, 'এটা কী?'

'এটা টেলিস্কোপ। আকাশের চাঁদ-তারা দেখার জন্যে। আমি স্কাই-ওয়াচার...।'

আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ছেলেটি। তারপর ঘাড় নাড়ল ঃ 'ও. কে.। যান...।'

আমার মুখের দিকে ও যতই দেখুক পরে ও আমাকে কিছুতেই চিনতে পারবে না। ও পুলিশকে যতই আমার চেহারার বর্ণনা দিক, সেটা আমার আসল চেহারার সঙ্গে মোটেই মিলবে না। কারণ, আমার মুখে হালকা মেকাপের বন্দোবস্ত করা আছে।

বাঁ-গালের ওপরে যোগ চিহ্নের মতো করে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো। মাথায় ছোট চেক-চেক কাপড়ের টুপি। চোখে সুরমা লাগানো। গালে দু-চারদিনের না-কামানো দাড়ি।

আমি এমনভাবে সিকিওরিটি কিয়োস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম যে, সিসিটিভির ক্যামেরা আমার মুখের বাঁ-দিকটা বেশি করে পাচ্ছিল এবং স্টিকিং প্লাস্টারটা পুরোপুরি পাচ্ছিল।

সিকিওরিটি কিয়োস্কের পর অনেকটা খোলা চত্বর। বেশ কয়েক জায়গায় সাদা আলো জ্বলছে। বাঁ-দিকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো বিশাল মাপের ট্রান্সফর্মার। তাদের পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে সারি-সারি ছোট-বড় টব। তাতে নানানরকম ফুলগাছ আর পাতাবাহার গাছ। সাদা আলো ওদের চকচকে পাতায় পড়ে ছোট-ছোট ইমেজ তৈরি করেছে। খোলা চত্বরে অল্প-অল্প বাতাস বইছে। সেই বাতাসে ইমেজগুলো এপাশ-ওপাশ দুলছে। আকাশ থেকে একটা ভাঙা চাঁদ বিষণ্ণ চোখে সেই দুলুনি দেখছে। আজকের রাতটা দুঃখের রাত।

খোলা চত্বরে বেশ কয়েকটা গাড়ি পার্ক করা ছিল। তাদের পাশ দিয়ে আমি রনির ব্লকের দিকে এগোলাম। ওকে নিশ্চয়ই সিকিওরিটি ফোন করে দিয়েছে, আমার নামও বলেছে। রনিকে আমার নকল নামটা আগে থেকেই বলা ছিল। তাই ও গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছে। ও জানে, ওর বন্ধু আসছে। বন্ধু যে শত্রুতে পালটে গেছে সেটা জানে না।

একটু পরেই আমি রনির ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে গেলাম।

দরজায় নেমপ্লেট। 'সুপ্রকাশ বসাক, বিজনেস কনসালট্যান্ট'। আমার হাসি পেল। সুপ্রকাশ বসাক। রণদেবের আরও একটা ছদ্মনাম। তার সঙ্গে একটা ছদ্ম প্রফেশান। বিজনেস কনসালট্যান্ট। ড্রাগের বিজনেস ছাড়া আর কোন বিজনেসটা ও বোঝে?

কলিংবেল না বাজিয়ে দরজায় পাঁচবার নক করলাম। ঘণ্টাদুয়েক আগে ফোনে কথাবার্তার সময় এইরকমটাই আমরা ঠিক করেছিলাম।

রণদেবের দরজার ম্যাজিক আই-এ ঘরের আলো এসে পড়েছিল। সেটা হঠাৎ ছায়ায় ঢেকে গেল। মানে, রনি ম্যাজিক আই দিয়ে আমাকে দেখছে।

আমি পাশের ফ্ল্যাটের দরজার দিকে তাকালাম। দরজা বন্ধ। পালিশ করা দরজায় সুন্দর কারুকাজ। তার মাঝে গণেশের মূর্তি। বিমূর্ত রিলিফের কাজ।

রনির দরজা সামান্য ফাঁক হল। সেফ্‌টি চেন আর ওর বাঁ-চোখটা দেখা গেল।

বুঝতে পারলাম, আমার হালকা ছদ্মবেশ ওকে খানিকটা বিভ্রান্ত করেছে।

তাই ফিসফিস করে বললাম, 'সমরেশ। সমরেশ তলাপাত্র...।' আমার এখনকার নকল নাম।

দরজা খুলে গেল। আমি শরীরটা কাত করে ডাফেল ব্যাগটা নিয়ে সাঁত করে ওর ফ্ল্যাটে ঢুকে গেলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে রনি দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঘরে এসি চলছে। তাই ঠান্ডা। ঘরের বাতাসে হুইস্কির হালকা গন্ধ। চোখ গেল সামনের খাটো মাপের কফি টেব্‌লের দিকে। কফি টেব্‌লটা এখন হুইস্কি টেব্‌ল। সেখানে গ্লাস, বোতল, পকোড়া সাজানো।

টেবিলের তিনদিক ঘিরে দুটো সোফা, একটা সেটি। রণদেব সেটিতে গা এলিয়ে বসল। ইশারায় ওর ডানদিকের সোফাটা দেখাল। আমাকে বসতে বলল।

'ওই টেবিলে খালি গ্লাস রয়েছে। একটা নিয়ে নিন। শুরু করুন।' জড়ানো গলায় বলল রনি। ইশারায় ড্রয়িং স্পেসের একটা কোণের দিকে দেখাল। সেখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড টেবিল। তার ওপরে উপুড় করে রাখা তিনটে শৌখিন গ্লাস। তার-ই চার-নম্বরটা এখন রণদেবের হাতে।

না, আজ আর গ্লাস নয়। আজ অন্য কাজ আছে। বড় কাজ।

আমি মাথা নেড়ে 'না' বললাম। তারপর একটু দূরে দেওয়াল ঘেঁষে ডাফেল ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে রাখলাম।

সোফায় বসতে যাব, রণদেব জিগ্যেস করল, 'ওই ব্যাগটা কীসের? কী আছে ওতে?'

আমি হেসে বললাম, 'ইন্টারেস্টিং সব জিনিস আছে। একটু পরেই দেখতে পাবেন...।'

সোফায় আরাম করে বসে একটা পকোড়া মুখে দিলাম।

রনি অনেকক্ষণ ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বুঝতে পারছি, ও আমার গালের স্টিকিং প্লাস্টারটা দেখছে, মাথার টুপিটা দেখছে।

ও জিগ্যেস করল, 'গালে কী হয়েছে? চোট পেয়েছেন? আর মাথায় টুপি?'

আমি হাসলাম। পকোড়া চিবোতে-চিবোতে বললাম, 'এগুলো ডিসগাইজ। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রিকশান।'

রনি গ্লাসে চুমুক দিল। ছোট একটা ঢেঁকুর তুলল।

আমি ওকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। ও এখন শেষবারের মতো মদ

খাচ্ছে। ও এ পর্যন্ত যা করেছে তাতে ওর সারা মুখে পাপের ছাপ থাকা উচিত। কিন্তু নেই। বয়েস প্রায় ষাট হলেও মুখে এখনও একটা বাচ্চা-বাচ্চা ভাব।

রণদেবের মাথায় অনেক চুল। কাঁচাপাকা। মুখটা শরীরের অনুপাতে অনেকটা বড়। লম্বাটে। সাধারণত চশমা পরে, কিন্তু এখন খুলে রেখেছে। নাকের গোড়ায় চশমার সিলমোহর চোখে পড়ছে।

রনির মুখের চামড়া খসখসে এবড়োখেবড়ো। কেমন একটা ডুমো-ডুমো ভাব। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো। বাঁ-কানের নীচে ইঞ্চিখানেক লম্বা একটা কাটা দাগ।

সাংঘাতিক লেভেলের দরকার না হলে আমি কখনও রণদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসি না। আজ ওকে ফোন করে বলেছি, 'দেখা করতে চাই। মারাত্মক ইমার্জেন্সি। কোন অ্যাড্রেসে যাব?'

ও বলেছে, 'গোলাপবাগানে—।'

'গোলাপবাগান' ওয়ার্ডটা এই ফ্ল্যাটের কোডনেম।

'এবারে বলুন—কীসের এমার্জেন্সি।' সোফায় একটু সোজা হয়ে বসল রনি।

রনি এই ফ্ল্যাটে একা থাকে। ওর ফ্যামিলি বলে কিছু নেই। একবার কার কাছে যেন শুনেছিলাম ওর ওয়াইফ অনেক কাল আগে সুইসাইড করেছে। গলায় ওড়না পেঁচিয়ে। কে জানে, সুইসাইড, না হোমিসাইড!

তারপর থেকে রনি টেম্পোরারি ওয়াইফ দিয়ে কাজ চালায়। তাদের সঙ্গে টেম্পোরারি সংসার পাতে। দুটো সংসারের মাঝে সাত-দশ-পনেরোদিনের জন্য ব্যাচিলার ফেজ থাকে। এখন সেই 'সিঙ্গল' ফেজ চলছে। সেটা জেনেই ওর কোতলের ডেট আমি ফিক্স করেছি। বাড়তি উইটনেসের ঝঞ্ঝাট আমি চাই না।

'মাসে-মাসে টাকা ঠিকমতো পৌঁছে যাচ্ছে তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, যাচ্ছে...তবে লোকজনের বোধহয় সন্দেহ হচ্ছে। আপনি বরং তিনমাসের টাকা একবারে পাঠান। তিনমাস পরপর।' আমি কথা বলতে-বলতে পকেট থেকে রুমাল বের করলাম। যে-সোফাটায় বসেছিলাম তার হাতল দুটো মুছতে শুরু করলাম। আমি চাই না, কোথাও আমার হাতের ছাপ থেকে যাক।

হাতল মোছা হয়ে গেলে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'শুধু এই কথাটা বলার জন্যে আপনি দেখা করতে এলেন?' রনি অবাক হয়ে আমার হাতল মোছা দেখছিল। এবার ভুরু কুঁচকে চোখ সরু করে আমার দিকে তাকাল ঃ 'আরে ফোনে বললেন, মারাত্মক এমার্জেন্সি।'

আমি হেসে বললাম, 'জানি, সন্দেহ হচ্ছে সিকিওরিটির সবচেয়ে বড় ইনশিয়োরেন্স। কিন্তু এই কেসে সন্দেহের কোনও ব্যাপার নেই। মারাত্মক ইমার্জেন্সি ব্যাপারটা ওই ডাফেল ব্যাগে আছে। আগে দেখাই, তারপর বলছি...।'

আমি কথা বলতে-বলতে ডাফেল ব্যাগের কাছে এগিয়ে গেছি, ব্যাগের জিপ খুলে ফেলেছি।

ব্যাগের ভেতর থেকে পেতলের টেলিস্কোপটা বের করলাম। রনিকে ওটা দেখিয়ে বললাম, 'ইমার্জেন্সি ব্যাপারটা এই টেলিস্কোপটার মধ্যে আছে।'

টেলিস্কোপটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে ব্যাগ থেকে একটা কালো রঙের রেনকোট বের করলাম। রনির দিকে তাকালাম।

'এখন খুব জোরে বৃষ্টি আসতে পারে। তাই রেনকোটটা গায়ে দিয়ে নিচ্ছি—।' বলে চটপট রেনকোটটা পরে নিলাম।

রণদেব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, ব্যাপারটা কী হচ্ছে। ধন্দ-মাখা চোখে আমাকে দেখতে লাগল।

এবার ব্যাগ থেকে একজোড়া রবারের গ্লাভ্স বের করে নিলাম।

'যদি হঠাৎ-ই খুব শীত পড়ে তা হলে তো গ্লাভ্স লাগবেই—তাই না, মিস্টার মজুমদার?'

'ব্যাপারটা কী বলুন তো? আমি তো মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'এই তো, আর দশ-পনেরো সেকেন্ড—তারপরই সব বুঝতে পারবেন...।' কথা শেষ হতে না হতেই আমি ঝুঁকে পড়ে টেলিস্কোপটা মেঝে থেকে তুলে নিয়েছি।

টেলিস্কোপটা একটু স্পেশাল টাইপের। দু-ফুট মতন লম্বা কনিক্যাল চোঙা একটা। তার ভেতরে লেন্স-টেন্স বা পার্ট্স বলতে কিচ্ছু নেই—শুধু বড় ডায়ামিটারের দিকটায় অবজেক্টিভ লেন্সটা লাগানো অছে। তারপর সেই ফাঁপা চোঙাটাকে আমি সিমেন্ট-বালি স্টোনচিপ্স মেখে ভরতি করেছি। সেটা জমাট বেঁধে টেলিস্কোপটা ব্যাপক ভারী হয়ে গেছে।

টেলিস্কোপটা সামান্য নাড়াচাড়া দিয়ে ওটার ওজনটা ফিল করলাম। ফিল

গুড। তারপর কয়েকটা পা ফেলে রণদেবের কাছে হাজির হয়ে গেলাম।

রণদেব বিভ্রান্ত ছলছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। একটা অঙ্ক কীভাবে সল্‌ভ করবে সেটা বুঝতে না পারলে কোনও মেধাবী ছাত্রের যেমন বিভ্রান্ত অবস্থা হয়। আর চোখের ছলছল অবস্থাটা হুইস্কির এফেক্ট।

রণদেব মজুমদার আসলে একটা পিয়োর হারামজাদা। ড্রাগ র‍্যাকেটের ব্যবসায় তরক্কি করতে গিয়ে বহু ইয়াং ছেলেমেয়ের সর্বনাশ করেছে।

পিয়োর হারামজাদা আমিও। হারামজাদাদের জন্যে একেবারে ডবল হারামজাদা।

এখন দুই হারামজাদা মুখোমুখি। মাহেন্দ্রক্ষণ। সুপার মোমেন্ট অফ দ্য ডে।

আমার মাথায় টুপি। গায়ে ওয়াটারপ্রুফ। হাতে দস্তানা। আর দস্তানার শক্ত মুঠোয় একটা বিচিত্র টেলিস্কোপ।

'এই টেলিস্কোপটা দেখুন। দারুণ ইন্টারেস্টিং...।'

রনি টেলিস্কোপটার দিকে হাত বাড়াল। আর আমি 'অপারেশান রনি' শুরু করলাম।

প্রচণ্ড শক্তিতে ভারী টেলিস্কোপটা দিয়ে শূন্যে একটা বৃত্তচাপ এঁকে ওটা রনির নাকের ওপরে আড়াআড়ি বসিয়ে দিলাম। ও ডানহাতটা তুলে আঘাতটা আটকাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমার স্পিড ওর রিফ্লেক্সকে হারিয়ে দিল।

যতটা শব্দ হবে ভেবেছিলাম ততটা হল না। তবে টেলিস্কোপটা বেঁকে গেল। ওটার গায়ে রনির রক্তও লেগে গেল। কিন্তু অস্ত্রটার গুণের তেমন কোনও হেরফের হল না। তাই আবার চালালাম—ওর মাথা লক্ষ্য করে। যেন ওভারপিচ বল পেয়ে ছক্কা হাঁকাচ্ছি।

এক ছক্কাতেই রনির শরীরটা সেটিতে হেলান দিয়ে এলিয়ে গেল। না, চিৎকার ও করতে পারেনি। ওর মুখ দিয়ে শুধু গোঙানির শব্দ বেরোচ্ছিল। আর মুখটা লালে লাল। নাক, মুখ, চোখ কিছুই আর ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না।

রক্ত ছিটকে এসেছে আমার গায়ে।

আসুক, ক্ষতি নেই। ওয়াটারপ্রুফ সেসব প্রবলেম সামলে দেবে।

কিন্তু শয়তানটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মরেছে তো? নাকি সেভেন্টি কি এইটি পার্সেন্টের গাঁটে আটকে আছে?

দুর, অতসব ভেবে লাভ নেই। শিয়োর হওয়াটা জরুরি।

অতএব আবার মারো ছক্কা। এবং ছক্কার পর ছক্কা।

রনির মাথাটা—কিংবা বলা ভালো মাথার যেটুকু বাকি আছে সেটা—এখন কফি-টেব্‌লে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। টেবিলের গ্লাস আর বোতল সব উলটে গেছে। মেঝেতে মাল গড়াচ্ছে।

আমি ওর পাল্‌স দেখলাম। নেই। ঘাড়ের পাশে আঙুলের চাপ দিয়ে দপদপানি ফিল করতে চাইলাম। নেই। তখন ওর বডির কাছ থেকে পিছিয়ে এলাম। আসল কাজ শেষ, কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকি। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে আমাকে এখন অনেক কিছু করতে হবে। এবং সেটা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি।

বেঁকা-টেরা হয়ে যাওয়া টেলিস্কোপটা ডাফেল ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম। ব্যাগ থেকে কমন ব্র্যান্ডের একটা কন্ডোমের প্যাকেট বের করলাম। তারপর একটা সস্তা জাতের বিদেশি সেক্স ম্যাগাজিন বের করে নিলাম।

বেশ কিছুদিন ধরেই আমি 'অপারেশান রনি'-র প্ল্যান করেছি। সেই প্ল্যানমাফিক-ই কন্ডোমের প্যাকেট আর ওই বি-ক্লাসি পর্নো ম্যাগাজিন আমার সঙ্গে এনেছি।

ওগুলো নিয়ে রণদেবের বেডরুমে ঢুকলাম। ওর বিছানার কাছে গেলাম। কন্ডোমের প্যাক থেকে একটা কন্ডোম বের করে ওটার মোড়কটা ছিঁড়ে নিলাম। কন্ডোমটা আমার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে মোড়কটা গুঁজে দিলাম রনির বালিশের নীচে।

সামনেই চোখে পড়ল দেওয়ালে গাঁথা কয়েকটা তাক। সেখানে হাফডজন শো-পিস আর ডজনখানেক গল্প-উপন্যাস। বইগুলোর ফাঁকে কন্ডোমের গোটা প্যাকেটটা ঢুকিয়ে দিলাম।

এবারে ম্যাগাজিনটার পালা।

ওটা খুলে একটা ন্যাংটো মডেলের ছবি ছিঁড়ে নিলাম। পাতাটা আমার পকেটে ঢুকে গেল। ম্যাগাজিনটাকে একটু লাটঘাট করে মেঝেতে ফেলে দিলাম। তারপর ফিরে এলাম ড্রয়িং স্পেসে—মানে, ডেডবডির ঘরে।

এখনও একটা জরুরি কাজ বাকি। রণদেবের মোবাইল ফোনের খোঁজ করতে হবে। হারামজাদাটা ক'টা মোবাইল ব্যবহার করত কে জানে।

আমি ওর ফ্ল্যাট সার্চ করতে শুরু করলাম। ড্রয়ার, দেরাজ, ক্যাবিনেট, জামাকাপড়ের আলমারি সব পাগলের মতো হাঁটকাতে লাগলাম।

এই তো, বেডরুমের শো-কেসে একটা পাওয়া গেছে! টিভির নীচের

তাকে একটা। ড্রয়িংরুমের টেবিলের ড্রয়ারে একটা। তারপর...।

নয়-নয় করে পাঁচ-পাঁচটা মোবাইল ফোন খুঁজে পেলাম। চটপট সবক'টা ফোন অন করলাম। না, এখন ফোন-নাম্বার চেক করে-করে দেখার সময় নেই। আর হ্যান্ডসেটগুলো নিয়ে যদি কেটে পড়ি তা হলে পুলিশ আই.এম.ই.আই.নম্বর থেকে সেগুলো ট্রেস করে ফেলবে। হ্যান্ডসেটগুলো চুরি করার চেয়ে বেটার মেথড আমার জানা আছে।

ওগুলো নিয়ে সোজা বাথরুমে গেলাম। একটা পিঙ্ক কালারের প্লাস্টিকের বালতিতে আধবালতি জল ছিল। তার মধ্যে ফোনগুলো ফেলে দিলাম। এবার নিশ্চয়ই ওগুলো শর্ট-টট হয়ে ওদের মেমোরি ঘেঁটে যাবে।

ড্রয়িংরুমে ফিরে এলাম। ক্রাইম সিন ঠিকঠাকভাবে সাজানোর জন্যে আর মাত্র কয়েকটা তুলির টান বাকি।

ডাফেল ব্যাগ থেকে একটা ছোট প্লাস্টিকের কৌটো বের করলাম। কৌটো ভরতি গোলমরিচের গুঁড়ো। কৌটোটা নিয়ে সব ঘরে—রান্নাঘরে, এমনকী বাথরুমে—গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিলাম। এতে পুলিশ এবং পুলিশের কুকুরের বুদ্ধি ঘেঁটে যাবে।

খালি কৌটোটা ডাফেল ব্যাগে আবার ঢুকিয়ে রাখলাম।

এবার শেষ কাজ। এই কাজটা করলে পুলিশ নির্ঘাত ধরে নেবে, রনির খুনি একজন সাইকোপ্যাথ, সাইকোটিক কিলার।

আমি নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রণদেবের ডেডবডির ওপরে হিসি করতে লাগলাম। পিচকিরিটা এপাশ-ওপাশ একটু ছড়িয়েও দিলাম।

যাক, কাজ শেষ। এবারে জাল গোটানোর পালা।

সাবধানে ফ্ল্যাটের দরজার কাছে সরে গেলাম। রেনকোটটা খুলে ডাফেল ব্যাগে ঢোকালাম। এরপর পলিথিন প্যাকেটে মোড়া একজোড়া নতুন স্নিকার ব্যাগ থেকে বের রলাম। পায়ের জুতোজোড়া ব্যাগে ঢুকিয়ে দিলাম। নতুন জুতো পরে তার প্যাকেটটা আবার ব্যাগে ফিরিয়ে দিলাম।

ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিলাম। সাবধানে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দরজা বন্ধ করে পকেটে থেকে একটা চাবি বের করলাম। না, এটা রনির ফ্ল্যাটের নকল চাবি নয়। নকল চাবি তৈরি করার সুযোগ আর পেলাম কোথায়! এই চাবিটা ওই টাইপেরই দেখতে একটা চাবি।

নকল চাবিটা লকে ঢুকিয়ে খুব জোড়ে চাড় দিলাম। চাবিটা বেঁকে গেল। ওটাকে দু-চারবার টানাটানি করলাম। না, গর্ত থেকে বেরোল না। না বেরোক

ক্ষতি নেই। ওটা ওখানে থাক।

না, লিফ্‌ট ব্যবহার করব না আমি। ওঠার সময়েও করিনি। মার্ডারারদের পক্ষে সিঁড়ি সবসময়েই বেটার। তাই সিঁড়ি নামতে শুরু করলাম। নামতে-নামতেই গ্লাভ্‌সজোড়া খুলে পকেটে ঢুকিয়ে নিলাম।

গুড বাই, ড্রাগ মাফিয়া রনি। উঁহু, মাফিয়া নয়—'এক্স' মাফিয়া।

২. খুনের পরে

ক্রাইম সিন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিলেন তিনজন। সিনিয়ার ইনস্পেকটার বিকাশেন্দু সামন্ত। আর তাঁর সঙ্গী দুজন জুনিয়ার সাব-ইনস্পেকটার—তপেন ঘোষ আর নারায়ণ মণ্ডল।

একটু আগেই ডক্টর, ফটোগ্রাফার আর ফোরেনসিকের লোকজন কাজ শেষ করে চলে গেছে। ডেডবডি এখনও রিমুভ করা হয়নি। মনে হয়, আরও আধঘন্টা কি চল্লিশ মিনিট লাগবে।

ডক্টরের মতে খুনটা হয়েছে তিন থেকে চার ঘন্টা আগে। কারণ, রিগর মরটিস এখনও সেট ইন করেনি। তবে বডির আশেপাশে বেশ কয়েকটা মাছি উড়ছে, কখনও-কখনও বসেও পড়ছে বডিতে।

বিকাশেন্দু সামন্ত খুনের কেস-টেস ঘাঁটছেন প্রায় চোদ্দো বছর। বয়েস বিয়াল্লিশ কি তেতাল্লিশ হলেও মুখে তার চেয়ে বেশি সময়ের পোড় খাওয়া ছাপ। লম্বা চেহারা। গায়ের রং একসময় ফরসা ছিল—এখন তামাটে। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। কপালে কয়েকটা ভাঁজ একেবারে স্থায়ী আস্তানা গেড়েছে। চেহারা এখন খানিকটা ক্ষয়ে গেলেও এককালে যে উল্লেখযোগ্য ছিল সেটা বোঝা যায়। সিগারেটের অভ্যাসে ঠোঁটজোড়া কালচে হয়ে গেছে।

তপন ঘোষের চেহারা বেশ বাবু-বাবু গোছের। আটাশ কি তিরিশের টাটকা যুবক। স্বাস্থ্য আঁটোসাঁটো। মাথায় কোঁকড়া চুল। চোখে চশমা। মুখে সবসময় একটা বিজ্ঞ-বিজ্ঞ ভাব। কিন্তু এখন তপেন নাক কুঁচকে ছিল। ঘরের বিচিত্র দুর্গন্ধটাকে ঠেকানোর চেষ্টা করছিল।

ঘরের দুর্গন্ধটা বিচিত্র এই কারণে যে, সেখানে মিশে আছে জমাট রক্তের আঁশটে গন্ধ, গোলমরিচের গন্ধ, পেচ্ছাপের গন্ধ আর হুইস্কির গন্ধ।

তপেন উবু হয়ে মেঝেতে বসেছিল। কোথায়-কোথায় গোলমরিচের গুঁড়ো পড়েছে সেটা দেখার চেষ্টা করছিল। ওর হাতে একটা খাতা আর পেন। মাঝেমধ্যে সেই খাতায় নোট নিচ্ছিল।

নারায়ণ মণ্ডল মোটাসোটা আলসে লোক। ভালো-মন্দ খেতে ভালোবাসে। নেয়াপাতি-ভুঁড়ির জন্য ওকে সহকর্মীদের টিটকিরি শুনতে হয়। মাথায় কীর্তনিয়া ঢঙের লম্বা-লম্বা চুল। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি হলে কী হবে, এখনও বুদ্ধি পাকেনি। অত্যন্ত সরলমতি হওয়ার জন্য যেখানে-সেখানে আলটপকা মন্তব্য করে বসে। এজন্য বিকাশেন্দু সামন্ত ওকে কম বকাবকি করেন না।

'স্যার, মনে হয় মারা যাওয়ার আগে রণদেব মজুমদার ভয়ে হিসি করে দিয়েছে...।' মণ্ডল বলল। ও শিকারি কুকুরের মতো এঘর-ওঘর ঘোরাঘুরি করছিল, ছোঁকছোঁক করছিল, এটা-সেটা উলটেপালটে নেড়েচেড়ে দেখছিল। ক্যাবিনেট, ড্রয়ার, আলমারি, রান্নাঘরের নানান কৌটো আর বাসনপত্র ছানবিন করছিল।

যখনই ও কোনও ক্রাইম সিনে হাজির হয় তখনই এরকম ছটফটে পায়ে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। হাজার বলেও ওকে থামানো যায় না। তাই দপ্তরে ওর নাম 'নারায়ণ বুলডগ'।

নারায়ণ মণ্ডলের কথায় বিকাশেন্দু বললেন, 'সেটা পোস্টমর্টেম রিপোর্টের সঙ্গে ফোরেনসিক রিপোর্ট ট্যালি করালেই প্রমাণ হয়ে যাবে। তবে আমার মনে হচ্ছে, এই মার্ডারটা কোনও সাইকোপ্যাথের কাজ। ওই ইউরিনেশানের ব্যাপারটা যদি মার্ডারারের কাজ হয় তা হলে তার সঙ্গে মার্ডারের ব্রুটালিটি আর সাডেননেস কনসিডার করলে একটাই পসিব্‌ল উত্তর ঃ মার্ডারার একজন সাইকোটিক কিলার। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম, মনে হচ্ছে এটা মার্ডার ফর গেইন নয়—মার্ডার ফর রিভেঞ্জ। তা ছাড়া...।'

নারায়ণ আর তপেন ওদের ওপরওয়ালার টেকনিক্যাল এক্সপ্লানেশন মন দিয়ে শুনছিল আর মাথা নাড়ছিল। তপেন মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। দু-হাতের তালু প্যান্টে ঘষে মুছল। তারপর প্রশ্ন করল, 'স্যার, একটু আগে আপনি বললেন, মার্ডার ওয়েপনটা কোনও ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট। কিন্তু কী টাইপের ব্লান্ট ইনস্ট্রুমেন্ট সেটা কি বোঝা যাচ্ছে? কারণ, স্যার, মার্ডারার কিন্তু সিকিওরিটিকে ধোঁকা দিয়ে মার্ডার ওয়েপনটা নিয়ে এই রনি লোকটার ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছে...।'

'কারেক্ট। কীভাবে মার্ডারের সিকিওরিটি বেল্ট ক্র্যাক করল সেটাই তখন থেকে ভাবছি। কী টাইপের ওয়েপন হতে পারে...?'

নারায়ণ মণ্ডল হঠাৎ-ই ছিকটে এদিক-ওদিক চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। হাতে একটা প্লাস্টিকের বালতি। বালতিতে আধবালতি জল। জলের মধ্যে কী যেন রয়েছে।

'স্যার, এই বালতিতে পাঁচ-পাঁচটা মোবাইল ফোন—দেখুন...।' বালতিটা মেঝেতে রেখে নারায়ণ বলল। এবং বিকাশেন্দু সামন্ত কিছু বলে ওঠার আগেই এক-একটা ফোন বালতি থেকে তুলে নিল, পটাপট তাদের বোতাম টিপতে লাগল।

'কী করছ? কী করছ?' বিকাশেন্দু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, কিন্তু নারায়ণ মণ্ডল শুনলে তো!

'কী করলে, নারানদা?' তপেন ধমকে উঠল, 'জানো, কতগুলো ক্লু হাতছাড়া হয়ে গেল আমাদের!'

নারায়ণ সাদা দাঁতের সারি দেখিয়ে হাসল ঃ 'জলে ডোবানো মোবাইলের মধ্যে আবার কোন জাতের ক্লু থাকবে? ড্রাই মোবাইল ফোন হলে তবুও বুঝতাম। সেটার বোতাম টেপাটেপি করলে হয়তো কিছু পাওয়া যেত। কী স্যার, ঠিক বলছি তো?' বিকাশেন্দুর দিকে তাকাল নারায়ণ। ওর দু-হাতে দুটো মোবাইল।

'নারাণ, তুমি দয়া করে একটু থামবে! মার্ডার ইনভেস্টিগেশানের সব বুঝে বসে আছে। রাখো ফোনগুলো!'

ধমক খাওয়ামাত্রই নারায়ণ চমকে উঠে হাতের মোবাইল দুটো আবার বালতির মধ্যে ফেলে দিল।

'তপেন, অনেক হয়েছে—এবার অ্যাম্বুলেন্সের লোকদের ফোন করো। বলো ওপরে আসতে। বডি রিমুভ করতে হবে।'

তপেন ঘোষ পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে বোতাম টিপতে শুরু করল।

নারায়ণ মণ্ডল আবার ঘোরাঘুরি শুরু করে দিয়েছে।

বিকাশেন্দু একটু অন্যমস্ক হয়ে পড়েছিলেন। রণদেবের বেডরুমে বালিশের নীচ থেকে কন্ডোমের একটা ছেঁড়া র‍্যাপার পেয়েছেন। পেয়েছেন একটা পর্নো ম্যাগাজিন। তার আবার একটা পাতা ছেঁড়া। কী ছিল সেই পাতায়? এই মার্ডারের সঙ্গে কি কোনও পর্ন মডেল জড়িয়ে আছে?

হঠাৎই হুড়মুড় করে অনেক কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ ভেসে এল। মনে হল, শব্দটা রান্নাঘরের দিক থেকে শোনা গেল।

বিকাশেন্দু আর তপেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সেদিকে।

রান্নাঘরের দেওয়ালে গাঁথা মার্বেলের তাকে অনেকগুলো প্লাস্টিকের কৌটো আর কাচের শিশি সাজানো ছিল। নারায়ণ মণ্ডল বোধহয় সূত্রের খোঁজে সেখানে ঘাঁটাঘাঁটি করছিল। কীভাবে যেন সেইসব কৌটো আর শিশি উলটে পড়ছে মেঝেতে। বেশ কয়েকটা শিশি ভেঙে সাত টুকরো হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে গেছে। আর প্লাস্টিকের কৌটোগুলো এদিক-ওদিক গড়াগড়ি খাচ্ছে।

তারই মাঝে পড়ে আছে কালোরঙের একটা সস্তা মোবাইল ফোন।

'স্যার, দেখুন, আর একটা মোবাইল! ছ'নম্বর...এইসব কৌটোগুলোর ফাঁকে লুকোনো ছিল...।'

'ওটা খবরদার টাচ করবে না!' কিচেনের সামনে পৌঁছেই বিকাশেন্দু নারায়ণকে ধমক দিয়ে সাবধান করলেন, 'এতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট থাকতে পারে—।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার।' বলতে-বলতে নারায়ণ পকেট থেকে রুমাল বের করল। চোখের পলকে রুমাল দিয়ে মোবাইলটাকে জড়িয়ে নিয়ে বলতে গেলে ছোঁ মেরে তুলে নিল।

এবং বিকাশেন্দু বাধা দেওয়ার আগেই ওটার বোতাম টিপতে শুরু করল।

'কী করছ! কী করছ!' বিকাশেন্দু নারায়ণ মণ্ডলের ওপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলেন।

কিন্তু নারায়ণ ছিটকে সরে গেল একপাশে ঃ 'দাঁড়ান না, স্যার, দেখি মাফিয়ার বাচ্চাটা লাস্টে কার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে...।'

কথা বলতে-বলতেই 'কল লগ' থেকে লাস্ট ফোন-নম্বরটা বের করে 'ডায়াল' বোতামটা টিপে দিল নারায়ণ।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিকাশেন্দু সামন্তর পকেটে ওঁর মোবাইল ফোন বাজতে শুরু করল।

নারায়ণ মণ্ডল আর তপেন ঘোষ অবাক চোখে ওদের 'স্যার'-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

বিকাশেন্দু ফোনটা পকেট থেকে বের করে রিসিভ করলেন। 'হ্যালো' বললেন।

নারায়ণ সেই 'হ্যালো' সরাসরি এবং ফোনের মধ্যে দিয়ে শুনতে পেল।

ও অবাক গলায় জানতে চাইল, 'স্যার, আপনার ফোন-নম্বর এই ড্রাগ মাফিয়ার ফোনে এল কেমন করে?'

৩. এবং তারপর

পাঁচটা মোবাইল ফোন আমি খুঁজে পেয়েছিলাম। শুধু ছ'নম্বর ফোনটাই যা খুঁজে পাইনি। ভুঁড়িওয়ালা অপদার্থ সাব-ইনস্পেক্টর নারায়ণ মণ্ডল এখন সেই ফোনটা কানে চেপে ধরে আমার সঙ্গে কথা বলছে। আমি একজন পুলিশ অফিসার, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার ফোন ধরা হাত কাঁপছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখেও কি একটু-একটু ঝাপসা দেখছি আমি? সত্যিই তো, আমার ফোন নাম্বার ওই ড্রাগ মাফিয়ার ফোনে গেল কেমন করে? পুলিশ তো এখন এই প্রশ্নটার-ই উত্তর খুঁজবে।

আমি একা, তুমি একা

বসন্তের বাতাস যেমন খেয়ালখুশিমতো যখন-তখন জানলা-দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে অথবা বেরিয়ে যায়, রাইয়ের যাওয়া-আসা অনেকটা যেন সেইরকম।

আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের একদিন পর থেকেই রাইয়ের চালচলন এরকম সহজ-সরল আর সাবলীল হয়ে গেছে—যেন আমার কতবছরের চেনা!

মাত্র তিনদিন হল কমলপুরের এই বাড়িটায় এসে উঠেছি। ঠিক করেছি নিরিবিলিতে পাঁচ-সাতটা দিন কাটাব। কিন্তু রাই চোখের সামনে হাজির হওয়ামাত্রই বুঝতে পেরেছি 'নিরিবিলি' ব্যাপারটা হিলিবিলি হয়ে গেছে। অবশ্য তাতে আমি কিছু মনে করিনি। কারণ, রাইকে দেখতে এত সুন্দর! আর এত কথা বলে মেয়েটা!

'এই ধ্যাড়ধেড়ে কমলপুরে আপনি কী করতে এসেছেন?'

আমার লেখার টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ও। প্রশ্নটা করা শেষ হতেই ছোট্ট ব্যাকজাম্প দিয়ে টেবিলে বসেই পড়ল। তারপর ঘরের এপাশ-ওপাশ জরিপ করতে লাগল।

তিনটে ছোট ছোট জানলা আর একটা মামুলি ছোট্ট বিছানা ছাড়া ঘরে আর কিছুই নেই।

আমি একটু সময় নিয়ে থেমে-থেমে বললাম, 'আমি একটু-আধটু গল্প-টল্প

লিখি। তো বলতে পারো, নিরিবিলিতে ওই লেখালিখি করতেই এসেছি—।'

'আপনি তো একা এসেছেন! বউদিকে সাথে আনেননি?'

মেয়েটার দেখছি কোনও রাখঢাক নেই! হয়তো আমার বলা উচিত ছিল, 'পারসোনাল ব্যাপারে তোমার এত কৌতূহল কেন?' কিন্তু সে-কথা বলে উঠতে পারলাম না। ওর চোখদুটো এত সরল আর সুন্দর যে, সেই চোখের দিকে তাকিয়ে কোনওরকম বকাঝকা বা ধাতানি দেওয়া যায় না।

আমি ওকে দেখছিলাম। একুশ কি বাইশ হবে। ফরসা। খোলা চুল। সবুজ চুড়িদার। ঠোঁটজোড়া সামান্য পুরু। বিকশিত। গলায় সরু চেন। কানে সোনার ফুটকি দুল।

'আনিনি। কারণ আনার মতো কেউ নেই।'

'আপনি একা?'

'হ্যাঁ—একা।'

'আমিও একা—।' অল্প হেসে রাই বলল।

মনে পড়ল, প্রথম দিন এ-বাড়িতে এসে বাইরের মেঠো উঠোনে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সময়টা ছিল পড়ন্ত বিকেল। তখনই পাশের জমিটার দিকে চোখ গিয়েছিল। জমির সর্বত্র অযত্নে বেড়ে ওঠা আগাছার রাজত্ব। মাঝখানে বসে আছে বেশ বড় মাপের একটা একতলা বাড়ি। রোদে-জলে বাড়িটার রং চটে গেছে।

হঠাৎ-হঠাৎ অবসাদে ডুবে যাওয়াটা আমার একটা অসুখ। সেটা নিয়ে বেশ কয়েকবার ডক্টরের সঙ্গে কথা বলেছি। অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্ট ট্যাবলেট দেওয়া ছাড়াও তিনি আমাকে কোনও নিরিবিলি জায়গায় চার-ছ'দিনের জন্যে ঘুরে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। আমার লেখালিখির বাতিক আছে শুনে লেখা-লিখিতে বেশি করে মন দিতে বলেছেন। সেইজন্যেই এখানে আসা।

উঠোনে ঘোরাঘুরি করতে-করতে পাশের বাড়িটার দিকে চোখ পড়েছিল। তখনই দেখি বাড়িটার সদর দরজার কাছে একটি মেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে পশ্চিমের হেলে পড়া সূর্যের দিকে।

আগাছার শুকনো ডালপালার ফাঁক দিয়ে আমি মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছিলাম। বেশ লম্বা। মাথার চুল খোলা। গায়ে সবুজ চুড়িদার। কেমন এক আবিষ্ট চোখে নরম সূর্যের দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর চটপট পা ফেলে আগাছার ডালপালা দু-হাতে সরিয়ে চলে এল আমার কাছে।

আমাদের দুজনের মাঝে ভাঙা বাঁশের বেড়া। বেড়া বরাবর খানিকটা করে আগাছার ঝোপ।

'আপনি কে?' প্রশ্নটা ও এমন ঢঙে করল যেন ওর এলাকায় না-বলে ঢুকে পড়েছি।

নিজের নাম বললাম। আরও বললাম, এ-বাড়িতে আমি ক'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি। বাড়ির মালিক আমার কলকাতার অফিস-কলিগ এবং বেস্ট ফ্রেন্ড বিক্রমজিৎ শেঠ। ওর কাছ থেকে চাবি নিয়ে এসেছি।

'আমার নাম রাই—' উচ্ছ্বলভাবে জানাল। তারপর ওর পেছনদিকে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িটার দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওটা আমাদের বাড়ি...।'

'তুমি কী পড়ো?'

'গল্পের বই পড়ি—।'

'না, মানে, আমি পড়াশোনার কথা জিগ্যেস করছিলাম...।'

হাসল ঃ 'ওসব তো কবেই শেষ! ভালোই হল, আপনি এ-বাড়িতে এসেছেন। ক'দিন খুব গল্প করা যাবে, বলুন?'

রাইয়ের সঙ্গে প্রথম আলাপের পর-ই আমাদের কেমিস্ট্রিটা জমে গেল। এ-বাড়িতে ওর যখন-তখন আনাগোনা আমার টুরিস্ট জীবনের সঙ্গে সিমলেসভাবে জুড়ে গেল।

রাই একদিন বিকেলে এসে হানা দিল।

'একটু চা করে খাওয়ান তো—।'

ও যে রান্না-টান্না জানে না সেটা দ্বিতীয়দিনেই জানিয়েছে। আর আমি যে ওই ব্যাপারটা অল্পবিস্তর জানি, সেটাও তখন জেনে গেছে।

আমি ইলেকট্রিক কেটলিতে চা তৈরি করতে লাগলাম।

রাই আমার লেখার টেবিলের কাছে চলে গেল। টেবিলে লেখার কাগজপত্র আর পেন ছিল। সেগুলো নাড়াচাড়া করতে-করতে হঠাৎই লেখার কয়েকটা পৃষ্ঠা তুলে নিল হাতে। সেগুলো পড়তে শুরু করল।

'বাঃ, আপনি তো দারুণ লেখেন!'

'তাই? এ জন্যে তোমার একটা "থ্যাংক ইউ" পাওয়া উচিত—।'

'আপার লেখা একটা বই আমাকে পড়তে দেবেন তো—। সঙ্গে আছে?'

'হ্যাঁ—আছে। দেব। যাওয়ার সময় নিয়ে যেয়ো।'

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ওর কাছে এলাম।

'এই নাও—আমার কাঁচা হাতে তৈরি অদ্ভুত চা খাও।'

ও লেখার কাগগুলো টেবিলে রেখে দিয়ে চায়ের কাপ নিল। টেবিলের কাছে রাখা চেয়ারটায় বসে পড়ল। কাপে শব্দ করে লম্বা চুমুক দিল।

'আঃ—দারুণ!'

আমি বিছানার এক কোণে বসে কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালাম।

'তুমি যে এরকম হুটহাট করে আমার ঘরে চলে আসো, তোমাকে কেউ বারণ করে না?'

'কে করবে?' সুন্দর ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে দেখল ঃ আমিই আমার গার্জেন।'

'কেন? তোমার মা-বাবা তোমার সঙ্গে থাকে না?'

'থাকে, তবে আমার লাইফে ইনটারফিয়ার করতে পারে না। আমরা তিনজনেই ইন ফ্যাক্ট স্বাধীন। যে যার মতো থাকি—।'

'তোমার কোনও...ইয়ে...বয়ফ্রেন্ড নেই?'

'আগে ছিল। এখন আর নেই।' রাই জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

'স্টোরিটা আমি শুনলে আপত্তি আছে?' হেসে জিগ্যেস করলাম, 'হয়তো লেখার কোনও আইডিয়া পেয়ে যাব...।'

'না, আপত্তি আর কীসের! সেসব তো কবেই "দ্য এন্ড" হয়ে গেছে।'

রাই তারপর ওর গল্পটা শোনাল।

'ওর নাম ছিল জিকান, বাইক-পাগল ছেলে। দিনরাত বাইক চালাত। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ওর টানে ভেসে গেলাম। ও তখন থার্ড ইয়ারে।' পরপর কয়েকটা চুমুক দিয়ে চা শেষ করে ফেলল রাই। জানলার বাইরে তাকিয়ে গাছের পাতা আর ফুল দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ঃ 'ওর ভীষণ উলটোপালটা খরচের হাত ছিল। দু-হাতে টাকা ওড়াত। আমি সবসময় বারণ করতাম, কিন্তু ও সেসব কথায় পাত্তা দিত না। বাইক নিয়ে মেতে থাকত। ওর মতো আরও তিন-চারজন বাইকার মিলে ওরা একটা গ্রুপ তৈরি করেছিল। শুনেছিলাম, রাতে নাকি ওরা বাইক নিয়ে রেসের কম্পিটিশান করত। এ নিয়ে ওকে জিগ্যেস করেছিলাম, কিন্তু ও ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল।

'ওর টাকা ওড়নোর বহর দেখে আমার একটু অবাক লাগত। বন্ধুদের মারফত যেটুকু জানতাম তাতে বুঝেছিলাম, জিকানের ফ্যামিলি খুব একটা বড়লোক ছিল না। তা হলে এত টাকা ও পেত কোথায়?

'জানেন, এ নিয়ে ওকে বেশ কয়েকবার কোশ্চেন করেছিলাম, কিন্তু জিকান কোনও জবাব দেয়নি। একবার তো রেগে গিয়ে আমাকে উলটোপালটা অনেক কথা বলেছিল।

'তারপর...তারপর একদিন জানতে পারলাম, জিকানদের গ্রুপটা রেগুলার ডাকাতি করে, লুঠ করে। একটা এ.টি.এম. ভেঙে টাকা লুঠ করার সময় ওরা অল্পের জন্য ধরা পড়তে-পড়তে বেঁচে যায়। অন্য বন্ধুদের থেকে খবরটা আমি জানতে পারি। তখন ওকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে গিয়ে কোনওরকম ইন্ট্রো ছাড়াই ঝড় তুলি। মনে আছে, দুজনেই ব্যাপক চেঁচিয়েছিলাম। একসময় এক্সাইটেড হয়ে ও কনফেস করে। বলে, হ্যাঁ, ও ডাকাতি করে, কারণ ওর টাকার দরকার।

'ব্যস, সেই মোমেন্টেই আমি ওঁর সঙ্গে কাট্টি করে দিই। ওয়ান, টু, থ্রি—ব্রেক আপ।' একটা লম্বা শ্বাস ফেলল রাই। আমার দিকে তাকাল। মনে হল, আমার কাছ থেকে কোনও কমেন্ট শুনতে চায়।

'ব্রেক আপ করে ভালোই করেছ, রাই। আমি হলেও তাই করতাম।'

'জানেন, সেদিন সারাটা রাত আমি কেঁদেছিলাম। বাট ব্রেক আপ-এর ডিসিশন থেকে সরতে পারিনি...।'

রাইয়ের চোখের কোণে জলের ফোঁটা দেখতে পেলাম।

আমার চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাপটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে আলতো গলায় বললাম, 'মনখারাপ কোরো না। এখন অন্য কথা ভাবো। তোমার মতো সুন্দর মেয়ের জন্যে এখনও অনেক সুন্দর জীবন পড়ে আছে।'

'তাই?' আমার দিকে পূর্ণ চোখে তাকাল রাই। মুখে বিষাদের প্রলেপ। অথচ চোয়ালের কাছে রেখা শক্ত।

জানলা দিয়ে বসন্তের বাতাস আসছিল। হঠাৎই সেটা বন্ধ হয়ে কেমন একটা গুমোট তৈরি হল। বাইরে ধীরে-ধীরে সন্ধের ছায়া নামছে। গাছের পাতা, ডালপালা অস্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ।

বাইরে কোথায় যেন একটা কোকিল ডেকে উঠল। সে-ডাকের ধরণ এমন যে, মনে হল যেন ভয় পেয়েছে। কিন্তু কোকিল ভয়ে ডাকবে কেন? মনে-মনে হাসি পেল আমার। উঠে গিয়ে টিউবলাইটের সুইচটা অন করে দিলাম।

আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় দেখলাম, রাইয়ের কপালে গলায় ঘাম চিকচিক করছে। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরলেও তাতে তেমন কাজ হচ্ছে না।

ও হাতের পিঠ দিয়ে ঘাম মুছে বলল, 'আপনার ঘরে বড্ড গরম।'

হেসে বললাম, 'কেন, তোমার ঘরে গরম নেই?'

'না—নেই। আমি তো এ.সি. ঘরে থাকি। ঘরটা মাপে ছোট হলেও বেশ ঠান্ডা।'

'তুমি এ.সি. ঘরে থাকো! বাব্বাঃ, ওসব বড়লোকের ব্যাপার!' ঠাট্টা করে কথাটা বললাম বটে, কিন্তু মনে-মনে রাইদের বাড়িটার চেহারার কথা ভাবছিলাম। বাড়িটার যেরকম শ্রীহীন দশা! এ-বাড়িতে এ.সি. মানে দাঁড়কাকের বডিতে ময়ূরের লেজ।

রাই হঠাৎ হাত নেড়ে বলল, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে—এবার যাব। দিন, দিন...আপনার লেখা কী বই দেবেন বলছিলেন দিন...।'

বিছানার একপাশে কয়েকটা বই রাখা ছিল। তার মধ্যে থেকে একটা তুলে নিয়ে বললাম, 'এটা আমার সবচেয়ে পছন্দের বই। দাঁড়াও, তোমার নাম লিখে দিই...।'

টেবিলের কাছে এসে পেনটা তুলে নিলাম ঃ 'রাই, এই উপন্যাসটা ডিপ্রেসনে কাবু একজন নিঃসঙ্গ মানুষের কাহিনি। মনে হয় তোমার ভালো লাগবে...।'

ওর নাম লেখা হয়ে গেলে বইটা ওর হাতে দিলাম।

রাই লেখাটা দেখল। তারপর চলে এল বইয়ের মলাটে। বইয়ের নামটা ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করল, ' "আমি একা, তুমি একা"।' তারপর বলল, 'নামটা ফ্যানটাস্টিক দিয়েছেন তো!'

আমি হাসলাম।

রাই চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'জিকানের কথা আর জানতে চাইলেন না তো?'

'না, মানে, ভাবলাম জিগ্যেস করলে তোমার কষ্ট হবে—।'

'কষ্ট? কীসের কষ্ট? এখন আর আমার কোনও কষ্ট নেই।'

'জিকানের কী হল শেষ পর্যন্ত?'

'ওর কী হল জানি না, তবে আমার কী হল সেটা জানি...।'

'ব্রেক আপ-এর পর জিকান কী করল?'

'কী আর করবে! দিন নেই রাত নেই আমাকে ফোন করে-করে বিরক্ত করেত লাগল। কান্নাকাটি করতে লাগল, মেরে ফেলার হুমকি দিতে লাগল, ভয় দেখাতে লাগল যে, রেললাইনে মাথা দেবে—একেবারে পাগল হয়ে গেল। কখনও বলছিল, আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে, আবার কখনও বলছিল

আমাকে গলা টিপে খুন করবে, কখনও বা বলছিল রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে...।

'জিকান আর তার দলবলের রেগুলার থ্রেট-এ আমার বাবা এক রাত্তিরে হার্টফেল করে মারা গেল। আমি মা-কে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে চলে এলাম এই কমলপুরে—আমার ছোটকাকার এই ডেরিলিক্ট বাড়িটায়। কিন্তু আমাদের কপালে শুধু দুর্ভাগ্যই লেখা ছিল। একদিন সন্ধেবেলা মা-কে সাপে কাটল। আর আমাকে...।'

আমি অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু রাই আর কোনও কথা বলল না। তাড়াহুড়ো করে চলে যাওয়ার আগে শুধু বলে গেল, 'কাল সকালে আবার জ্বালাতে আসব কিন্তু...।'

রাত ন'টা নাগাদ রান্নার পাট শেষ করলাম। ভাত, আলুসেদ্ধ, ডিমসেদ্ধ। আর তার সঙ্গে নুন এবং কাঁচালঙ্কা।

তখ্খুনি খেতে ইচ্ছে করছিল না। আরও একটু লেখালেখি করে তারপর খাওয়ার কথা ভাবা যাবে।

এমন সময় মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

ফোনটা বিছানায় ছিল। তড়িঘড়ি উঠে গিয়ে ফোন ধরলাম।

বিক্রমজিৎ ফোন করেছে।

'কী বস, নিরিবিলি কেমন দিন কাটাচ্ছ? লেখা-টেখা এগোচ্ছে?'

'ভালোই কাটছে। লেখাও ঠিকঠাক আসছে। তবে...শোন না...একটা ব্যাপার হয়েছে...।'

'কী ব্যাপার?' বিক্রম জানতে চাইল। ওর গলায় গার্জেনি সুর।

'তুই তো বলিসনি, পাশের বাড়িতে একটা সুপার বিউটিফুল ঝক্কাস মেয়ে থাকে—।'

'তার মানে!' বিক্রম রীতিমতো অবাক হয়ে গেল।

ওকে রাইয়ের কথা বললাম। আরও বললাম, রাইদের বাড়িটা বাইরে থেকে হতশ্রী হলেও ও-বাড়িতে এ.সি. আছে। মেয়েটা এ.সি. রুমে থাকে।

'তুই কি ওখানে গিয়ে গাঁজা-টাজা টানছিস না কি? ও-বাড়িটায় কেউ থাকে না। বহুবছর ধরে প্রপার্টিটা ওরকম কেলিয়ে পড়ে আছে। কলকাতার কোন বড়লোক নাকি মালিক। তারা শালা রিমোট কন্ট্রোলে ট্যাক্স-ফ্যাক্স আর ইলেকট্রিকের বিল-টিল মেটায়। পয়সাওয়ালা বড়লোকের খেয়াল।' দু-চার সেকেন্ড চুপ করে থেকে বিক্রমজিৎ বলল, 'তুই হারামজাদা এর মধ্যে মেয়ে

খুঁজে পেলি কী করে? এ তোর চোখের ভুল, মনের ভুল, নয় তো ব্রেনের ভুল। যাকগে, সাবধানে থাকিস—আর তো দুটো দিন। এখন যা, মাথায় ঘাড়ে জল-টল দে। তবে ভয়ের কিছু নেই। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত বিয়ে-টিয়ে না করলে এই টাইপের হ্যালুসিনেশান প্রবলেম হতে পারে। ঠিক আছে—ছাড়লাম—বাই...।' হেসে ফোন ছেড়ে দিল ও।

আমি বিছানায় ধপ করে বসে পড়লাম। রাই একটা হ্যালুসিনেশান! মনের ভুল! চোখের ভুল! নয় তো ব্রেনের ভুল!

আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। রাইয়ের মুখটা বারবার দেখতে পাচ্ছিলাম। ওর নানান কথা কানে বাজছিল।

ধীরে-ধীরে মনের মধ্যে একটা জেদ তৈরি হল—বিক্রমজিৎকে ভুল প্রমাণ করার জেদ। রাই কখ্খনও হ্যালুসিনেশান হতে পারে না!

হাত বাড়িয়ে বালিশের নীচ থেকে আমার টর্চটা বের করে নিলাম। এল.ই.ডি. টর্চ। আমার বালিশের নীচেই ওর বরাবরের জায়গা। টর্চটা ছোট হলেও তার আলোর তেজ কম নয়।

টর্চ হাতে বাড়ির বাইরে বেরোলাম।

ওই তো, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইদের আরও অন্ধকার বাড়িটা।

আকাশে সরু চাঁদ। অল্প-অল্প মেঘ ছড়িয়ে আছে এপাশে-ওপাশে। গাছের পাতার শব্দ হচ্ছে। এলোমেলো রেখায় ভেসে বেড়াচ্ছে জোনাকির আলো। একটা পাখির ডাক শোনা গেল দুবার। আমি টর্চ জ্বেলে রাইদের বাড়ির দিকে এগোলাম। ছড়িয়ে থাকা গাছের ডালপালা আর ভাঙা বেড়া ডিঙিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

ওদের বাড়িতে কোথাও কোনও আলো চোখে পড়ছে না। বোধহয় বাইরের দিকের সব জানলা বন্ধ। এর আগেও বেশ কয়েকবার সন্ধে কিংবা রাতে আমার ঘরের জানলা দিয়ে রাইদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছি, সব অন্ধকার—কোনও আলো নেই। ওরা কি সবসময় জানলা-টানলাগুলো বন্ধ করেই রাখে?

রাইদের বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছে গেলাম। টর্চের আলো ফেললাম। ধুলোমাখা ফাটল ধরা দরজার পাল্লা। দু-পাল্লায় দুটো বড়-বড় লোহার কড়া। সেখানে প্রকাণ্ড এক রাশভারি তালা। সে-তালায় জং ধরে গেছে। তার ওপর ধুলো।

রাই তা হলে বাড়িতে ঢুকল কেমন করে?

ওর নাম ধরে বারদুয়েক ডাকলাম, 'রাই—রাই—।'

কোনও সাড়া নেই, কোনও শব্দ নেই।

এবারে বাড়ির দেওয়াল বরাবর হেঁটে চললাম। টর্চের আলো ফেলতে লাগলাম যেখানে-সেখানে। শুধু ধুলো, পোকামাকড়, আর মাকড়সার জাল।

বাড়ির সব জানলা সত্যি-সত্যিই বন্ধ। দিনের বেলাতেও জানলার পাল্লাগুলো বন্ধই দেখছি। রাই বলছিল, ও এ.সি. ঘরে থাকে। ওদের গোটা বাড়িটা এয়ারকন্ডিশন্ড্ নয় তো! কিন্তু সেটা হলে তো এ.সি. মেশিন-টেশিনগুলো বাইরে থেকে চোখে পড়ত। তার তো কোনও চিহ্নই দেখছি না!

দুটো জানলার পাল্লা দেখলাম খানিকটা করে ভাঙা। সেই ভাঙা জায়গায় অজস্র ধুলো আর গাছের শুকনো পাতা। ঘরের ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার—কোনও অলোর ছিটেফোঁটা কোথাও নেই।

বাড়ির পেছনদিকে এসে একটা খিড়কি দরজা চোখে পড়ল। সেই দরজাটা মাপে ছোট এবং তার একটা পাল্লা উধাও।

রাইরা কি এই ভাঙা দরজা দিয়েই যাতায়াত করে?

কী একটা জেদের বশে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। এদিক-ওদিক টর্চের আলো ফেললাম। দেওয়ালে, সিলিং-এ সব জায়গায় ঝুল-কালি আর মাকড়সার জাল। সিলিং-এর উইয়ে-খাওয়া কড়িকাঠ থেকে সাত-আটটা ছোট-ছোট বাদুড় উলটো হয়ে ঝুলে আছে। একটা কুলুঙ্গিতে দুটো পায়রা জড়সড় হয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছে। আলো পড়তেই তাকিয়েছে আলোর উৎসের দিকে।

আমি রাইয়ের নাম ধরে আবার ডাকলাম।

'রাই! রাই!'

এবারও কোনও সাড়া নেই। কোনও শব্দ নেই।

লক্ষ করলাম, ঘরে কোনও বাল্‌ব, টিউবলাইট বা ফ্যান লাগানো নেই। তা হলে কী করে মানুষ থাকে এখানে?

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমার এতটুকুও ভয় করছিল না। কারণ, ভূতপ্রেতকে আমি সাড়া জীবন আমল দিইনি। ওদের জায়গা শুধু গল্পের বইয়ের পাতায় আর সিনেমার পরদায়।

আমার ভেতরে একটা একরোখা জেদ কাজ করছিল। রাইকে খুঁজে বের করতেই হবে! কোথায় উধাও হল রাই?

একটার পর একটা ঘর পেরিয়ে চললাম। কোনও ঘরেই কোনও আলো-পাখা লাগানো নেই। দেখে মনে হয় না এখানে কখনও কোনও মানুষ থাকত। চারপাশে শুধু বাদুড় আর পায়রার জীবনযাপনের গন্ধ। আর তার সঙ্গে মিশে আছে ধুলোর গন্ধ।

কিন্তু একটা বড় ঘরে এসেই একটা শব্দ পোলম—মৌমাছির মিহি গুঞ্জনের শব্দ। এপাশ-ওপাশ আলো ফেলতেই মৌমাছিটাকে খুঁজে পেলাম।

পুরোনো আমলের একটা বড়সড় রেফ্রিজেটার। রং বোধহয় এককালে সাদা ছিল, এখন সেই রং চটে গিয়ে ময়লা পড়ে প্রায় কালো হয়ে গেছে।

কিন্তু ফ্রিজটা চলছে! ওটার গা থেকে তাপ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

একটানে ফ্রিজের দরজা খুলে ফেললাম। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বাজে গন্ধ ঝাপটা মারল নাকে।

ফ্রিজের ভেতরটা হিম ঠান্ডা। সেখানে একটাও তাক নেই। তার বদলে হাঁটু মুড়ে বসে আছে রাই। গলায় সরু চেন, কানে ফুটকি দুল। পরনে সবুজ চুড়িদার।

এটাই তা হলে ওর এ.সি. রুম!

ফ্রিজের দেওয়ালে, রাইয়ের সারা গায়ে পাউডারের মতো বরফ জমে আছে। রাইয়ের শরীরটা শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে। গায়ের রং কালচে। কোথাও-কোথাও ছালচামড়া উঠে গেছে। মাথাটা পেছনদিকে হেলিয়ে ফ্রিজের দেওয়ালে ঠেকিয়ে রেখেছে ও। দু-চোখে মরা মাছের দৃষ্টি। গলায় কালচে লাল আঙুলের দাগ।

দু-হাতের কঙ্কালসার আঙুলে একটা বই ধরে রয়েছে রাই। বইটা খোলা। মরা মাছের চোখ দিয়ে সেই বইটা বোধহয় পড়ার চেষ্টা করছে।

আর একইসঙ্গে যেন বলতে চাইছে, আমি একা, তুমি একা।

অপারেশন সিলভার স্টার

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। এমন বৃষ্টি, যে-বৃষ্টিতে মানুষ ভেজে অথচ ভেজে না। সেইজন্যই রোমান দিব্যি হাঁটছিল, ছাতা ছাড়াই। শুধু মাঝে-মাঝে ওর চশমার কাচ দুটো জামা দিয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হচ্ছিল।

ওর পাশে-পাশে হাঁটছিল সিজার—ওর কাকা। সিজারের চোখে চশমা নেই। ওর চোখের নজর এমন ধারালো যে, চোখ দেখলেই বোঝা যায় এ-চোখের চশমার দরকার নেই।

রোমান যখনই চোখ থেকে চশমা খুলে চশমার কাচ মুছছিল তখনই সিজার রোমানের কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। সাবধানী চোখে রোমানকে দেখছিল। যেন ওর মধ্যে কোনওরকম অসুবিধের ছায়া দেখলেই ওকে জাপটে ধরে আগলাবে।

এর কারণ, রোমানের একটা অসুখ আছে। এমন অসুখ, যে-অসুখের কথা কখনও কেউ শোনেনি।

রাস্তায় হিজিবিজি ভিড়। উল্টোডাঙার রেল ব্রিজের লাগোয়া এই অঞ্চলটা এমনিতেই ব্যস্ততার জন্য বিখ্যাত, তার ওপর এই বৃষ্টিকণার ঝালর আর মাথার ওপরে ঘনিয়ে আসা কালো মেঘ সেই ব্যস্ততা যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অটো, গাড়ি, সাইকেল ভ্যান আর বাস-মিনিবাস সব্বাই এ-ওর আগে যেতে চাইছে। রেল স্টেশনের দিকে হনহন করে হেঁটে যাওয়া মানুষজন এখন আর হাঁটছে না—প্রায় ছুটছে। তাদের দু-চারজনের মাথায় ছাতা।

লোকজনের ফাঁকফোকর দিয়ে রোমান সাতারু মাছের মতো বেশ সাবলীলভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল, সিজার ওকে ডেকে থামাল।

'অ্যাই, রোমান—আস্তে। আয়, আমার হাত ধর দেখি! পুট করে কখন হারিয়ে যাবি...!'

রোমানের বয়েসটা সত্যিই হারিয়ে যাওয়ার মতো। মাত্র দশ কি এগারো। তার ওপর ও ভীষণ চঞ্চল। ওর ডান ভুরুতে ইঞ্চিখানেক লম্বা কাটা দাগটা তার জ্বলজ্বলে প্রমাণ।

'কাকু, ব্যাঙ্কটা আর কত দূরে?' বড়-বড় চোখ মেলে সিজারের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল রেমান। বোঝা গেল ও বেশ অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

'ওই তো, ডানদিকে যে-হাইরাইজ বিল্ডিংটা দেখছিস, তার গ্রাউন্ড ফ্লোর আর ফার্স্ট ফ্লোরে—।'

আজ শনিবার। সিজারের অফিস ছুটি। ও 'সেফ অ্যান্ড স্মার্ট' নামের একটা সিকিয়োরিটি কোম্পানিতে চাকরি করে। সেখানে ও অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ সিকিয়োরিটি অফিসার। আজ ব্যাঙ্কে টাকা তোলার জন্য বেরিয়েছে।

সিজার যে ব্যাঙ্কে যাবে সেটা জানার পরই রোমান বায়না ধরেছে, ও কাকুর সঙ্গে বেরোবে। এমনিতে ওর রাস্তায় খুব একটা বেরোনো হয় না। তার ওপর অদ্ভুত অসুখটা ধরা পড়ার পর রাস্তায় বেরোনোটা রোমানের প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। বাড়িতে লেখাপড়ার বাইরে সময় কাটাতে ওর সঙ্গী গল্পের বই, টিভির কার্টুন চ্যানেল, মোবাইল ফোনের এক্সাইটিং গেম্‌স, আর টু বাই টু বাই টু একটা রুবিক কিউব। তাই ছুটির দিনে সিজার আশেপাশে কোথাও বেরোলে রোমান সুযোগটা ছাড়ে না।

ব্যাঙ্কটার নাম 'সিলভার স্টার'। ফরেন ব্যাঙ্ক, সারভিস খুব ভালো। তা ছাড়া বাড়ির বেশ কাছাকাছি। হেঁটেই দিব্যি চলে যাওয়া যায়।

এ-কথা সে-কথা বলতে-বলতে ওরা ব্যাঙ্কের দিকে এগোচ্ছিল, হঠাৎই রোমান থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আঙুল তুলে একদিকে দেখিয়ে বলল, 'কাকু! কাকু, ওই দ্যাখো!'

সিজার তাকাল সেদিকে।

চার-পাঁচ হাত দূরে ফুটপাথের ওপরে পাশাপাশি বেশ কয়েকটা ফলের দোকান। দোকান মানে, স্টল—চারটে বাঁশের খুঁটির ওপরে পলিথিনের ছাউনি। সেই স্টলগুলোর সামনেই ঘটেছে ঘটনাটা।

একজন ফলওয়ালা আম, তরমুজ, আপেল, নাসপাতি ইত্যাদি সাজিয়ে বসেছে। তার দোকানে একজন খদ্দের ফল-টল দরাদরি করছিল। তার পাশ দিয়ে বছর বারো-তেরোর একটা রোগা ছেলে তাড়াহুড়ো করে হেঁটে যাচ্ছিল। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি আর তালিমারা একটা ময়লা ফুলপ্যান্ট। তো হেঁটে যাওয়ার সময় খদ্দেরটি বোধহয় একটু বেশিরকম হাত-পা নেড়ে ফেলেছে। ফলে সেই খদ্দেরের হাতের আচমকা ধাক্কায় ছেলেটির হাতের মুঠোয় থাকা অনেকগুলো খুচরো পয়সা ছিঁটকে পড়ে ছড়িয়ে গেছে ফুটপাথে আর রাস্তায়।

ছেলেটি খদ্দের লোকটির সঙ্গে বচসা জুড়ে দিয়েছে। দু-চারজন লোক সেই ঝগড়া শুনতে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ছেলেটি কিছুক্ষণ তেড়ে ঝগড়া করার পর বেজার মুখে ঝুঁকে পড়ল রাস্তার ওপর। একটা-একটা করে কয়েন কুড়োতে লাগল।

একে বৃষ্টি-ভেজা রাস্তা। তার ওপরে পথচারীদের ব্যস্ত পায়ের চলাচল। ছেলেটির পয়সাগুলো কুড়োতে বেশ অসুবিধেই হচ্ছিল।

'কাকু, আমি গিয়ে একটু ওই দাদাটাকে হেল্‌প করি?' রোমান বেশ কাতর গলায় সিজারের কাছে আর্জি পেশ করল।

সিজার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, রোমান—একদম না। শেষ পর্যন্ত সবার সামনে একটা কেলেঙ্কারি হবে...।'

'কাকু, একবার। প্লিজ, ওয়ান বার...।' রোমানের গলা আরও অনুনয়ে ভরা, আরও কাতর।

সিজার পয়সা-কুড়োনো ছেলেটার দিকে একপলক তাকিয়েছিল, আর সেই সুযোগে রোমান একছুটে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে হাজির।

সঙ্গে-সঙ্গে সিজার দুটো লম্বা স্টেপ ফেলে পৌঁছে গেল রোমানের কাছে।

'রোমান, স্টপ! একদম না!' সিজার চেঁচিয়ে ওকে বারণ করল, কিন্তু তার আগেই যা হওয়ার হয়ে গেছে। রোমান ওর আজব অসুখকে ব্যবহার করে ফেলেছে।

ডানহাতটা ওর জিন্‌সের বারমুডার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল রোমান। তারপর হাতটা শক্ত মুঠো করে মনের ভেতরে একটা জেদ তৈরি করেছিল। সঙ্গে-সঙ্গে ওর অসুখটা দেখা দিল।

রোমান হয়ে গেল চুম্বক। আর ওকে ঘিরে তৈরি হয়ে গেল জোরালো একটা চৌম্বক ক্ষেত্র। ফুটপাথে-রাস্তায় পড়ে থাকা এক টাকা আর দু-টাকার কয়েনগুলো গরম কড়াই থেকে ছিটকে-ওঠা ভুট্টার দানার মতো লাফিয়ে চলে

এল রোমানের গায়ে। তারপর আটকে গেল ওর হাতে-পায়ে-জামায়—যেভাবে দণ্ড চুম্বকের গায়ে ছোট-ছোট পেরেক আটকে থাকে।

ব্যাপারটা যাদের চোখে পড়ল তাদের মুখ হাঁ হয়ে গেল। এ কী আশ্চর্য কাণ্ড!

সিজার আর দেরি করেনি। ফুলগাছ থেকে ফুল তোলার মতো পটাপট কয়েনগুলো ছাড়িয়ে নিল রোমানের গা থেকে।

স্যান্ডো গেঞ্জি পরা রোগা ছেলেটা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। অবাক হয়ে 'পয়সার ম্যাজিক' দেখছিল। সিজার খপ করে ওর ডানহাতটা চেপে ধরে সামনে নিয়ে এল। মুঠো ভরতি পয়সা চালান করে দিল ওর হাতে। তারপর রোমানের হাত ধরে টান মারল ঃ 'চল, চল, শিগগির চল—।'

স্যান্ডো গেঞ্জি আপনমনেই বলল, 'কেসটা কী হল মাইরি?'

রোমানের হাত ধরে সিজার প্রায় ছুটছিল। আর একইসঙ্গে ওকে বকাবকি করছিল।

'কী দরকার ছিল তোর ওই ছেলেটাকে হেল্প করার? এখন এসব কাণ্ড দেখে কেউ না তোর পেছনে পড়ে যায়! তা ছাড়া দেখ তো, রাস্তার কাদার ছাপে তোর জামা-প্যান্টের কী হাল হয়েছে!'

হ্যাঁ, রোমান দেখেছে। রাস্তায় পড়ে যাওয়া পয়সাগুলো জামা-প্যান্টের নানান জায়গায় নোংরা ছাপের সিলমোহর বসিয়ে দিয়েছে। এর জন্য মায়ের কাছ থেকে আর এক দফা বকাবকি হজম করতে হবে।

কিন্তু কী-ইবা করার আছে ওর?

এই অসুখটা তো ও আর সাধ করে ডেকে আনেনি!

মাসতিনেক আগে ওর এই অসুখটা প্রথম ধরা পড়ে।

রোমানদের ড্রয়িংরুমে একটা খাটো ক্যাবিনেট আছে। তার মাথায় একটা কাচের বাটিতে রোমানরা খুচরো পয়সা রাখে। রোমানের মা তনুকা এই নিয়মটা করেছেন। যখন যার খুচরো পয়সার দরকার হয় সে ওই বাটি থেকে নেয়। আবার অফিস থেকে ফিরে মা কিংবা বাবা যদি দেখেন যে, তাঁদের সঙ্গে খুচরো পয়সা কিছু বাড়তি রয়েছে, তখন সেটুকু ওই কাচের বাটিতেই রেখে দেন।

রোমানের মা আই-টি সেক্টরে কাজ করেন। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে অফিস।

একদিন রাত আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরে তনুকা ব্যাগের বাড়তি কিছু খুচরো

বের করে ওই বাটিতে রাখছিলেন। তখন অসাবধানে একটা দু-টাকার কয়েন মাটিতে পড়ে যায়। রোমান একটা ফুটবল নিয়ে ঘরের মধ্যে খেলা করছিল, ছুটোছুটি করছিল। মা-কে হেল্প করার জন্য রোমান ছুটে চলে গিয়েছিল পয়সাটার কাছে। মেঝে থেকে ওটা তুলে নিয়ে মা-কে দিতে গিয়ে দেখল ওটা ওর হাতে আটকে রয়েছে—মায়ের খোলা হাতের পাতায় পড়ছে না।

পয়সাটা যেন ফেভিকল দিয়ে কেউ রোমানের হাতের পাতায় সেঁটে দিয়েছে। হাত ঝাড়া দিলেও খসে পড়ছে না।

একইসঙ্গে রোমানের মাথা ঝিমঝিম করছিল। শরীরের ভেতরে উষ্ণতা কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গিয়েছিল। ওর মনে হচ্ছিল, ওর ওজন যেন অনেক কমে গেছে, এখুনি ও শূন্যে ভেসে উঠবে। তারপর বুঝি উল্টে পড়ে যাবে মেঝেতে।

শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে পয়সাটা হাত থেকে ছাড়িয়ে মায়ের হাতে দিতে পেরেছিল রোমান।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে তনুকা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেকে ছোট্ট ধমক দিয়ে জিগ্যেস করেছিলেন, 'কী রে, হাতে কি আঠা মাখিয়ে রেখেছিস?'

রোমান নিজেও কম অবাক হয়নি। ও ডানহাতটা মুখের সামনে নিয়ে এসে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল। মায়ের কথায় ও তাকাল ফ্যালফ্যাল করে ঃ 'না, মাম, কিচ্ছু মাখিনি। বিলিভ মি!'

ছেলের হতভম্ব মুখের চেহারা দেখে তনুকা বুঝতে পেরেছিলেন, রোমান সত্যি কথাই বলছে। তাই ব্যাপারটা একটা আকস্মিক ঘটনা ধরে নিয়ে মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। রোমানের বাবাকেও এ নিয়ে কিছু বলেননি।

কিন্তু সাত-আট দিনের মধ্যে একইরকম ঘটনা ঘটে গেল বেশ কয়েকবার। কখনও ছোট্ট স্টারহেড স্ক্রু ড্রাইভার, কখনও বেব্লেড কিংবা নেডোর পার্টস, আবার কখনও মায়ের টুইজার রোমানের গায়ে আটকে গেল।

ব্যাপারটাকে আর মন থেকে সরিয়ে রাখা গেল না।

তনুকা এই আকর্ষণের ঘটনাগুলো তিনবার দেখেছেন। আর রোমানের কাকা সিজার দেখেছে একবার। রোমানের বাবা অ্যালান একবারও দেখেননি। কারণ, অ্যালান অঙ্কের অধ্যাপক। একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অঙ্ক পড়ান। আর অধ্যাপনা ছাড়া যখনই সময় পান অঙ্কের বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন, নয়তো কাগজ-কলম নিয়ে অঙ্ক কষায় মেতে থাকেন। অ্যালান ক্রিপ্টোগ্রাফি—মানে, গুপ্তলিপিবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেন। রোমানের ঠাকুরদাও এই একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতেন। তিনিই জুলিয়াস সিজার

আর অ্যালান টুরিং-এর নামে দু-ছেলের নাম রেখেছেন। সিজার তৈরি করেছিলেন 'সিজার কোড'—গুপ্তলিপি তৈরির বলতে গেলে আদি পদ্ধতি। আর অ্যালান টুরিং তো 'আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স' শাস্ত্রটির-ই জন্ম দিয়েছিলেন!

রোমানের সমস্যাটা নিয়ে ওঁরা তিনজনেই মাথা ঘামাতে শুরু করলেন। হিউম্যান ম্যাগনেটিজ্‌ম নিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলেন। আর মাঝে-মাঝে রোমানকে নিয়ে ছোট-ছোট পরীক্ষা করতে লাগলেন। এমন পরীক্ষা যাতে রোমানের মনে কোনও ধাক্কা না লাগে।

সিজার একটা ম্যাগনেটিক কম্পাস আর একটা নিড্‌ল কম্পাস কিনে এনেছিল। প্রথমে রোমানের শরীরের চারপাশে ম্যাগনেটিক কম্পাসটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানান পরীক্ষা করেছিল। পরীক্ষার সময় তনুকা আর অ্যালানও হাজির ছিলেন। কম্পাসের কাঁটার বিক্ষেপ ওঁদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল, রোমানের শরীর ঘিরে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে।

এর পরের পরীক্ষাটা ওঁরা করেছিলেন চুম্বক-শলাকা নিয়ে। এবং তাতেও একইরকম রেজাল্ট পাওয়া গিয়েছিল এবং নিশ্চিতভাবে জানা গিয়েছিল, রোমানের মাথার দিকটা নর্থ পোল, আর পায়ের দিকটা সাউথ পোল।

এসব পরীক্ষার সময় রোমান অসংখ্য প্রশ্ন করছিল।

'কাকু, ম্যাগনেটিক কম্পাস দিয়ে এসব কী টেস্ট করছ?'

উত্তরে সিজার হেসে বলেছে, 'তোর আই.কিউ. টেস্ট করছি—।'

নিড্‌ল কম্পাস দিয়ে টেস্ট করার সময়েও অবাক রোমানের প্রশ্ন, 'এবার আবার কী টেস্ট?'

এ-প্রশ্নের জবাবে তনুকা বলেছেন, 'বাবু, দেখছি তোমার ব্রেইন কতটা শার্প।'

'মাম, তুমি তো এমনিতেই বলো যে আমার ব্রেইন খুব শার্প...।'

'হ্যাঁ, বলি—' হেসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন তনুকা, 'এখন সেটাই মেপে দেখছি...।'

ছোট-বড় কম্পাস দিয়ে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় অ্যালান একটা বড় মাপের খাতায় অসংখ্য নোট নিচ্ছিলেন আর ভাবছিলেন, এইসব টেস্ট রেজাল্ট স্টাডি করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় কি না।

না, ওঁরা কেউ-ই কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। ব্যাপারটা রহস্যময়ই থেকে গেছে। তবে চার-পাঁচদিন ধরে বইপত্র ঘেঁটে, খাতায় অঙ্ক-টঙ্ক

কষে অ্যালান তনুকাকে বললেন, 'দ্যাখো, আমি তো ফিজিক্সের লোক নই। তবুও রেজাল্টগুলো স্টাডি করে একটু-আধটু যেটুকু আইডিয়া করতে পেরেছি সেটা হল, রোমুর বডির ভেতরে কোনওভাবে অনেকগুলো ডাইপোল তৈরি হয়ে গেছে। আর সেগুলোর জন্যেই রোমুর চারপাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে, কম্পাসের কাঁটার ডিফ্লেকশান হচ্ছে...।'

'ওকে কি ডাক্তার দেখানো দরকার?'

'ডাক্তার?' শূন্য চোখে তনুকার দিকে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইলেন অ্যালান। তারপর ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকালেন। ওঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কী বলবেন, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর নীচু গলায় থেমে-থেমে জিগ্যেস করলেন, 'রোমু...রোমুর শরীর ঠিক আছে? ওর...ওর কি কোনওরকম...অসুবিধে হচ্ছে?'

'না, সেরকম কিছু নয়। শুধু মাঝে-মাঝে একটু মাথা ঝিমঝিম করছে—আর...আর ওর ঘুমটা একটু বেড়ে গেছে—।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন অ্যালান ঃ 'না, এখনই মনে হয় ডাক্তার দেখানোর দরকার নেই। তবে একজন ফিজিসিস্টের সঙ্গে বোধহয় কথা বলা দরকার। তোমার, আমার, বা সিজারের পড়াশোনায় তো ফিজিক্সের কোনও মেজর রোল ছিল না। আমার মনে হয়, ফিজিক্সের লোকেরা এই ফোনোমেননটার ফার বেটার এক্সপ্ল্যানেশান দিতে পারবে। তুমি কী বলো!'

'হ্যাঁ—মনে হয়, সেটাই ভালো হবে।' একটু থেমে তনুকা কয়েক সেকেন্ড কী যেন ভাবলেন। তারপর ঃ 'ফিজিসিস্ট ভদ্রলোককে খুব দেখে-শুনে খুঁজে বের করতে হবে। এমন একজন লোক যাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়। যার কাছ থেকে রোমানের ব্যাপারটা পাঁচকান হবে না।'

তনুকার বিবেচনায় অ্যালান বেশ খুশি হলেন। তনুকা সবসময় সবদিক খেয়াল রাখেন।

সেরকম কোনও পদার্থবিজ্ঞানীকে অ্যালান বা তনুকা এখনও খুঁজে পাননি। তবে তার আগেই রোমানের এই অদ্ভুত অসুখের ব্যাপারটা পাঁচকান না হোক চারকান হয়ে গেছে। ওদের পাড়ার অনেকেই জেনে গেছে, রোমানের ভেতরে একটা চুম্বক আছে। আর রোমানও ব্যাপারটা কখনও গোপন রাখার চেষ্টা করেনি। বরং লোকজনকে জানাতে পারলেই ওর যত আনন্দ। যেমন, আজ

এই ফলের দোকানের সামনে রাস্তা থেকে কয়েন কুড়োনোর চৌম্বক পদ্ধতির ও একটা প্রদর্শনীই করে বসল।

ব্যাঙ্কের কাছাকাছি এসে সিজার রোমানকে বলল, 'খুব সাবধান। ব্যাঙ্কের মধ্যে কোনওরকম ম্যাগনেটিক কেরামতি দেখাতে যাস না।'

রোমান এপাশ-ওপাশ প্রায় নব্বই ডিগ্রি করে মাথা নেড়ে দিল ঃ 'না, না, কাকু—দেখো, আমি একদম গুড বয় হয়ে থাকব।'

ঝরে পড়া কুয়াশার মতো বৃষ্টিটা থেমে গিয়েছিল। তবে চারপাশের ব্যস্ত জীবন একইরকম—তাতে কোনও হেরফের হয়নি। সিজার রোমানকে পাশে-পাশে নিয়ে হাঁটছিল। আশেপাশে লোহার কোনও জিনিস দেখলে আগে থেকেই সরে গিয়ে দূরত্ব তৈরি করছিল। যেমন, ফুটপাথের কিনারার রেলিং। কিন্তু রোমান বারবার সিজারকে বলছিল যে, এভাবে সাবধান হওয়ার কোনও দরকার নেই। কারণ, ওর ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ও নিজের ইচ্ছেমতো কন্ট্রোল করতে পারে—ওটার শক্তি বাড়াতে পারে, কমাতে পারে। তা ছাড়া ওর কাছাকাছি লোহাজাতীয় ফেরোম্যাগনেটিক মেটিরিয়াল থাকলে ও অনেক সময় তার ম্যাগনেটিক ইমেজ দেখতে পায়।

কিন্তু সিজার সেসব জানলেও তেমন ভরসা পায় না।

রোমানের ফেনোমেননটা নিয়ে সিজারও একটু ঘাঁটাঘাঁটি করেছে, খোঁজখবর করেছে। যেমন, কোনও-কোনও প্রাণী চৌম্বক-ক্ষেত্রর অস্তিত্ব টের পায়। পায়রা যখন দূরের পথে উড়ান দেয় তখন পৃথিবীর চুম্বকত্ব তাকে দিক নির্ণয়ে সাহায্য করে। এ ছাড়া বায়োম্যাগনেটিক ফেনোমেননও দেখা যায় প্রাণীদের মধ্যে। যেমন, এক ধরনের সামুদ্রিক শামুক, কিটন, নিজের শরীরে ম্যাগনেটাইট তৈরি করে আর তার দাঁত শক্ত করে। এমনকী মানুষও নিজের শরীরের কোষে ম্যাগনেটাইট তৈরি করে।

হিউম্যান ম্যাগনেটদের কথাও সিজার জেনেছে। এ-ধরনের মানুষের মধ্যে চৌম্বক ধর্ম দেখা যায়। তারা ছোটখাটো চৌম্বক পদার্থকে আকর্ষণ করতে পারে। কেউ-কেউ আবার আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে দাবি করেছে যে, তারা অচৌম্বক পদার্থ, যেমন, পোর্সিলেন, কাচ, কাঠ কিংবা প্লাস্টিককেও আকর্ষণ করতে পারে। তবে এইসব আজগুবি দাবির যে কোনওরকম বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই সেটা সিজার জানে। সত্যি-সত্যি হিউম্যান ম্যাগনেট, এমন কোনও মানুষের কথা আজও জানা যায়নি।

তা হলে রোমান-ই কি পৃথিবীতে প্রথম মানুষ-চুম্বক?

কিন্তু নিজেদের শরীরে চুম্বকত্ব আছে বলে কেউ-কেউ তো আগেই দাবি করেছেন! রোমানিয়ার অরেল রেইলিয়েনুকে 'মিস্টার ম্যাগনেট' বলে ডাকা হত। তিনি ছিলেন সবচেয়ে জোরালো হিউম্যান ম্যাগনেট।

জর্জিয়ার ইটিবার এলশিয়েভ নিজের শরীরে অনেকগুলো চামচ আটকে রাখতে পারতেন। সেজন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হোল্ডারও হয়েছিলেন।

এছাড়াও অনেকে এ-ধরনের ক্ষমতা আছে বলে দাবি করেছে। কিন্তু একটি দাবিও বিজ্ঞানীরা মেনে নেননি। তাঁরা সবসময় এ-কথাই বলেছেন যে, এর পিছনে অবশ্যই কোনও কৌশল আছে।

কিন্তু রোমানের ব্যাপারটা তো একদম খাঁটি—এর মধ্যে কোনওরকম কারচুপি নেই। সিজাররা তো ওকে নিয়ে কম পরীক্ষা করেনি!

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে সিজার এসে দাঁড়াল ব্যাঙ্কের দরজায়।

বিশাল কাচের দরজা। দরজায় কারুকাজ করা মানানসই দুটো পেতলের হাতল লাগানো। দুটো পাল্লাতে একটা করে বড় মাপের রুপোলি তারা আঁকা রয়েছে—'সিলভার স্টার' ব্যাঙ্কের লোগো।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন সিকিয়োরিটি গার্ড। গায়ে লাল আর ছাই রঙের ইউনিফর্ম। তার ওপরে বেশ কয়েকটা পিতলের বোতাম—সোনার মতো ঝকঝক করছে। বুকে আঁটা সিকিয়োরিটি কোম্পানির লোগো। কোমরে কাঠের গ্রিপওয়ালা পিস্তল।

সিজার চাপা গলায় রোমানকে বলল, 'পিস্তলটা দেখেছিস?'

রোমান বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি। আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের স্ট্রেংথ একটু কমিয়েও দিয়েছি। তবে ওটার ম্যাগনেটিক ইমেজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—।'

'পিস্তলটার মডেল হল "মাউজার মডেল ৯০ ডি. এ. কমপ্যাক্ট পিস্তল"। ইমপোর্টেড। ওয়ালনাটের গ্রিপ। নাইন এম. এম. ক্যালিবার। চোদ্দো রাউন্ড ফায়ার করা যায়। আমি একসময় ইউজ করতাম। খুব এফেক্টিভ—!'

কথা বলতে-বলতে ওরা ব্যাঙ্কের ভেতরে ঢুকল।

ভেতরটা এত ঠান্ডা যে, মনে হল ওরা যেন কোনও শীতের দেশে এসে পড়েছে।

ব্যাঙ্কে লোকজন তেমন নেই—বেশ ফাঁকাই বলা যায়। আর চারপাশটা ভীষণ চুপচাপ। মেঝেতে অফ হোয়াইট গ্রানাইট পাথরের পালিশ আয়নাকে হার মানায়। তার ওপরে এমন প্রাকৃতিক নকশা যেন তীব্র জলের স্রোত বুড়বুড়ি কেটে বয়ে চলেছে।

একতলায় অন্তত চারহাজার স্কোয়ার ফুট জায়গা নিয়ে ব্যাঙ্কের নানান ধরনের পাবলিক ট্রানস্যাক্শান কাউন্টার। আর দোতলায় ব্যাক অফিস এবং কম্পিউটার সেন্টার। রোমান দোতলায় একবার-ই মাত্র গিয়েছিল—সিজারের সঙ্গে। সিনিয়ার ম্যানেজারের সঙ্গে সিজারের কীসব দরকার ছিল।

ব্যাঙ্কের দু-দিকের দেওয়ালে বেশ কয়েকটা রঙিন পোস্টার। তাতে 'সিলভার স্টার'-এর নানান গুণ আর কৃতিত্বের কথা লেখা। এ ছাড়া রয়েছে তিনটে বড়-বড় নোটিস। তাতে ইংরেজি, বাংলা আর হিন্দিতে লেখা ঃ 'আমাদের ব্যাংকে আপনি এবং আপনার টাকা, দুই-ই সুরক্ষিত। কারণ, আমরা সবসময় ক্লোজ্ড সার্কিট টিভি দিয়ে ২৪X৭ নজর রাখছি।'

ব্যাঙ্কের সিলিং-এ সুন্দরভাবে সাজানো দুধ-সাদা উজ্জ্বল এল. ই. ডি. আলোর মেট্রিক্স। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সিসি-টিভি ক্যামেরা। ফ্লোরের সব জায়গাতেই সমান নরম আলো। দেওয়াল ঘেঁষে চারটে লম্বা সোফা। হালকা বাদামি ট্যাপেস্ট্রির ওপরে সাদা রঙের গোল-গোল চাকা-চাকা দাগ। ঠিক যেন চিতল হরিণের নরম শরীর।

ব্যাঙ্কে ঢোকার পর থেকেই রোমানের কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছিল। ওর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে ফেরোম্যাগনেটিক মেটিরিয়াল থাকলে এরকম হয়।

ও চারপাশে তাকাল।

না, লোহাজাতীয় কোনও কিছু ওর নজরে পড়ল না। কাউন্টারগুলো আর ডিসপ্লে পোস্টারের ফ্রেম সবই অ্যালুমিনিয়াম আর রাবার উডের তৈরি।

একটা সোফার দিকে আঙুল দেখিয়ে সিজার রোমানকে বসতে বলল। তারপর ছ'নম্বর কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল।

রোমান এপাশ-ওপাশ দেখতে-দেখতে সোফায় গিয়ে বসে পড়ল। দেখল, সোফার অন্যপ্রান্তে একজন বয়স্কা মহিলা বসে রয়েছে। পরনে বাদামি পাড় সাদা তাঁতের শাড়ি। মাথায় ঘোমটা টানা। তা সত্ত্বেও চুল যেটুকু দেখা যাচ্ছে সবটাই ধবধবে সাদা। সুতরাং, মহিলাকে অনায়াসে বৃদ্ধা বলা যায়।

বৃদ্ধার গলায় একটা সাদা স্কার্ফ। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। কোলে নীল রঙের বড়সড় একটা কাপড়ের ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে রাখা একটা খবরের কাগজের ঠোঙা থেকে মুঠো করে-করে মুড়ি খাচ্ছে। তার পাশে সোফায় হেলান দিয়ে রাখা অ্যালুমিনিয়ামের একটা ওয়াকিং স্টিক।

রোমানের ভীষণ অবাক লাগল। 'সিলভার স্টার'-এর স্মার্ট ঝকঝকে

পরিবেশে বৃদ্ধাকে যেন ঠিক মানাচ্ছে না।

কিন্তু বৃদ্ধা এসেছে কার সঙ্গে? তার পক্ষে তো একা-একা ব্যাঙ্কে আসা সম্ভব নয়! না কি দায়ে পড়ে একাই এসেছে?

মহিলাকে কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর রোমান বোর হয়ে গেল। ও চোখ সরিয়ে নিল। ব্যাঙ্কের অন্যান্য লোকজনকে দেখতে লাগল।

বিপরীত দিকের দেওয়াল ঘেঁষে সাজানো সোফায় তিনজন বসে রয়েছে। দুজন পুরুষ, আর তৃতীয়জন একটি মেয়ে।

মেয়েটি সুন্দরী, ছাব্বিশ কি সাতাশ, নীল রঙের চুড়িদার পরে রয়েছে। কাঁধে গোলাপি রঙের হ্যান্ডব্যাগ। খুব মনোযোগ দিয়ে একটা কাগজে কী যেন লিখছে।

পুরুষ দুজন মাঝবয়েসি—একটা খবরের কাগজ ভাগাভাগি করে পড়ছে।

এ ছাড়াও চারজন পুরুষ চারটে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন সিজার।

রোমান সোফা থেকে উঠে পড়ল। চুপচাপ বসে থাকতে ওর ভাল্লাগছে না।

ফ্লোরে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল ও। উদ্দেশ্যহীনভাবে দেখতে লাগল এপাশ-ওপাশ। ব্যাঙ্কের মুখোমুখি দুটো দেওয়ালে দুটো বিশাল মাপের এল. সি. ডি. ঘড়ি। দুটোতেই সময় এগারোটা বেজে তিন মিনিট।

হঠাৎই বৃদ্ধা মহিলা আর তরুণীর মধ্যে একটা মিল খুঁজে পেল রোমান। দুজনেই মাঝে-মাঝে দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

ঘুরতে-ঘুরতে রোমান খবরের-কাগজ-হাতে লোক দুজনের কাছাকাছি গেল। দুজনকে দুরকম দেখতে। একজনের মাথাজোড়া টাক, আর একজনের মাথাভরতি চুল। একজনের চোখে চশমা, অন্যজনের নেই। একজনের মোটা পুরু গোঁফ, আর-একজননের দাড়ি-গোঁফ চেঁছে কামানো।

একজন আর-একজনের উলটো। মনে-মনে ভাবল রোমান।

ওদের কাছাকাছি বসা মেয়েটি তখনও গভীর মনোযোগে লিখে চলেছে। কে জানে কী লিখছে!

ঠিক তখনই মেয়েটির হাত থেকে কাগজটা আচমকা খসে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি ঝুঁকে পড়ে কাগজটা তুলে নিল। কিন্তু ততক্ষণে কাগজটার দুটো পিঠ-ই রোমান দেখতে পেয়েছে। কাগজটা পড়ে যাওয়ার পর এক পিঠ, আর মেয়েটি কাগজটা তুলে নেওয়ার সময় আর-এক পিঠ।

দুটো পিঠ দেখার পর রোমান তাজ্জব হয়ে গেছে।

কাগজটার দু-পিঠেই শুধু হিজিবিজি দাগ কাটা।

মেয়েটি তা হলে এতক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে কাগজে শুধু হিজিবিজি দাগ-ই কাটছিল। আশ্চর্য!

কেন ওরকম করছিল মেয়েটি? যদি হিজিবিজিই কেটে থাকে তা হলে ওর মুখে ওরকম মনোযোগের ভাব-ই বা ফুটে উঠেছিল কেন?

এমন সময় ব্যাঙ্কে আরও তিনজন লোক ঢুকল।

তিনজনকে তিনরকম দেখতে। তিনজনের উচ্চতা তিনরকম। তাদের পোশাকও তিনরকম। তবুও তিনজনের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে বলে মনে হল রোমানের। তার কারণ হয়তো তিনজনের কাঁধেই ঝুলছে একটা করে কালো রঙের ঝোলাব্যাগ। ব্যাগগুলো দেখেই বোঝা যায়, ওগুলো জিনিসপত্রে ঠাসা।

তিনজনের মধ্যে একজন দোতলায় চলে গেল। বাকি দুজন দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইল। দেখে মনে হচ্ছিল, অলসভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া ওদের আর কোনও কাজ নেই।

কিন্তু বিনা দরকারে কেউ কি কখনও ব্যাঙ্কে আসে?

দোতলার লোকটা নেমে এল একটু পরেই—তার সঙ্গে রয়েছে ব্যাঙ্কের সিনিয়ার ম্যানেজার।

ম্যানেজার সাহেব এগিয়ে গেলেন কাচের দরজার কাছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সিকিয়োরিটি গার্ডের নজর টানতে কাচের ওপরে দুবার টোকা মারলেন। গার্ড ছেলেটি কাচের ভেতর দিয়ে তাকাতেই ম্যানেজার তাকে ইশারায় ব্যাঙ্কের ভেতরে আসতে বললেন।

ছেলেটি ভেতরে ঢোকামাত্রই ম্যানেজার সাহেব তাকে বললেন, 'ফ্লোরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো...।'

সিকিয়োরিটি গার্ড অবাক হয়ে বড় সাহেবের দিকে তাকাল। জিগ্যেস করল, 'স্যার, কী বলছেন! মেঝেতে শুয়ে পড়ব?'

সিনিয়ার ম্যানেজারের সঙ্গে থাকা লোকটা এবার গার্ডের কাছে এগিয়ে এল। ঝোলাব্যাগ থেকে বড়সড় একটা হ্যান্ডগান বের করে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গার্ড ছেলেটিকে বলল, 'তোর "স্যার" ঠিকই বলেছে। এক্ষুনি মেঝেতে মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়্। জলদি—।'

কথা বলতে-বলতে লোকটা সিকিয়োরিটি গার্ডের হোলস্টার থেকে

মাউজার পিস্তলটা ছিনিয়ে নিল। তার সঙ্গে সেটা দিয়ে গার্ডটার পিঠে একটা গুঁতোও মারল। তারপর পিস্তলটা ঝোলাব্যাগে ঢুকিয়ে দিল।

গার্ড ছেলেটি তড়িঘড়ি মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে।

রোমান দূর থেকে সবকিছু লক্ষ করছিল। কিন্তু ও তখনও বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা ঠিক কী হচ্ছে। শুধু দেখল, ম্যানেজার সাহেব ভয়ে কাঁপছেন।

গার্ড শুয়ে পড়তেই আততায়ী লোকটা তার দু-সঙ্গীর দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল। সঙ্গে-সঙ্গে দুজনের একজন ঝোলাব্যাগ থেকে একটা সাদা প্লাস্টিকের বোর্ড বের করে নিল। বোর্ডের ওপরে লাল রঙের হরফে ইংরেজিতে লেখা ঃ সার্ভার ডাউন। ব্যাঙ্ক ক্লোজ্‌ড।

বোর্ডটা যাতে সহজে ঝোলানো যায় সেজন্য বোর্ডের মাথায় পেতলের সরু চেন লাগানো। দরজার বাইরের হাতলে বোর্ডটা চট করে ঝুলিয়ে দিল লোকটা।

রোমানের বেশ ভালোরকম মাথা ঝিমঝিম করছিল। আশেপাশে যে ফেরোম্যাগনেটিক মেটিরিয়াল রয়েছে সেটা এখন ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। একইসঙ্গে আঁচ করতে পারছিল, ঝোলাব্যাগ কাঁধে এই তিনটে খারাপ লোক কেন ব্যাঙ্কে ঢুকেছে এবং ওরা কী করতে চায়।

রোমান খুব ধীরে সিজারকাকুর দিকে সরে যেতে লাগল। আড়চোখে ছ'নম্বর কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে দেখল, কাকু কাজে ব্যস্ত ছিল, কাউন্টারের লোকটির সঙ্গে কীসব কথাবার্তা বলছিল—এখন কথা থামিয়ে ফিরে তাকিয়েছে মেঝেতে শুয়ে পড়া সিকিয়োরিটি গার্ডের দিকে।

সিজারের ভুরু কুঁচকে গেছে। ব্যাপারটা কী হচ্ছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছে।

রোমান ছাড়া আরও একজন কাস্টমার ব্যাপারগুলো লক্ষ করেছিল। সে 'কী ব্যাপার? ব্যাঙ্কের মধ্যে বন্দুক কেন?' বলতে-বলতে নিজের মোবাইল ফোন বের করে বোতাম টিপতে শুরু করেছিল।

ঠিক তখনই হ্যান্ডগান হাতে লোকটা সিলিং-এর দিকে বন্দুক উঁচিয়ে একবার ফায়ার করল।

চাপা আওয়াজ হল 'ফটাস্'। সিলিং-এর এল. ই. ডি. ল্যাম্পের একটা ফিক্সচার চুরচুর হয়ে খসে পড়ল। মার্বেলের মেঝেতে রিনরিন আওয়াজ উঠল।

'সাইলেন্সার লাগানো আছে—' বন্দুক হাতে লোকটা চেঁচিয়ে বলল, 'তাতে আওয়াজ চাপা হলেও মাপা কাজ হবে।' কথাটুকু শেষ করে সিনিয়ার

ম্যানেজারের ডান রগে হ্যান্ডগানের নল চেপে ধরল ঃ 'যে যার জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্। কোনওরকম হীরোগিরি দেখাতে চেষ্টা করলেই এই ম্যানেজার সাহেব লাশ হয়ে যাবে—।'

দুই সঙ্গীর দিকে ইশারা করল লোকটা। বলল, 'অ্যাকশন!'

ব্যাঙ্কের সব মানুষ তখন পাথর। ঘুরে তাকিয়েছে বন্দুকবাজ শয়তানটার দিকে। এরকম দিনেদুপুরে ব্যাঙ্ক-ডাকাতি! ব্যাপারটা সত্যি-সত্যি হলেও কেমন যেন অবাস্তব মনে হচ্ছিল।

রোমান দেখল, 'কাগজে হিজিবিজি কাটা' মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। ওকে এখন বেশ স্মার্ট আর চটপটে লাগছে। ও গোলাপি হ্যান্ডব্যাগের ভেতর থেকে দুটো সাদা রঙের নাইলনের ব্যাগ বের করে ফেলল। তারপর ছুট লাগাল ব্যাঙ্কের ক্যাশ কাউন্টারের দিকে। বন্দুক হাতে লোকটার দুজন শাগরেদ মেয়েটির পিছন-পিছন ছুটতে শুরু করল।

'কুইক! কুইক!' বন্দুকবাজ চেঁচিয়ে উঠল। ম্যানেজারের রগে হ্যান্ডগানের নিষ্ঠুর খোঁচা দিয়ে বলল, 'সব্বাইকে বল্ চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে থাকতে। একটুও যেন নড়াচড়া না করে। নড়লে একেবারে ঘিলু নড়িয়ে দেব...।'

সিনিয়ার ম্যানেজার কাঁপা গলায় বললেন, 'যা বলছে সব কথা শোনো। যা চাইছে দিয়ে দাও।'

সাদা নাইলনের ব্যাগ দুটো কখন যেন দু-শাগরেদের হাতে চলে গেছে। ওরা অ্যাথলিটের দক্ষতায় ক্যাশ কাউন্টারের ব্যারিকেড টপকে পৌঁছে গেল ক্যাশ টাকার বান্ডিলের কাছে। নাইলনের ব্যাগে স্যাটাস্যাট বান্ডিলগুলো ভরতে লাগল। ওদের সঙ্গী মেয়েটি কাউন্টারের এপাশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ গলায় ওদের নির্দেশ দিতে লাগল।

বন্দুকবাজ লোকটি চেঁচিয়ে বলল, 'ক্যাশ টাকা যা যেখানে আছে সব বের করে জলদি-জলদি ব্যাগে ট্রান্সফার করে দে। কোনও সিক্রেট বোতামের দিকে হাত-টাত বাড়াবি না। আমরা ধরা পড়ার আগে কিন্তু তোদের তিন-চারটেকে নিকেশ করে দিয়ে যাব। প্রথমে খতম করব এই ম্যানেজারের বাচ্চাকে।' বলে আরও একবার সিনিয়ার ম্যানেজারকে হ্যান্ডগানের নলের খোঁচা মারল।

রোমান সিজারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। ভয় পেয়ে কাকুকে জড়িয়ে ধরেছিল।

'কাকু, এই লোকগুলো কারা?'

'ওরা ব্যাঙ্ক-ডাকাত। ব্যাঙ্কের টাকা লুঠ করতে এসেছে—।' খুব চাপা গলায় বলল সিজার। রোমানের মাথায় হাত বুলিয়ে ভরসা দিতে লাগল।

ডাকাতগুলোকে কিছু করতে পারছে না বলে অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ সিকিয়োরিটি অফিসার সিজারের ভেতরটা ছটফট করছিল। ও পকেটে হাত ঢুকিয়ে মোবাইল ফোনটা নাড়াচাড়া করছিল। ইস্, যদি লুকিয়ে কাউকে একটা ফোন করা যেত। এই বিপদের কথা বলা যেত!

ঠিক এইসময় কার যেন মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ব্যাঙ্কের ভেতরে হিন্দি ক্লাসিক্যাল গানের রিংটোন ভেসে বেড়াতে লাগল।

কার ফোন বাজছে? কার ফোন?

ডাকাতদলের লোকগুলো চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাল। সিজারের চঞ্চল চোখও রিংটোনের উৎস খুঁজে চলল।

কোনদিক থেকে আসছে শব্দটা?

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই উৎসটা খুঁজে পেল সবাই।

ব্যাঙ্কের একজন কাস্টমার—বছর পঞ্চান্নর একজন প্রৌঢ়—কেমন যেন কাঁচুমাচু এবং ভ্যাবাচ্যাকা মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নীচু ক্লাসের কোনও বাচ্চা ক্লাসের মধ্যে নাম্বার টু করে ফেললে তার মুখের যেমন চেহারা হয়, অনেকটা সেইরকম।

সিজারের কাছ থেকে হাত পাঁচেক দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই প্রৌঢ়। রোগা চেহারা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চোখে চশমা। মুখে সামান্য খোঁচ-খোঁচা দাড়ি।

ডাকাতদের নির্দেশে ভদ্রলোক একেবারে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাই ফোনটা পকেট থেকে বের করে কলটা কেটে দিতে পারছেন না। গানটা বেজেই চলেছে।

এরপর যা হল সেটাকে জঘন্য ব্যাপার বললেও কম বলা হয়।

একটা ডাকাতের টাকার ব্যাগ ভরতি হয়ে গিয়েছিল। সে তিন লাফে হাজির হয়ে গেল প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সামনে। ততক্ষণে ওদের দলের মেয়েটিও চলে এসেছে সেখানে। এবং ওর হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা ছোট পিস্তল বের করে ফেলেছে। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, মডেল ৬৪৯। ০.৩৮ স্পেশাল, ডাব্‌ল অ্যাকশন, পাঁচ রাউন্ড ফায়ার পাওয়ার।

ডাকাতটা একটা বাজে গালাগাল দিয়ে সপাটে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল

প্রৌঢ়ের গালে। পটকা ফাটার শব্দ হল যেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছিটকে পড়লেন মেঝেতে। ওঁর চশমা ছিটকে পড়ল আর-এক দিকে। ওঁর গাল ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সবরকম আশঙ্কা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সিজার ছুটে গেল ভদ্রলোকে কাছে। ওঁর পকেটের মোবাইল ফোনের আওয়াজ ততক্ষণে থেমে গেছে। সিজার ওঁকে ধরে তুলল—সোজা করে দাঁড় করাল। পকেট থেকে রুমাল বের করে গালের কাটা জায়গায় চেপে ধরল। তারপর ডাকাতটা আর পিস্তলওয়ালি মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসব কী হচ্ছে? শুধু-শুধু ওঁকে মারলেন কেন? উনি কি জানতেন ওঁর ফোন আসবে? টাকা চুরি করতে এসেছেন চুরি করে চলে যান। এক নম্বরের ছোট-লোক কোথাকার!'

সিজার এবার ভদ্রলোকের হাত ধরে একটা সোফার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলল। রোমান ওর পাশে-পাশে।

সিজার ভদ্রলোককে বলল, 'চলুন, ওই সোফায় গিয়ে বসবেন চলুন। রুমালটা গালে চেপে ধরে রাখুন। একটু রেস্ট নিন...।'

সিজার দেখতে পায়নি, কারণ আক্রমণটা আসছিল পিছনদিক থেকে। তবে রোমান সেটা দেখতে পেয়েছিল। মেয়েটা ওর পিস্তলসমেত হাত ওপরে তুলেছে। চোখ-মুখ হিংস্র। এখুনি ও পিস্তলটা বসিয়ে দেবে সিজারের মাথায়। সিজারকে প্রতিবাদ করার জন্য শাস্তি দেবে।

মেয়েটির হাত সিজারের মাথা লক্ষ্য করে নেমে আসছিল।

'কাকু!' বলে চিৎকার করে উঠল রোমান। এবং একইসঙ্গে ওর দুটো হাত শক্ত করে মুঠো করল।

রোমানের শরীরের ম্যাগনেটিক ফিল্ড সাংঘাতিকরকম জোরালো হয়ে গেল। ফলে মেয়েটির পিস্তল ধরা হাত এক হ্যাঁচকায় ঘুরে গেল ডানদিকে—যেন কোনও অদৃশ্য শত্রু ওর হাত ধরে আচমকা টান মেরেছে।

হতভম্ব বেসামাল মেয়েটি সেই অবস্থাতেই ওর পিস্তলের ট্রিগার টিপল।

কালিপটকা ফাটার মতো শব্দ হল। ব্যাঙ্কের কোণের দিকে একটা কাচের প্যানেল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সেই মুহূর্তেই মেয়েটির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সিজার।

এমনিতে মেয়েদের গায়ে হাত তোলার কথা ও ভাবতেই পারে না, কিন্তু পিস্তল হাতে এই মেয়েটি তো শয়তান পুরুষের চেয়েও কিছুটা বেশি।

সুতরাং নিমেষের মধ্যে উবু হয়ে বসে পড়ল সিজার। তারপর পেশাদার

ফাইটারের মতো একটা পা লম্বা করে সেটা বৃত্তাকার পথে ঘুরিয়ে মেয়েটির গোড়ালির ঠিক ওপরে প্রবল এক লাথি মারল। মেয়েটি ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। ওর শরীরটা শূন্যে লাট খেয়ে মার্বেলের মেঝেতে ধপাস করে পড়ল। পিস্তল ছিটকে গেল হাত থেকে। কিন্তু সেটা অন্য কোনও দিকে যেতে পারল না। রোমানের টানে চলে এল ওর পায়ের কাছে। ঠোকর মারল ওর চটিতে।

রোমান ম্যাগনেটিক ফিল্ডের তেজ কমিয়ে দিয়েছিল। ফলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তলটা ছোঁ মেরে তুলে নিতে সিজারের কোনও অসুবিধে হল না।

ম্যানেজারের দিকে বন্দুক তাক করে থাকা ডাকাতটা কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। শাগরেদকে কাবু হতে দেখে সে তখন পাগলের মতো চিৎকার করছে, হুমকি দিচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে।

সিজার রোমানকে হাত ধরে এক টান মারল। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে তিন-চার স্টেপে ওকে নিয়ে পৌঁছে গেল একটা পিলারের আড়ালে।

রোমানকে জাপটে ধরে বড়-বড় শ্বাস ফেলছিল সিজার। রোমানকে চাপা গলায় বলল, 'কোনও ভয় নেই। বি স্টেডি—।'

বন্দুকবাজ ডাকাতটা সিজারকে লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুড়ল। পিলারের সিমেন্ট খসিয়ে কে জানে কোন দিকে ছিটকে গেল গুলিটা।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক তখনও সোফা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেননি। গালে রুমাল চেপে ধরে হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং ভয়ে কাঁপছেন।

গুলির আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাঙ্কের দু-তিনজন কাস্টমার ভয়ের চিৎকার করে উঠেছে, তবে কেউ-ই জায়গা থেকে নড়েনি।

যে-দুজন ডাকাত নাইলনের ব্যাগে টাকা ভরতি করছিল তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তারা বন্দুকবাজের নির্দেশের জন্য চুপচাপ অপেক্ষা করছিল। এবং মনে হয়, ওদের সঙ্গে কোনও পিস্তল বা রিভলভার ছিল না।

সিজার ভাবছিল এবার কী করা যায়। ও কি পুলিশে ফোন করবে? নাকি হাতের এই পিস্তলটা নিয়ে ওই বন্দুকবাজ শয়তানটার মোকাবিলা করবে?

কিন্তু রোমান যে সঙ্গে রয়েছে! ওর যদি উল্টোপাল্টা কিছু হয়ে যায়!

দাঁতে দাঁত চেপে বাঁ-হাতের পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে নিল সিজার। না, পুলিশেই ফোন করবে ও।

তাকিয়ে দেখল, আছাড় খাওয়া ডাকাত মেয়েটা ধীরে-ধীরে উঠে বসেছে।

সিজার মোবাইল ফোনের মোতাম টিপতে শুরু করল।

ব্যাঙ্কের ভেতরে থমথমে আবহাওয়া। সবাই যেন চুপ করে কোনও কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে।

দূরে সোফায় বসে থাকা বুড়ি ভদ্রমহিলা তখনও ঠোঙা থেকে একমনে মুড়ি খেয়ে চলেছে। মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

রোমানের মনে হল, ওই দিদাটা বোধহয় কানে শুনতে পায় না। নইলে তিন-তিনটে ফায়ারিং-এর পর এরকম নির্বিকারভাবে কেউ মুড়ি খায়!

ম্যানেজারকে কব্জা করে দাঁড়িয়ে থাকা বন্দুকবাজ ডাকাতটা চেঁচিয়ে বলল, 'আমার তিনজন লোককে চুপচাপ এদিকে আসতে দে! না হলে এই ম্যানেজারের বাচ্চাকে চন্দ্রবিন্দু করে দেব!' ইশারায় নাইলনের ব্যাগওয়ালা লোকদুটোকে আর মেয়েটাকে দরজার কাছে ডাকল সে। হাতের বন্দুকটা শূন্যে নাড়তে লাগল বারবার।

ওরা তিনজন ওদের পাণ্ডার দিকে এগোতে লাগল। মেয়েটা অল্প-অল্প খোঁড়াচ্ছে।

'কাকু, আমি ছুট্টে ওই কোণের দিকে যাচ্ছি। ওই বদমাশটার হাতের বন্দুকটা ম্যাগনেট দিয়ে টেনে নেব।' রোমান হঠাৎ মুখ তুলে বলে উঠল।

'না, রোমান, না!' চেঁচিয়ে উঠল সিজার। পাগলের মতো কী বলছে বাচ্চা ছেলেটা! অবশ্য ওই কোণের দিকে অ্যালুমিনিয়ামের একটা বড় ডিসপ্লে বোর্ড রয়েছে। রোমান ছুটে গিয়ে ওটার আড়ালে লুকোতে পারে। কিন্তু...।

'না, রোমান—তুমি চুপচাপ আমার কাছে দাঁড়িয়ে থাকো...।'

'প্লিজ, কাকু—জাস্ট ওয়ান বার...।'

ব্যস, কথাটা শেষ করেই রোমান দে ছুট। ওর দু-হাত তখন শক্ত করে মুঠো করা।

বাচ্চাটাকে ওভাবে ছুটতে দেখে ব্যাঙ্কের কাস্টমাররা আর চুপ করে থাকতে পারল না—একেবারে হইহই করে উঠল।

হ্যান্ডগান হাতে ডাকাত-নেতার অবস্থা তখন দেখার মতো।

ওর হাত থেকে হ্যান্ডগানটা ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইছে রোমানের দিকে। রোমান তখন অ্যালুমিনিয়াম ডিসপ্লে বোর্ডের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। এবং তার আড়াল থেকে উঁকি মেরে দলের পাণ্ডাকে দেখছে।

পাণ্ডার হাতের বন্দুকটা তখন যেন প্রাণ পেয়ে একটা অবাধ্য প্রাণী হয়ে গেছে। পাঁকাল মাছের মতো শরীরের মোচড় দিয়ে ওটা পাণ্ডার হাতের মুঠো থেকে মুক্তি পেতে চাইছে। আর লোকটা প্রাণপণে দু-হাতে ওটাকে আঁকড়ে

ধরে আছে। রোমানের চৌম্বক ক্ষেত্রের টানের সঙ্গে হ্যান্ডগানটার অদৃশ্য এক দড়ি টানাটানি চলছে।

সেখানেই শেষ নয়। পাণ্ডার কাঁধের কালো ঝোলাব্যাগটার অবস্থাও তখন দেখার মতন। কাপড়ের ঝোলাব্যাগের হাতল খুলে এসেছে পাণ্ডার কাঁধ থেকে। শুধু খুলেই আসেনি, সেটা পৌঁছে গেছে লোকটার দু-হাতের কবজির কাছে। যদি ওর দুটো হাত হ্যান্ডগানটা ধরে না থাকত তা হলে ব্যাগের হাতলটা হাত থেকে বেরিয়ে ছুটে যেত সামনে—রোমানের দিকে। কারণ, ঝোলাব্যাগের ঝোলাটা রোমানকে লক্ষ্য করে টানটান হয়ে শূন্যে ভেসে আছে। এমনভাবে ভেসে আছে যেন ওটা কাপড়ের ঝোলাব্যাগ নয়, রাস্তার ক্রসিং-এ ডিউটি করা ট্র্যাফিক পুলিশের হাত। কারণ, কোন এক অদৃশ্য শক্তিতে ঝোলাব্যাগের হাতলটা শূন্যে প্রায় সরলরেখা হয়ে স্থির হয়ে আছে।

তা হলে কি ঝোলাব্যাগের মধ্যে লোহাজাতীয় কোনও ফেরোম্যাগনেটিক মেটিরিয়াল রয়েছে?

সিজার পিলারের আড়াল থেকে আজব দৃশ্যটা দেখছিল। ওর হঠাৎই মনে পড়ল, সিকিয়োরিটি গার্ডের মাউজার পিস্তলটা ডাকাত-নেতা ওই কালো রঙের ঝোলাব্যাগটাতেই রেখেছিল।

এখন চুম্বকের টান সামলাতে গিয়ে সেই নেতা নড়বড়ে মাতালের মতো টলছে। এবং টলতে-টলতে শেষ পর্যন্ত সে মেঝেতেই ছিটকে পড়ল। তার হাতের পিস্তল আর ঝোলাব্যাগ মার্বেলের ওপর দিয়ে বিসর্প গতিতে রওনা দিয়েছে রোমানের দিকে।

সিজার আর দেরি করল না। লম্বা-লম্বা পা ফেলে ছুটে চলে এল মেঝেতে পড়ে থাকা পাণ্ডার দিকে। চুলের মুঠি ধরে এক ঝটকায় ওকে দাঁড় করিয়ে দিল। শক্ত গলায় বলল, 'উল্টোডাঙ্গা পুলিশ স্টেশানে ফোন করে দিয়েছি। ওরা ফোর্স নিয়ে এখুনি আসছে...।'

ডাকাত-সর্দার সিজারকে এক ধাক্কা দিয়ে ছুটে পালাতে চাইল। সিজারের হাতের পিস্তলটার কথা সে যেন ভুলেই গেল। আসলে লোকটার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, এইসব ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা দেখে ওর মাথা-টাথা সব গুলিয়ে-টুলিয়ে হযবরল হয়ে গেছে।

সিজার কোনওরকম দ্বিধা না করে লোকটার মাথায় পিস্তলের বাঁট বসিয়ে দিল।

ফটাস শব্দ। লোকটার চোখ উলটে গেল। এবং শয়তানটা গোড়া কাটা

কলাগাছের মতো মেঝেতে খসে পড়ল।

সিজার রোমানকে চেঁচিয়ে কাছে ডাকল। রোমান ওর ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ অনেক কমিয়ে দিয়েছে। ও ডিসপ্লে বোর্ডের আড়াল থেকে বেরিয়ে একছুটে ওর কাকুর কাছে চলে এল।

ব্যাঙ্কের কাস্টমাররা ডাকাতদলের বাকি তিনজনকে ঘিরে ধরল। এবং যে যার মতো করে শাসাতে লাগল।

সিজার ওদের দিকে রিভলভার তাক করে বলল, 'টাকার ব্যাগ দুটো শিগগির সিনিয়ার ম্যানেজারের কাছে জমা দাও—।'

ম্যানেজার সাহেব সিজারকে বললেন, 'ইয়াং ম্যান, আমি আপনার নাম জানি না, বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কী করে যে কী হল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমার সবকিছু গুলিয়ে গেছে—।'

সিজার সামান্য হাসল। মনে-মনে ভাবল 'থ্যাংক ইউ'-টা ওর নয়, আসলে রোমানের পাওয়া উচিত ছিল।

ম্যানেজারসাহেব পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে বোতাম টিপতে শুরু করলেন। আপনমনেই বললেন, 'অফিশিয়ালি এই ডাকাতির ব্যাপারটা আমার পুলিশে রিপোর্ট করা দরকার। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, আমার হায়ার অথরিটিকেও জানাতে হবে...।'

পরিস্থিতি নিরাপদ দেখে ব্যাঙ্কের সিকিয়োরিটি গার্ড মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ শুয়ে থাকলেও অবাক করা কাণ্ডকারখানার সব-ই সে দেখেছে। সে সিজারকে জিগ্যেস করল, ওর ছিনিয়ে নেওয়া মাউজারটা ও ডাকাত-সর্দারের ঝোলাব্যাগ থেকে নিতে পারে কি না।

সিজার বলল, 'অফ কোর্স। আপনি ওটা নিয়ে ব্যাঙ্কের দরজার কাছটা গার্ড দিন—' ম্যানেজারসাহেবের দিকে তাকাল সিজার ঃ 'আই হোপ, স্যার, আপনার কোনও আপত্তি হবে না...।'

'কী যে বলেন! সিকিয়োরিটির ব্যাপারটা আপনি যে আমার চেয়ে অনেক ভালো বোঝেন সেটা এর মধ্যেই টের পেয়েছি।' তারপর গার্ডকে লক্ষ্য করে সিনিয়ার ম্যানেজার বললেন, 'সুদীপ্ত, উনি যেমন বললেন, তুমি দরজার কাছে যাও—পজিশান নাও। পুলিশ না আসা পর্যন্ত ব্যাঙ্কে কেউ ঢুকবে না, বেরোবেও না...।'

সুদীপ্ত ছুটে গিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা ঝোলাব্যাগ থেকে মাউজার পিস্তলটা নিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পজিশান নিল। ও অসহায় চারজন

ডাকাতকে পালা করে দেখতে লাগল।

এখন শুধু অপেক্ষা—পুলিশ আসার অপেক্ষা।

এমন সময় রোমানের হঠাৎ নজরে পড়ল, সোফায় বসে মুড়ি খাওয়া বৃদ্ধা মহিলা উঠে দাঁড়িয়েছে। শরীরটা কুঁজো হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। পায়ে-পায়ে সুদীপ্তর কাছে গিয়ে কী যেন বলছে আর ব্যাঙ্কের কাচের দরজার দিকে হাত দেখাচ্ছে। ইশারাগুলো দেখে রোমান বুঝতে পারল, বৃদ্ধা ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে।

সবকিছু দেখতে-দেখতে রোমানের কোথায় যেন একটা খটকা লাগছিল। কী যেন একটা মিলছে না, কী যেন একটা মিলছে না!

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছে রোমান। ভদ্রমহিলা আর অ্যালুমিনিয়ামের ওয়াকিং স্টিকটা হাতে নেয়নি। ওটা সোফাতেই হেলান দিয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু ওটা ছাড়াই বৃদ্ধা তো দিব্যি হাঁটছে।

এই ব্যাপারটাতেই রোমানের খটকা লেগেছিল। ও চাপা গলায় সিজারকে বৃদ্ধার ব্যাপারটা জানাল।

সিজার বলল, 'চল তো, দেখি—।'

ওরা দুজনে সুদীপ্তর কাছে গিয়ে হাজির হল। বৃদ্ধা তখনও ফিসফিসে গলায় সুদীপ্তর সঙ্গে কথা চালাচালি করছে।

সিজারকে সামনে পেয়েই সুদীপ্ত অনুযোগের সুরে বলল, 'দেখুন না, স্যার, ইনি বাড়ি যেতে চাইছেন। বলছেন, ওষুধ খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। ওনার গলায় কী অসুখ আছে...।'

সিজার কাছে এগিয়ে আসামাত্র বৃদ্ধা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বেশ উশখুশ করছিল। আর রোমানের চোখের সামনে একটা অদ্ভুত ম্যাগনেটিক ইমেজ ফুটে উঠেছিল।

ও তিনটে পিস্তলের ইমেজ দেখতে পাচ্ছিল।

তার মধ্যে দুটোর হিসেব পাওয়া যাচ্ছিল ঃ একটা সুদীপ্তর কোমরে, আর-একটা সিজারের হাতে।

তা হলে তিন নম্বরটা?

এ-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

বৃদ্ধা আচমকা সুদীপ্ত আর সিজারকে প্রবল ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দিল। ওরা দুজনে এ ধরনের আক্রমণের জন্য একেবারেই তৈরি ছিল না। তাই বেসামাল অবস্থায় মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

এক ঝটকায় ঝোলাব্যাগের ভেতর থেকে সিগ-সাউয়ার-এর ডাবল অ্যাকশন বারো রাউন্ড ফায়ার পাওয়ারের একটা রিভলভার বের করে ফেলল বৃদ্ধা। সেইসঙ্গে একগাদা মুড়ি ফোয়ারার জলের মতো ছিটকে গেল শূন্যে।

ডাবল অ্যাকশন রিভলভারটা সিনিয়ার ম্যানেজারের দিকে তাক করে বৃদ্ধা চেঁচিয়ে বলল, 'সাবধান! আমাকে আটকানোর চেষ্টা করলেই গুলি চালাব!'

এ তো স্পষ্ট পুরুষের গলা।

বৃদ্ধা বাঁ-হাতে টান মেরে মাথার পরচুলাটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিল। তার সঙ্গে চোখের চশমাটাও। সরে গেল তার শাড়ির ঘোমটা। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। বেরিয়ে পড়ল একজন পুরোদস্তুর পুরুষ।

রোমান কখন যেন হাত মুঠো করে ফেলেছিল। এবং জোরালো ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে অ্যাকটিভ করে দিয়েছিল। ফলে তার টানে প্রায় এক কেজি ভরের রিভলভারটা মেঝেতে পড়ে ঠিকরে গেল।

সিজার আর সুদীপ্ত এর মধ্যে উঠে পড়েছিল। ওরা দুপাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপরে। এবং খুব সহজেই তাকে কবজা করে ফেলল। লোকটার সবরকম ধস্তাধস্তি থেমে গেল।

এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারটে পুলিশের গাড়ি ব্যাঙ্কের দরজায় এসে দাঁড়াল—তিনটে টাটা সুমো, আর একটা ভ্যান।

উপন্যাস

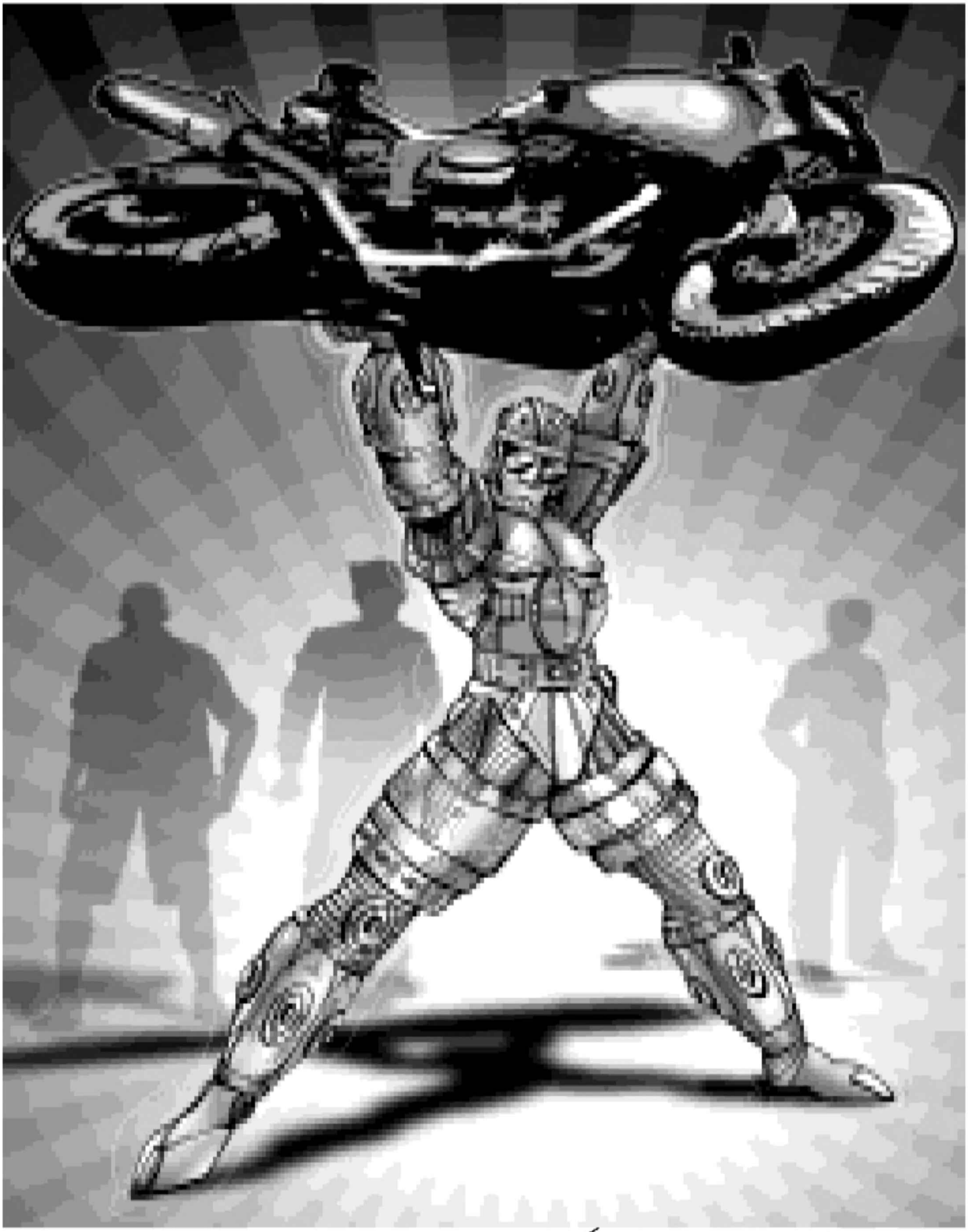

সংঘর্ষ

১. প্রথম সংঘর্ষ

বর্ষাকাল চিরব্রতর চিরকালের পছন্দ। তবে ও চায়, যখন আকাশ ভেঙে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে তখন যেন ও বাড়িতে থাকে।

বাড়ির জানলা কিংবা বারান্দা থেকে সেই রাজকীয় মোহিনী বর্ষাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারে। ওর মনটা তখন এত খুশি-খুশি হয় যে, কাউকে সেই মনের অবস্থাটা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব।

চিরব্রত যে বর্ষাকে এইভাবে উপভোগ করতে চায় তার কারণ, বৃষ্টিতে একটু-আধটু ভিজলেই ওর ঠান্ডা লেগে যায়। তাই সেই ছোটবেলা থেকে ছাতা ওর সঙ্গী। এইরকম ছাতাপ্রীতি দেখে স্কুলের বন্ধুরা ওকে 'শিবাজী' বলে ডাকত —কারণ তার আড়ালে 'ছত্রপতি' ঠাট্টাটা লুকিয়ে ছিল।

আর-একরকম বর্ষার ছবি চিরব্রতর খুব কাছের। সেটা হল, ঝিরঝিরি ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে কি পড়ছে না। অথচ আকাশে পরতে-পরতে সাজানো কালো আর গাঢ় ছাইরঙের মেঘের দল। যেন প্রকাণ্ড কয়েকটা ফুলকপি সেখানে ভেসে আছে। মাঝে-মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক সেগুলোকে চিরে দিচ্ছে।

এখন আকাশটা এইরকম। ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামার আয়োজন একেবারে সম্পূর্ণ। শুধু নামলেই হয়।

চিরব্রত এলাকার প্রাইমারি স্কুলের মাঠে হাঁটছিল—স্কুল বিল্ডিং-এর লাগোয়া বেশ বড়সড় মাঠ। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভোরবেলা এটাই ওর একমাত্র ব্যায়াম। স্কুল-মাঠে কুড়ি পাক জোরে-জোরে হন্টন। মাঠের দু-দিকে দুটো গোলপোস্ট। উত্তরদিকের গোলপোস্ট থেকে বিশ কি পঁচিশ গজ দূরেই স্কুল। ছোটবেলায় চিরব্রত এই স্কুলে পড়ত। নবমুকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ওর বাবা পরশুরাম আচার্য এই স্কুলে মাস্টারি করতেন। সারাজীবন মাথা উঁচু করে থেকেছেন। কখনও কোনও চাপের কাছে মাথা নোয়াননি। দু-দুবার তো সমস্যা হওয়ায় চাকরি থেকে রিজাইন দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দুবারই সহকর্মী টিচার আর পাড়ার গার্জেনদের অনুরোধের চাপে সিদ্ধান্ত বদলেছিলেন।

স্কুলের গভর্নিং বডিও সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল।

হাঁটতে-হাঁটতে বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল চিরব্রত। ওর সঙ্গে ছাতা নেই। আজ বোধহয় একটু ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে।

ওর পাশে-পাশে তাল মিলিয়ে হাঁটছিল মেহান। চিরব্রতর দেখাদেখি ও-ও বারবার তাকাচ্ছিল আকাশের দিকে।

একসময় মেহান জিগ্যেস করল, 'কী, স্যার, কী দেখছ? বৃষ্টিটা এবার জোরে নামবে কিনা আইডিয়া করতে চাইছ?'

চিরব্রত হাঁটতে-হাঁটতেই বলল, 'না, না—আমি মেঘের বিউটি দেখছি।'

'বিউটি?' মেহান কেমন থতিয়ে গেল। আবার বলল, 'বিউটি?'

চিরব্রত ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'বিউটি ব্যাপারটা তুমি বুঝবে না, মেহান। ওটা লজিক দিয়ে বোঝা যায় না।'

মেহান চিরব্রতর পারসোনাল সার্ভিস রোবট। নাইন্‌থ জেনারেশনের চিপ দিয়ে তৈরি। ওর শরীরের সব পার্ট্‌সই পলিমার কোটেড। তাই ওয়াটারপ্রুফ। এ ছাড়া ওর শরীরটা এতই স্ট্রং যে, পাঁচ কোটি পাস্কাল পর্যন্ত চাপ সহ্য করতে পারে—মানে, স্ট্যান্ডার্ড অ্যাট্‌মসফেরিক প্রেশারের পঞ্চাশ গুণ।

চিরব্রতর কথায় মেহান চুপ করে রইল। রোবটদের যে কত অপমান সহ্য করতে হয়!

মাঠে আরও সাতজন মানুষ হাঁটছিল। তারাও মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছিল আকাশের দিকে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে চিরব্রত বলল, 'মেহান, ওই দ্যাখো, ওরাও মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। সেটা কিন্তু বৃষ্টির ব্যাপারটা আইডিয়া করার জন্যে। ওদের ক্ষেত্রে ইউ আর রাইট।'

মেহান হাঁটতে-হাঁটতেই বলল, 'বুঝেছি—।' যাক, অপমানের জ্বালা একটু কমল!

এ-অঞ্চলের সকলেই মেহানকে চেনে। রাস্তাঘাটে দেখা হলে ওর সঙ্গে দু-চার টুকরো কথাও বলে। তাই মেহানের দিকে কেউই অবাক হয়ে তাকাচ্ছে না।

চিরব্রত আঠেরো নম্বর পাক কম্‌প্লিট করছিল। তাই বিড়বিড় করে 'আঠেরো' কথাটা বারবার আওড়াচ্ছিল। ওর বেশ টায়ার্ড লাগছিল। ওঃ, কুড়িটা পাক শেষ হলে হয়!

হাঁটতে-হাঁটতেই মেহানের দিকে তাকাল। নাঃ, ও একইরকম। প্রথম পাক শুরুর আগে যেমন ছিল। ক্লান্তিহীন। কুল। তা ছাড়া শরীরের কোথাও ওর

একফোঁটা ঘাম নেই। ঘাম তো থাকবে না, কারণ, ওর সফ্‌ট পলিমারের শরীরে কোনও রোমকূপ নেই।

মেহানকে মানুষের মতো দেখতে হলেও ছোট-ছোট তফাত আছে। ও হান্ড্রেড পারসেন্ট অ্যান্ড্রয়েড নয়। না হোক, তাও মেহানকে চিরব্রতর পছন্দ। কারণ, মেহান চিরব্রতর কনসেপ্ট আর ডিজাইনে তৈরি। তখন ও 'ইন্‌টেলিজেন্ট রোবোটিক্স করপোরেশন' বা সংক্ষেপে 'ইন্‌রোকর' কোম্পানিতে কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট হিসেবে স্মার্ট রোবট ডিজাইনের কাজ করত। ওর ডিজাইন করা নাইন্‌থ জেনারেশন রোবট ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল। তখন 'ইন্‌রোকর'-এর এম. ডি. কৃষ্ণমূর্তি খুশি হয়ে ওকে একটা প্রোটোটাইপ নাইন্‌থ জেনারেশন অ্যান্ড্রয়েড গিফ্‌ট করেছিলেন। পরে চিরব্রত সেটারই নাম রেখেছে 'মেহান'—'মেহনতি' শব্দটা থেকে।

মাঠের ভিজে ঘাস, চারপাশের গাছপালা, ছোট-বড় বাড়ি, আকাশের মেঘ, উড়ে যাওয়া ভিজে কাক—এসব দেখতে-দেখতে চিরব্রতর মনটা কেমন হয়ে যাচ্ছিল। বাবা আর মায়ের কথা মনে পড়ছিল। তাই উনিশ নম্বর পাক শেষ করে ও কখন যে কুড়ি নম্বর পাকে পা দিয়ে ফেলেছে সেটা ওর খেয়ালই ছিল না।

এমন সময় মোটরবাইকের শব্দ শোনা গেল। কানফাটানো 'ভটভট' শব্দ করতে-করতে তিন-তিনটে মোটরবাইক সরু পিচের রাস্তা ছেড়ে ঢুকে পড়ল মাঠের ভেতরে। তারপর প্রচণ্ড স্পিডে মাঠের মধ্যে এলোমেলো কাটাকুটি খেলতে লাগল। হাঁটতে থাকা মানুষগুলোর সামনে দিয়ে অথবা পিছন দিয়ে বারবার বেপরোয়াভাবে ছুটে যেতে লাগল। এই বুঝি অ্যাক্সিডেন্ট হয়-হয়!

মাঠে যারা হাঁটছিল তারা আচমকা এই উৎপাতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চিরব্রত আর মেহানও।

একটা মোটরবাইককে চিরব্রত চিনতে পারল। এলাকায় বাইকটাকে সবসময় ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। বাইকটার সামনে একটা ছোট মেটাল ফ্ল্যাগ লাগানো। এই চকচকে ফ্ল্যাগটার জন্যই বাইকটাকে চিনে নেওয়া সহজ। আর সেইসঙ্গে তার মালিকও চেনা হয়ে গেছে।

ব্যায়াম করা ভারী চেহারা। গোল মুখ। জেল মাখানো কায়দা করা চুল। মুখে দু-চারদিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। বাঁ-কানের লতিতে স্টেইনলেস স্টিলের একটা আংটা লাগানো। গায়ে ছোট হাতা রাউন্ড নেক কালো

টি-শার্ট। পায়ে জিন্‌স।

চিরব্রতর সঙ্গে ছেলেটার পরিচয় না থাকলেও চিরব্রত ওর নাম জানে। শুধু চিরব্রত কেন, কাসুন্দিগঞ্জ এলাকার সকলেই ওর নাম জানে। ফ্যান্টা। চায়ের দোকানের আড্ডায় বা মুদিখানার দোকানে লোকজনের কাছে চিরব্রত শুনেছে, ফ্যান্টার কথায় কাসুন্দিগঞ্জ নাকি ওঠ-বোস করে।

বছর পনেরো আগে এখানে একটা হ্যারিকেন তৈরির কারখানা ছিল। বহুদিন হল ওটা উঠে গেছে। তারই পড়ে থাকা জমিতে পিচরাস্তা ঘেঁষে ফ্যান্টাদের ক্লাব 'তরুণদল'। বিশাল টালির ঘর, তবে ভেতরটা দারুণভাবে সাজানো-গোছানো। এসি, কালার টিভি, চেয়ার-টেবিল সবই আছে সেখানে। আর আছে মহাপুরুষদের ফোটো। সকাল-সন্ধে সেখানে ধূপকাঠি জ্বলে।

বাকি দুটো মোটরবাইকের সওয়ারিকে চিরব্রত চিনতে পারল না। দুজনেরই বেশ রোগাটে চেহারা। একজনের চাপদাড়ি আছে। গায়ে লাল আর কালো রঙের জিম ভেস্ট। অন্যজন যে বেশ লম্বা সেটা বাইকে বসে থাকা অবস্থাতেও ভালোই বোঝা যাচ্ছে। ছেলেটার মুখটা চোয়াড়ে, সরু। লম্বা-লম্বা চুল। গায়ে গেরুয়া রঙের খাটো পাঞ্জাবি। মুখে পানমশলা গোছের কিছু একটা থাকায় ঠোঁট চেপে চোয়াল নাড়ছে।

তিনজনের কারও মাথাতেই হেলমেট নেই। অবশ্য এ-অঞ্চলে হেলমেট পরার রেওয়াজও নেই খুব একটা।

বাইক তিনটে এখন একজন বিশেষ লোককে ঘিরে পাক খাচ্ছে। ভদ্রলোককে চিরব্রত চেনে। নাম উত্তম নাথ। বয়েস বাহান্ন কি পঞ্চান্ন। বড় রাস্তার কাছে ওঁর গ্রিল আর কোলাপসিব্‌ল গেট তৈরির দু-দুটো জমজমাট কারখানা আছে।

উত্তম নাথকে ঘিরে তিনটে বাইক গরগর আওয়াজ তুলে পাক দেওয়া শুরু করতেই হাওয়া ভালো নয় বোঝা গিয়েছিল। তাই বাকি হাফডজন হন্টনবিলাসী দশ-পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই এদিক-ওদিক সটকে পড়ল।

চিরব্রত উত্তম নাথের বিশ-পঁচিশ ফুটের মধ্যেই ছিল। ও যে ব্যাপারটা শুধু দেখতে পাচ্ছিল তা নয়, ফ্যান্টাদের কথা শুনতেও পাচ্ছিল। ওরা আজেবাজে ভাষায় বেলাগাম মুখখিস্তি করে উত্তম নাথকে শাসাচ্ছিল।

উত্তমবাবুর মুখ তখন ফ্যাকাশে সাদা। চোখের চশমাটা বারবার ঠিক করে নাকের ওপরে বসাচ্ছেন আর পালা করে তিনটে ইতর ছোকরার মুখের দিকে

তাকাচ্ছেন। 'আ-আ—' করে কিছু একটা বলতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না—কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে।

'আমাদের ফিফ্‌টি থাউজেন্ডের কেসটার কথা ভুলে গেলেন নাকি মাইরি?' উত্তমের মুখোমুখি বাইকটা আচমকা ব্রেক কষে দাঁড় করিয়ে চাপদাড়ি জিগ্যেস করল।

আর দুটো বাইক তখন উত্তম নাথের পিছনে থমকে দাঁড়িয়েছে। এবং ফ্যান্টা একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে।

'না...মানে...ভুলিনি। শুধু টাকাটা জোগাড় করতে...একটু...টাইম... লাগবে।' কোনওরকমে কথাগুলো উত্তমের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

চিরব্রত ঠিক বুঝতে পারছিল না কী করবে। ফ্যান্টাদের সম্পর্কে এই কয়েক বছরে ও যতটুকু জেনেছে তাতে হয়তো ওর চলে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ওর বিবেক ওকে দাঁড় করিয়ে রাখল। দোলাচলে আধমিনিট মতো কেটে গেল।

'সোনো, মেসোমসাই—' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে 'স-স' করে বলল ফ্যান্টা, 'তুমি কি চাও না, পাড়ায় একটু ধম্ম-কম্ম হোক, পুজো-আচ্চা হোক? তোমাকে তো বলেছি, ডোনেসন নিয়ে বটতলায় আমরা একটা হাই পালিসের সিবমন্দির তৈরি করব। তো পঞ্চাস হাজার দিতে গিয়েই তোমার পেছন দিয়ে হাওয়া ফুস হয়ে গেল?'

'এসব কী আজেবাজে কথা বলছ!' ফ্যান্টার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন উত্তম নাথ। ওঁর গোলগাল মুখে ভয়। ঘন-ঘন হাত বোলাচ্ছেন মুখে, মাথার টাকে।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে ফ্যান্টা বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ করল। তারপর শূন্যে পা ঘুরিয়ে বাইক থেকে নেমে দাঁড়াল।

সিগারেটে শব্দ করে লম্বা একটা টান মারল ফ্যান্টা। তারপর সামনে দু-পা ফেলে উত্তম নাথের একেবারে মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'সোনো, মেসোমসাই সোনা। লক্ষ্মী খোকা আমার। তোমার গ্রিল-ফিলের ব্যাবসাটা ঠিকঠাক চালাতে হবে তো! ধম্ম-কম্ময় মতি না থাকলে ব্যাবসা চলবে কী করে? অ্যা?' উত্তমের মুখে ধোঁয়া ছাড়ল ফ্যান্টা। উত্তম তোতলাতে শুরু করলেন।

ফ্যান্টা হঠাৎই সপাটে এক থাপ্পড় কষিয়ে দিল ভয় পাওয়া মানুষটার গালে।

চিরব্রতর ভেতরটা জ্বালা করছিল। ফ্যান্টা আর তার বাঁদর দলবলের বাঁদরামির কথা ও অনেক শুনেছে, কিন্তু চোখের সামনে দেখছে এই প্রথম। ওর অক্ষম বিবেক হতাশায় মাথা খুঁড়ছিল। উত্তমবাবুকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো উচিত, কিন্তু চিরব্রত কলমের কারবারি—তরোয়ালের নয়।

তাই ও সরে পড়ার জন্য পা বাড়াতেই ওর জামাটা কে যেন টেনে ধরল।

ও ঘুরে তাকাল।

মেহান।

'স্যার, পালিয়ে যেয়ো না। উত্তমবাবু বিপদে পড়েছেন...।'

'পালিয়ে' শব্দটা চিরব্রতর কানে খুব খারাপ শোনাল। এটা সত্যি যে, চিরব্রত ভয় পেয়েছে। কারণ, ফ্যান্টাদের মোকাবিলা করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

মেহান ফ্যান্টাদের ভালো করেই চেনে। সার্ভিস রোবট হিসেবে ওকে চিরব্রতর নানান ফাইফরমাশ খাটতে হয়, নিয়মিত দোকান-হাট করতে হয়। কাসুন্দিগঞ্জ এলাকাটা তাই মেহানের বেশ ভালোরকম চেনা-জানা। ফলে 'তরুণদল' ক্লাব এবং ফ্যান্টারাও। ফ্যান্টাদের বহুরকম ভিডিয়ো ইমেজ ওর রিকগনিশন সিস্টেমে রেকর্ড করা আছে।

চিরব্রত বুঝতে পারল, মেহান রোবট, তাই ওর লজিক দিয়ে ও ফ্যান্টা কিংবা তার দলবলকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছে না।

ফ্যান্টা তখন উত্তম নাথকে হুমকি দিয়ে বলছে, 'এই সালা, গোল্লাগোঁসাই, হাঁ কর। তোর বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়া দরকার। হাঁ কর সালা সিগ্‌গির!'

উত্তম নাথ ভয়ে সিঁটিয়ে গেছেন। ফ্যান্টার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে লাল হয়ে যাওয়া গালটায় হাত বোলাচ্ছেন। ফ্যান্টার হুমকিতে সেই অবস্থাতেই ভয়ে-ভয়ে হাঁ করলেন।

ফ্যান্টা সিগারেটটায় এত জোরে একটা টান দিল যে, মনে হল যেন গাঁজার কলকেতে টান দিচ্ছে। তারপর উত্তমের হাঁ করা মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার লম্বা স্রোত পাঠিয়ে দিল উত্তমের মুখের ভেতরে।

বারকয়েক কেশে উঠলেন উত্তম। হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। কোনওরকমে গুঙিয়ে-গুঙিয়ে বললেন, 'আমায় ছেড়ে দাও! আজ বিকেলে... বিকেলে কারখানায় এসে টাকাটা...নিয়ে যেয়ো...।'

ফ্যান্টা আর তার দুই শাগরেদ এবার হেসে উঠল। হেসে-হেসে গড়িয়ে পড়ল। ঠিক তখনই ফ্যান্টা বুক সমান পা তুলে উত্তমের ভুঁড়িতে জোরালো এক লাথি মারল। উত্তম নাথ ভেজা ঘাসের ওপরে ছিটকে পড়লেন। ফ্যান্টা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা উত্তমের গায়ে ছুড়ে মারল।

চিরব্রতর গা-রি-রি করছিল। এসব ব্যাপার চোখের সামনে দেখে সহ্য করা খুব কঠিন। কিন্তু একদল পশুকে একজন নিরীহ মানুষ কেমন করে রুখবে?

মেহান কিন্তু ছুটে চলে এল উত্তমের কাছে। ও দৌড়লে কেমন যেন নাচের ছন্দে ছুটছে বলে মনে হয়। হাঁটলেও তাই।

উত্তমকে তুলে ধরে দাঁড় করাল ও। উত্তম তখন থরথর করে কাঁপছেন।

মেহান ফ্যান্টার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এরকম করে কারও গায়ে হাত তুলতে নেই। তা হলে সবাই তোমাকে জানোয়ার বলবে।'

ফ্যান্টা বেশ অবাক হয়ে মেহানের দিকে তাকাল। তারপর চিরব্রতর দিকে।

চিরব্রত মেহানের পিছন-পিছন ছুটে এগিয়ে এসেছে। তাই একটু হাঁপাচ্ছিল।

ফ্যান্টা চিরব্রতকে বলল, 'মাস্টারমসায়, তোমার এই লোহার মালটা দেখছি বেস জ্ঞান-ট্যান দিতে পারে। ওটাকে চুপ করতে বলো। নইলে এখুনি কালোয়ারের কাছে নিয়ে গিয়ে ওজনদরে বেচে দেব।'

প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর হল চিরব্রত 'ইন্‌রোকর'-এর চাকরি ছেড়ে দেশের বাড়িতে চলে এসেছে। তারপর থেকে ও আর কোনও চাকরির চেষ্টা করেনি। বাড়িতে বসে ক্লাস নাইন-টেনের ছেলেমেয়েদের ব্যাচ পড়ায়। অঙ্ক আর ফিজিক্যাল সায়েন্স। তাই কাসুন্দিগঞ্জের অনেকের কাছেই ও 'মাস্টারমশায়'। তা ছাড়া এর মধ্যেই ও 'ভালো পড়ায়' বলে বেশ সুনাম করেছে। তাই এলাকার ছেলেমেয়েরা চিরব্রতর কাছেই ম্যাথ্‌স আর ফিজিক্স পড়তে আসে।

মেহানের প্রতিবাদে চিরব্রত বুকের ভেতরে একটু যেন সাহসের খোঁজ পেল।

'দ্যাখো, ভাই ফ্যান্টা। তোমাকে তুমি করেই বলছি। তোমার যা বলার সেটা উত্তমবাবুকে তুমি ভদ্রভাবে বলো। এভাবে মারধোর করে বলাটা ঠিক নয়...।'

চিরব্রতর কথা শেষ হতে না হতেই ফ্যান্টা ওর দিকে ছিটকে এল। ছোবল মেরে ওর গলার কাছটায় কলার খামচে ধরল। মাথাটা কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে

চাপা হিংস্র গলায় বলল, 'আমার কেসে নাক গলালে চপার দিয়ে নাক কেটে দেব। তখন দেখব নাক কাটা মাস্টারের কোচিং-এ ক'পিস ইস্টুডেন্ট যায়!'

চিরব্রত হকচকিয়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে ভয়ও পেয়েছিল। ফ্যান্টার এইরকম জঙ্গি প্রতিক্রিয়া ও আশা করেনি। কিন্তু মেহানের প্রতিক্রিয়াও ওকে চমকে দিল।

মেহান পলকের মধ্যে পৌঁছে গেছে ফ্যান্টার বাইকের কাছে। এবং তার পরের দু-সেকেন্ডে এক ঝটকায় বাইকটাকে শূন্যে তুলে নিয়েছে। ওটাকে উঁচু করে সটান তুলে ধরেছে মাথার ওপরে। যেন ভিনগ্রহের কোনও প্রাণী ওয়েট লিফটিং-এর কম্পিটিশনে পার্‌ফর্ম করছে।

চিরব্রত পলকের জন্য ভয় পেল। মেহান আর বাইকের কম্বাইন্ড সিস্টেমের সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি যদি ভার্টিকাল লাইন থেকে পাঁচ ডিগ্রি কোণের বেশি সরে যায় তা হলে লোডের যা এফেক্ট হবে তাতে বাইকসমেত রোবটটা সটান মাঠের ওপরে আছড়ে পড়বে।

কিন্তু সেটা হল না। মেহানের কন্ট্রোল সিস্টেম সি. জি.-টাকে ভার্টিকাল লাইন থেকে এক মিনিট কেন, এক সেকেন্ড কোণও সরতে দিল না।

ফ্যান্টা চিৎকার করে উঠল, 'বাইকটা রাখ বলছি, সালা লোহার বাচ্চা!'

'স্যারকে আগে ছাড়ো।' সাদামাঠা স্বাভাবিক গলায় বলল মেহান। কারণ, রোবটের রাগ বা উত্তেজনা বলে কোনও ব্যাপার নেই।

আকাশে মেঘের আড়ালে প্রকাণ্ড মাপের লোহার বল গড়াতে লাগল কেউ। চিরিক-চিরিক সাদা আলো ঝলসে উঠছে মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে। বৃষ্টি নামতে বোধহয় খুব দেরি নেই।

চিরব্রতর কলার ছেড়ে দিল ফ্যান্টা। ছুটে গেল মেহানের কাছে। বাইরে থেকে মেহানকে দেখতে মানুষের মতো হলেও ওর বডিটা যে আসলে স্টিলের তৈরি সেটা ফ্যান্টা জানে। তাই উত্তম নাথ কিংবা চিরব্রতর মতো মেহানকে ও আক্রমণ করল না। করলে ফল অবশ্যই উলটো হত।

মেহান বাইকটা সাবধানে নামিয়ে রাখল মাটিতে। ফ্যান্টাকে বলল, 'আমি আইজ্যাক অ্যাসিমভের থ্রি ল'জ অফ ''রোবোটিক্স''-এর সূত্রগুলো মেনে চলি। আমার ডায়ানমিক প্রপার্টিজের কোর সার্কিটে প্লাজমন টেকনিক দিয়ে ল'-গুলো এমবেড করা আছে। স্যার করে দিয়েছে। ওগুলো না থাকলে আমি বাইকটার

বদলে তোমাকে তুলে নিতাম। তারপর আছাড় মেরে-মেরে তোমার হাড়গোড় গুঁড়ো করে দিতাম। আজ ফার্স্ট ল' তোমাকে বাঁচিয়ে দিল।'

ব্যাপারটা হয়তো মনে-মনে কল্পনা করছিল ফ্যান্টা। কারণ, ও যে মুহূর্তের জন্য শিউরে উঠল, সেটা চিরব্রতর নজর এড়ায়নি।

মেহানের টেকনিক্যাল কথাগুলো ফ্যান্টা একবর্ণও বোঝেনি। বোঝার কথাও নয়। তবে এটুকু বুঝতে পারল, একটা রোবট সাধারণত মানুষকে অ্যাটাক করতে পারবে না। ওই ল'-গুলো ওকে রুখে দেবে।

ফ্যান্টা কপালে হাত বুলিয়ে ঘাম মুছল। ওঃ, আজ ফার্স্ট ল' ওকে খুব জোর বাঁচিয়ে দিয়েছে। আইজ্যাক অ্যাসিমভ নামের লোকটাকে ও মনে-মনে 'থ্যাংক্স' জানাল।

চিরব্রত মেহানকে বলল, 'চলো, মেহান—বাড়ি চলো। এখনই হয়তো বৃষ্টি নামবে। জানো তো, আমি ভুল করে ছাতা নিয়ে বেরোইনি...।' তারপর উত্তম নাথের দিকে ফিরে ঃ 'আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। আপনাকে এগিয়ে দিই। আপনার কোথাও লাগেনি তো?'

জামা-প্যান্ট ঝাড়তে-ঝাড়তে উত্তম বললেন, 'না, সেরকম লাগেনি। শুধু কাদা-মাটিতে জামাকাপড়ের বারোটা বেজে গেছে—।'

ওরা তিনজনে পা বাড়াতেই একটা বাইকের হর্ন বেজে উঠল পিছন থেকে।

ওরা ফিরে তাকাল। ফ্যান্টা।

'কী হল, মেসোমসাই? আমাদের বটতলার ডেভেলাপমেন্টের কেসটা কী হবে? ওই পঞ্চাস কেজি-র জন্যে তোমার পেছন-পেছন আর কদ্দিন চক্কর কাটতে হবে?'

'বি-বিকেলে কারখানায় এসে...টাকাটা নিয়ে যেয়ো...।'

'এই তো সোনা খোকার মতো কথা! এতক্ষণে ব্যাটা লাইনে এসেছে।' ফ্যান্টা বলল। তারপর চিরব্রতর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাস্টারমসায়, রোবট বডিগার্ড সঙ্গে নিয়ে ফ্যান্টার সঙ্গে র‍্যালা মারতে এসেছ? তোমার লোহাকে কন্ট্রোল করো। নইলে ওই লোহা পিস-পিস করে তোমার পেছনে গুঁজে দেব। পাড়ার ডেভেলাপমেন্টে যে ডিসটাব করবে তাকে আমরা ছেড়ে দেব না—।'

ফ্যান্টার নোংরা কথাগুলো শোনার 'দায়িত্ব' শেষ করে চিরব্রতরা

হাঁটা দিল।

ফ্যান্টা আর ওর দলবল এই এলাকার আবর্জনা। যেমন নোংরা ওদের ভাষা তেমনই নোংরা ওদের কাজকর্ম আর চালচলন।

বটতলার ডেভেলাপমেন্ট!

এলাকার ভেতর দিয়ে একটাই পিচের রাস্তা। রাস্তাটা সরু আর ভাঙাচোরা, ছালচামড়া ওঠা। বহু জায়গায় ব্রিক সোলিং বেরিয়ে গেছে। অঞ্চলের চেয়ারম্যানের নিগামানিতে ফি-বছর বর্ষায় রাস্তাটার 'ডেভেলাপমেন্ট' করা হয়। সেই রাস্তারই একটা ভাঁজের কোণে 'বটতলা' নামের জায়গাটা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বহু পুরোনো একটা বটগাছ। তার নীচে একটা ছোট্ট শিবমন্দির। তাকে ঘিরে সিমেন্ট বাঁধানো একটা বড়সড় চাতাল। মন্দিরের মাথা থেকে একটা মরচে ধরা কালচে লোহার ত্রিশূল উঁচিয়ে আছে। ত্রিশূলের মাথায় সিঁদুরের দাগ।

ফ্যান্টারা এই মন্দিরটারই ডেভেলাপমেন্টের কথা বলছিল। ছোট্ট মন্দিরটাকে ভেঙে অনেক বড় করে নতুনভাবে তৈরি করা হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বা পাড়ার লোকজনের কাছে চিরব্রত যতটুকু শুনেছে, মন্দিরটাকে সাদা মার্বেল আর টালি দিয়ে বেশ সুন্দর করে তৈরি করা হবে। তাতে মন্দিরটার মর্যাদা বাড়বে। হয়তো দেবতারও।

মন্দির ডেভেলাপমেন্টে চিরব্রতর কোনও আপত্তি নেই, তবে বটতলা জায়গাটার এখন যা চরিত্র সেটা বদলাবে তো? কারণ, চিরব্রত যখনই সন্ধের পর ওই রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরেছে তখনই দেখেছে ফ্যান্টা আর তার দলবল ওখানে বসে তাসের জুয়া খেলছে। খেলোয়াড়দের সামনে তাস আর টাকাপয়সা একইসঙ্গে ছড়ানো রয়েছে।

যদি কখনও চিরব্রতর ফিরতে বেশি রাত হয় তা হলে ওদের বসানো মদের আসরটাও ওর ভালোই চোখে পড়ে। বোতল, গ্লাস, মাটির ভাঁড় ইত্যাদি নিয়ে ঘন হয়ে বসে থাকে চার-পাঁচজন। সেখানে আলো বলতে পাশের একটা ল্যাম্পপোস্টের আলো। আর নেশার মুড তৈরি করতে ওদেরই কারও মোবাইলে চটুল মিউজিক বাজছে।

কোনও-কোনও দিন নেশার ঘোরে অশ্লীল গালিগালাজসমেত ওদের ঝগড়া করতেও দেখেছে চিরব্রত। বটতলা জায়গাটার এমনই 'সুনাম' যে, রাত হয়ে গেলে প্রায় সকলেই জায়গাটা এড়িয়ে চলে। যেহেতু দ্বিতীয় কোনও রাস্তা

আর নেই, তাই 'এড়িয়ে চলা'-র একমাত্র উপায় হল সাইকেল-রিকশা।

সেই জায়গাটার 'ডেভেলাপমেন্ট' হবে। সেই উপলক্ষে বটতলায় 'মুক্তহস্তে দান করুন' প্ল্যাকার্ডও লাগানো হয়েছে। বাচ্চাকাচ্চা ছেলের দলকে চাঁদা তোলার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু বড়-বড় ডোনেশানগুলো আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছে ফ্যান্টাদের 'তরুণদল' ক্লাব।

তিনটে মোটরবাইক গাঁকগাঁক আওয়াজ তুলে স্কুল-মাঠ থেকে বেরিয়ে গেল। চিরব্রতর চোখে পড়ল, মাঠের লাগোয়া রাস্তায় বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে গেছে। বিনাপয়সায় রোমাঞ্চকর ব্যাপার দেখতে পেলে কে আর ছাড়ে!

মেঘের দিকে তাকাল চিরব্রত। তারপর তাকাল পশ্চিমদিকের গাছপালার দিকে। অনেকগুলো ঝুপসি গাছের মাঝে-মাঝে মাথা তুলেছে নারকেল গাছ আর সুপুরি গাছ। এ-গাছ থেকে ও-গাছে পাখি উড়ছে। দোয়েল আর টুনটুনির ডাক শোনা যাচ্ছে।

সত্যি, বর্ষার এই সকালটা কত মিষ্টি! প্রাণভরে এটার স্বাদ নিলে হাঁড়িচাচার গলাতেও গান ফুটবে। অথচ ফ্যান্টারা কেমন অদ্ভুত! কখন যেন ওরা একটা নেগেটিভ ওয়ার্ল্ডের বাসিন্দা হয়ে গেছে।

রাস্তায় পা দিয়েই উত্তম নাথ চিরব্রতকে বললেন, 'মাস্টারমশায়, আমি এবার যাই—।'

চিরব্রত একটু ইতস্তত করে জিগ্যেস করল, 'টাকাটা কি আপনি ওদের দিয়ে দেবেন ভাবছেন?'

'এ ছাড়া আর উপায় কী বলুন! আমাকে কে দেখবে?'

'ফাঁড়িতে একটা কমপ্লেইন করলে হয় না?' মেহান জিগ্যেস করল।

'ফাঁড়ি!' মলিন হাসলেন উত্তম, বললেন, 'ফাঁড়ির মেজোবাবুকে আপনি চেনেন না। ওসব করে কোনও লাভ নেই। ফ্যান্টারা তো বহু বছর ধরে এইরকম জুলুমবাজি আর গুণ্ডাগর্দি চালাচ্ছে, আপনি—' মেহানের দিক থেকে চিরব্রতর দিকে নজর ফেরালেন উত্তম ঃ 'আপনি থানায় গিয়ে দেখুন, ফ্যান্টার নামে আজ পর্যন্ত একটা এফ. আই. আর. পর্যন্ত কেউ করেনি। আমি যতটুকু জানি, ফ্যান্টা দুজনকে মার্ডারও করেছিল। এলাকার সবাই প্রায় জানে। কিন্তু যারা মার্ডার হয়েছে তাদের রিলেটিভরা ফাঁড়িতে কোনও কমপ্লেইন লেখায়নি। পুলিশের খাতায় ''মার্ডার্‌ড বাই পারস্‌ন অর পারসন্‌স আননোন'' লেখা হয়ে

চ্যাপ্টার ক্লোজ্‌ড হয়ে গেছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উত্তম, মাথা নাড়লেন। তারপর আপনমনেই বললেন, 'নাঃ, ওসব করে কোনও লাভ নেই।...চলি...।'

ফ্যান্টার এসব কীর্তির কথা চিরব্রত যে শোনেনি এমন নয়। তবুও ওর মনে হচ্ছিল, ছোট হোক বড় হোক একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। ও উত্তম নাথকে বলতে গেলে পিছু ডেকে বলল, 'চেয়ারম্যানকে বলে কিছু একটা করা যায় না?'

'চেয়ারম্যান?' যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন উত্তম। ঘুরে তাকালেন চিরব্রতর দিকে। ফ্যাকাশে হাসলেন ঃ 'চেয়ারম্যানসাহেবকে চেয়ারম্যানের চেয়ারে থাকতে গেলে ফ্যান্টাদের সাপোর্ট খুব জরুরি। এবারে বুঝে নিন...।'

উত্তম নাথ চলে গেলেন। মেহান আর চিরব্রত উলটোদিকে হাঁটা দিল। সেটাই ওদের বাড়ির পথ।

রাস্তার এখানে-ওখানে জল আর কাদা। নালা জলে টইটম্বুর। তার মধ্যে খুদে-খুদে মাছ ছটফট করে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। নালার পাড়ে বর্ষার সবুজ ঘাস। ঘাসগুলো লম্বায় এত বেড়ে উঠেছে যে, ধানের চারার মতো লাগছে।

'মাস্টারমশায়, ভালো আছেন?' একজন বৃদ্ধ মানুষ সাইকেল চালিয়ে চিরব্রতর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কথাগুলো বললেন। ওঁর সাইকেলের কেরিয়ারে বাজারের থলে।

চিরব্রত হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ভালো আছি। আপনি?'

দূর থকে শোনা গেল, 'কেটে যাচ্ছে—তবে রক্ত পড়ছে না...।'

বৃদ্ধের নাম সুরনাথ মজুমদার। রোগা হলেও শক্তপোক্ত অ্যাক্‌টিভ চেহারা। মিশুকে স্বভাব। বটতলার মোড় পেরিয়ে সাইকেল স্ট্যান্ডের পর ওঁর একতলা বাড়ি। সন্ধের পর বাড়ির রোয়াকে বসে সঙ্গীসাথী নিয়ে দাবার আসর বসানো সুরনাথের নেশা।

মেহান হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'স্যার, তুমি বললে কেন ''ভালো আছি''? ফ্যান্টার সঙ্গে ওইসব গোলমালের পর কেউ ভালো থাকতে পারে না। তার মানে, স্যার, তুমি মিথ্যে বললে...।'

মেহানকে কী জবাব দেবে চিরব্রত! বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে যে রোজ কত মিথ্যে বলতে হয়! মেহান রোবট—তাই ওর সেসব ঝামেলা নেই। যা বলা উচিত বলে মনে করে তা-ই বলে দেয়।

'দ্যাখো মেহান, এটা সৌজন্য—মানে, ভদ্রতা। এ ছাড়া এটাকে খানিকটা

অভ্যেসের ব্যাপারও বলতে পারো...।'

মেহান একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মানে ও ভাবছে—প্লাজমন অ্যান্ড্রয়েডরা লজিকের পর লজিক জুড়ে যতটা পর্যন্ত ভাবতে পারে। তা ছাড়া মেহানের ব্রেন হল এ. এন. এন. বেস্‌ড লার্নিং সিস্টেম। নতুন-নতুন বিষয় যা দ্যাখে কিংবা শোনে সেগুলো ও ওর বাব্‌ল মেমোরিতে ঢুকিয়ে নেয়।

'আচ্ছা, স্যার, ফ্যান্টা একটু আগে যেসব কথা বলছিল তার মধ্যে কয়েকটা ওয়ার্ড আমার নতুন লেগেছে। যেমন ''মাইরি'', ''ব্যাটা'', ''ইস্টুডেন্ট'', ''পেছন দিয়ে হাওয়া ফুস'', তারপর...।'

'থামো, থামো, থামো!' আঁতকে উঠে চেঁচাল চিরব্রত, 'এর মধ্যে ''ইস্টুডেন্ট'' মানে হল ''স্টুডেন্ট''। এ ছাড়া বাকিগুলো সব গালাগাল—ওগুলো তোমার মনে রাখার কোনও দরকার নেই। এক্ষুনি ওগুলো ভুলে যাও—।'

'ঠিক আছে, তাই হবে, স্যার।' মেটাল-ছোঁয়া ভয়েসে শান্তভাবে বলল মেহান।

সামনের রাস্তা ধরে তিনটে ছেলে সাইকেল চালিয়ে আসছিল। ওদের গায়ে ফুটবল খেলার জার্সি। তার মধ্যে একজনের বাঁ-বগলে একটা ফুটবল, বয়েস বড়জোর তেরো কি চোদ্দো।

মেহানদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা তিনজনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'রোবটকাকু! রোবটকাকু!'

মেহান ওদের দিকে হাত নাড়ল। এ পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা ওকে 'রোবটকাকু' বলেই ডাকে। কখনও-কখনও এইসব ছেলেমেয়ের ঝাঁক চিরব্রতর বাড়িতে এসে ভিড় করে—মেহানের অঙ্কের ম্যাজিক দেখবে বলে। মেহান বড়-বড় সংখ্যা নিয়ে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে চোখের নিমেষে নিখুঁত উত্তর বের করে ফেলতে পারে। পাটিগণিত বা বীজগণিতের অঙ্ক ওর কাছে নস্যি। আর অঙ্কগুলো সল্‌ভ করতে ও সময় নেয় বড়জোর দু-চার সেকেন্ড।

মেহানের এই ক্যালি দেখে ছেলেমেয়েগুলো ভীষণ খুশি হয়, ও প্রতিটি অঙ্কের উত্তর দেওয়ামাত্রই হাততালির বন্যায় চিরব্রতর ঘর ভেসে যায়। তখন কি মেহান একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ে, একটু খুশি হয়? চিরব্রত লক্ষ করেছে,

ছেলেমেয়ের দলকে নকল করে মেহানও তখন হাততালি দেয়। মেহান অ্যান্ড্রয়েড বলে ওর হাততালির শব্দটা মানুষের মতোই শোনায়—ঠং-ঠং আওয়াজ হয় না।

চিরব্রত আর মেহান যখন প্রায় বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে তখন বৃষ্টি নামল। তাই বাকি পথটুকু চিরব্রতকে দৌড়তে হল। মেহানও ছুটল ওর 'স্যার'-এর পিছু-পিছু।

বাউন্ডারির গ্রিলের গেটের হুড়কো খুলে চিরব্রত ভেতরে ঢুকল।

কাঁচা উঠোন। জল-কাদা যাতে পায়ে না লাগে সেজন্য জোড়া-জোড়া ইট পাতা। জোড়া ইটের চারটে পেরোলেই একতলা বাড়ি। বাড়ির দোতলার ন্যাড়া ছাদ থেকে বেশ কয়েকটা ঢালাইয়ের রড আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চিরব্রতর বাবা পরশুরাম ভেবেছিলেন পরে কখনও সামর্থ্য হলে দোতলাটা তুলে নেবেন। কিন্তু তার আর সময় পাননি। রিটায়ার করার দু-বছর পর হঠাৎই সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা যান। চিকিৎসা করার কোনও সময় কাউকে দেননি।

সময়। কী সাংঘাতিক একটা শব্দ। সবসময় একইদিকে বয়ে চলে। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার।

পরশুরাম স্বভাবে ব্যস্তসমস্ত মানুষ ছিলেন। সবসময় তাড়াহুড়ো করে কাজ করতেন, তবে ঠিকঠাক করতেন। তাই তাড়াহুড়ো করেই যেন চলে গেলেন। চিরব্রতকে সেবা-যত্নের কর্তব্যটুকুও করার সময় দেননি।

ছাদের খাড়া হয়ে থাকা লোহার রডগুলোর দিকে তাকালে চিরব্রতর সবসময় বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা হঠাৎ করে চলে যাওয়ার পর ওই রডগুলো যেন বাবার হয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে।

এখনও বাবার কথা মনে পড়ল। ফ্যান্টাদের অন্যায়-অবিচার দেখলে পরশুরাম কীভাবে রিয়্যাক্ট করতেন কে জানে!

উঠোন পার হলেই আবার গ্রিলের দরজা। দরজায় তালা ঝুলছে। চিরব্রত আর মেহান ছাড়া এ-বাড়িতে আর কেউ থাকে না।

চিরব্রত প্যান্টের পকেট থেকে চাবি বের করল।

গ্রিলের দরজার ঠিক পাশেই বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে একটা মাধবীলতা গাছ। বর্ষায় পাতার পর পাতা আর ফুলের পর ফুল সাজিয়ে একেবারে ঢলঢল করছে। দরজা দিয়ে ঢোকার সময় মাধবীলতার পাতা সবসময় চিরব্রতর মাথায়

আলতো করে হাত বুলিয়ে দেয়। ওমনি মায়ের কথা মনে পড়ে যায়।

চিরব্রতর মনে হয়, মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কারণ, এই গাছটা চিরব্রতর মা সন্ধ্যামালতী নিজের হাতে পুঁতেছিলেন, নিজের হাতে লালনপালন করেছিলেন। গাছপালা ফুল-টুল ভালোবাসতেন খুব। আরও ভালোবাসতেন সেইসব ফুল দিয়ে সকাল-সন্ধে ঠাকুরের আসনে পুজো দিতে।

পরশুরাম রিটায়ার করার ছ'মাসের মধ্যে সন্ধ্যামালতীর ক্যানসার ধরা পড়ে। অসুখটা প্যানক্রিয়াসে বাসা বেঁধেছিল। ওটা মা-কে দু-বছর আটমাস সময় দিয়েছিল। তার মধ্যে দু-বছর দু-মাস চিরব্রত মায়ের পাশে-পাশে ছিল। কারণ, তখন ও চাকরির পাট পাকাপাকিভাবে চুকিয়ে কাসুন্দিগঞ্জের বাড়িতে চলে এসেছিল। ঠিক করেছিল, বাবা-মায়ের ভিটে ছেড়ে ও আর কখনও কোথাও যাবে না। এখানকার জল, মাটি, বাতাস আর গাছপালাদের সঙ্গেই ও বাকি জীবনটা কাটাবে—ছোটবেলায় যেমন কাটিয়েছে।

চিরব্রত তালা খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা গন্ধ নাকে এল ওর। গন্ধটা ও চিনতে পারল।

মায়ের গন্ধ।

২. প্রথম জখম

চিরব্রত সপ্তাহে দু-দিন দু-বেলা দু-ঘণ্টা করে ছেলেমেয়েদের পড়ায়। সকাল আটটা থেকে দশটা। আর সন্ধেবেলা ছ'টা থেকে আটটা। কোনওদিন ক্লাস নাইনের ব্যাচ পড়তে আসে, আর কোনওদিন ক্লাস টেনের ব্যাচ।

'কোচিং' শব্দটা চিরব্রতর একটুও পছন্দ নয়, কিন্তু পাড়াতে ওর পড়ানোর ব্যাপারটা 'চিরস্যারের কোচিং' তকমা পেয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম চিরব্রতর কাছে নিজেদের ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠানোর ব্যাপারে অভিভাবকদের মনে দোটানা ছিল, কিন্তু কোচিং-এর প্রথমে কয়েক বছরের ছাত্রদের স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট আর মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে সেই দোটানা উধাও হয়ে যায়। তারপর, অল্প সময়ের মধ্যেই, 'চিরস্যারের কোচিং' গার্জেনদের কাছে লেটার মার্ক্স পেয়ে গেছে।

সন্ধেবেলার কোচিং ক্লাস চলছিল। অঙ্কের ক্লাস। ক্লাস নাইনের ব্যাচ।

ছাত্র আটজন। ঠিকভাবে বলতে গেলে পাঁচজন ছাত্র, তিনজন ছাত্রী।

চিরব্রত ওর বাড়ির বাইরের ঘরে পড়ায়। মেঝেতে বড় মাপের শতরঞ্চি পাতা, আর তার ওপরে একটা চেক-চেক রঙিন চাদর। চিরব্রত সেই চাদরের ওপরে বাবু হয়ে বসে ছিল। গায়ে পাজামা আর খদ্দরের পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। সামনে খোলা অঙ্কের বই আর দিস্তে খাতা। হাতে পেন।

ঘরটা মাপে তেমন বড় নয়। ঠিকঠাকভাবে আটজন ছাত্র বসতে পারে। তাই ব্যাচে আটজনের বেশি ছাত্র নেয় না চিরব্রত। এখন সেই ছাত্ররা ওকে ঘিরে বসে আছে। স্যারের অঙ্ক বোঝানো মন দিয়ে শুনছে। আর তারই ফাঁকফোকরে মেহানের তিনদিন আগের কীর্তির ফিসফিসে আলোচনা চলছে। ফ্যান্টা আর তার দলবলের বাড়াবাড়ির যে একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার সেটা ওরাও বোঝে। তাই ওরা রোবটকাকুর তারিফ করছিল।

আরও একজন চিরব্রতর অঙ্ক বোঝানো শুনছে। সেইসঙ্গে ছাত্রদের কথাবার্তাও মন দিয়ে শুনছে। ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে সে। নিজের ব্রেনের লার্নিং মডিউলের প্লাজমন সার্কিট 'অন' করে বাব্‌ল মেমোরিকে চার্জ করে দিয়েছে।

মেহান।

চিরব্রত বাড়িতে ছাত্র পড়াচ্ছে প্রায় পাঁচ বছর। মোটামুটিভাবে পড়ানো শুরু করার মাসছয়েক পরে ও মেহানকে অ্যাক্টিভেট করেছিল। সেইসঙ্গে ওর লার্নিং সিস্টেমের ট্রেনিং শুরু করেছিল। তখন থেকেই মেহান কোচিং ক্লাসে হাজির থাকে।

চিরব্রত দ্বিঘাত সমীকরণ বোঝাচ্ছিল।

তখনই সোনামণি নামে এক ছাত্রী জিগ্যেস করল, 'স্যার, ''দ্বিঘাত সমীকরণ'' মানে কী?'

চিরব্রতর খেয়াল হল, সোনামণি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। বাকিরা সব বেঙ্গলি মিডিয়াম। এ জন্য চিরব্রতর একটু-আধটু অসুবিধে হয়। বারবার ইংরেজি থেকে বাংলা, কিংবা বাংলা থেকে ইংরেজিতে যাতায়াত করতে হয়। তা ছাড়া সিলেবাসেও খানিকটা তফাত আছে। কিন্তু সোনামণির মা একেবারে নাছোড়বান্দা ছিলেন ঃ চিরব্রতর কোচিং-এ ওকে নিতেই হবে; অঙ্ক আর ফিজিক্স যেটুকু শিখবে ওর কাছে ভালো করে শিখুক। সুতরাং সোনামণি এখন চিরব্রতর ছাত্রী।

ফুটফুটে ফরসা। সুন্দর দেখতে। মাথার কোঁকড়ানো চুল মুখের দুপাশে ঝালরের মতো ঝুলছে। চোখ দুটোয় চঞ্চল চনমনে ভাব। সব মিলিয়ে সোনামণির মধ্যে এমন একটা টান রয়েছে যে, কোচিং-এর সব ছেলেমেয়েই ওর বন্ধু হতে চায়।

সোনামণির প্রশ্নে চিরব্রত হেসে ফেলল ঃ 'তোর ইংলিশ মিডিয়ামের কেসটা আমি সবসময় ভুলে যাই। যাক্‌গে—''দ্বিঘাত সমীকরণ'' মানে হল ''কোয়াড্র্যাটিক ইকুয়েশান''। অর্থাৎ, এক্স চলরাশি—মানে, এইরকম ইকুয়েশানে এক্স ভ্যারিয়েব্‌লটার ''পাওয়ার'' বা ''ঘাত'' দুইয়ের বেশি নয়...।'

চয়ন ফস করে বলল, 'স্যার, ''ঘাত'' মানে তো ''থ্রাস্ট''—মানে, ''ফোর্স''। সেদিন তো বললেন...।'

'হ্যাঁ, বলেছি। তবে সেটা ফিজিক্সে। অঙ্কের বেলায় ''ঘাত'' মানে ''পাওয়ার''। আবার বলিস না যেন ''পাওয়ার'' মানে তো ''ক্ষমতা''। সেটা হয় ফিজিক্সের ক্ষেত্রে। আবার ধর জিয়োলজির বেলায় ''ঘাত'' মানে ''ফল্ট''—''চ্যুতি''। বিজ্ঞানে এরকম নজির বহু আছে—।'

চয়ন বলল, 'হ্যাঁ, স্যার আছে। ফিজিক্সে ''রিয়্যাকশন'' মানে ''প্রতিক্রিয়া''। অথচ কেমিস্ট্রিতে এটার মানে ''বিক্রিয়া''।'

চয়ন খুব রোগা, লম্বা। মাথায় কদমছাঁট চুল। চোখে চশমা। ও কথা বলার সময় সামান্য তোতলামি টের পাওয়া যায়। তবে ছেলেটার ভীষণ জানার আগ্রহ। চিরব্রত ওকে পছন্দ করে।

চয়নের কথার পিঠে মানালি বলল, 'স্যার, মানচিত্রের বেলায় ''আয়তন'' মানে ''ক্ষেত্রফল''—''এরিয়া''। অথচ অঙ্কের বেলায় ওই একই ওয়ার্ডের মানে ''ভলিয়ুম''।'

মানালি পড়াশোনায় ভালো। তবে ওর কথাবার্তায় কেমন একটা বুড়োটে ভাব আছে। দেখতেও বেশ বড়-বড় গোছের মনে হয়। চয়নের সঙ্গে ওর যে একটা চাপা কম্পিটিশন আছে সেটা চিরব্রত বেশ বুঝতে পারে।

মানালির কথায় ও বলল, ''বললাম তো, এরকম এগ্‌জাম্পল অনেক আছে...।''

সদাশিব বাংলায় একটু বেশি-বেশি নম্বর পায়। হয়তো সেইজন্যই সুযোগ পেলে ও কোনও কারণ ছাড়াই বাংলার দিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দেয়।

ও দাঁত দিয়ে নখ কাটছিল। আচমকা বলে উঠল, ' ''ঘাত'' ওয়ার্ডটা

জুড়ে বাংলায় অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে।'

কথাগুলো বলে সদাশিব একটু থামল। ও চাইছিল, শব্দগুলো বলার জন্য কেউ ওকে উৎসাহ দিক। কিন্তু সেরকম কোনও উৎসাহ না মেলায় ও নিজের উৎসাহেই বলতে শুরু করল, 'ঘাত, আঘাত, ঘাতক, প্রতিঘাত, সংঘাত, অভিঘাত, ঘাতবল...।'

পাশ থেকে রাজ ওকে ছোট্ট করে চিমটি কেটে বলল, 'তুই থামবি? নয়তো তোকে আঘাত করব—!'

চিরব্রত বলল, 'ওসব থাক, সদাশিব—আমরা দ্বিঘাত সমীকরণে ফিরে আসি।'

ওদের 'থিয়োরি অফ কোয়াড্র্যাটিক ইকুয়েশান'-এর চর্চা চলতে লাগল। মেহান সেই আলোচনা থেকে নতুন-নতুন যত তত্ত্ব আর তথ্য পাচ্ছিল সেগুলো শুষে নিতে লাগল। ওকে সবকিছু শিখতে হবে। এটাই স্যারের নির্দেশ।

পড়ানোর মাঝে হঠাৎ সুধামাসির গলা শোনা গেল। বাড়ির ভেতর থেকে সুধামাসি কখন যেন কোচিং-ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

'খোকাবাবু, চা এনেছি।'

চিরব্রত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। দেখল, সুধামাসির হাতে চায়ের কাপ।

পড়ানো থামিয়ে চট করে উঠে পড়ল। সুধামাসির কাছে গিয়ে চায়ের কাপ নিল। একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'দারুণ।'

সুধামাসি অল্প হাসল। খোকাবাবুকে যখনই ও চা করে খাওয়ায়, তখনই খোকাবাবু এই একটাই কথা বলে ঃ 'দারুণ।'

চিরব্রতর ডাকনাম খোকাবাবু। মা আর বাবা ওকে এই নামে ডাকতেন। দেখাদেখি সুধামাসিও। চিরব্রতর সেই কোন ছোটবেলা থেকে সুধামাসি ওদের পরিবারে এসে রান্নাবান্নার কাজে জড়িয়ে পড়েছে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেছে। সুধামাসি কখন যেন রান্নাবান্নার কাজের মাসি থেকে এমনি 'মাসি' হয়ে গেছে।

সুধামাসি খুব নীচু গলায় কথা বলে। ছায়ার মতো নিঃশব্দে চলাফেরা করে। বাঁশপাতার মতো হালকা চেহারা। তবে চিরব্রত বা ওর মা-বাবার প্রতি সুধামাসির টান কখনও হালকা ছিল না।

মাসির এই ডাকনাম ধরে ডাকাটা চিরব্রতর ভালো লাগে। মনে হয়, সবকিছু যেন আগের মতোই আছে। মা, বাবা এখনও বোধহয় ওর

সঙ্গে আছেন।

সুধামাসি বলল যে, রাতের রান্না করা হয়ে গেছে। তাই রান্নাঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে ও চলে যাচ্ছে। কাল সকালে আবার আসবে।

চিরব্রত চায়ের কাপ হাতে ছাত্রদের সঙ্গে আবার বসে পড়ল। উদাহরণের কয়েকটা অঙ্ক ওদের বুঝিয়ে দিতে লাগল।

আধঘণ্টা মতন পড়ানো হয়েছে কি হয়নি, হঠাৎই বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল, 'আচায্যিবাবু! আচায্যিবাবু!'

পড়ানো থামিয়ে চিরব্রত ঘর থেকে বেরোল। গ্রিলের দরজার কাছে এল। সুইচ টিপে উঠোনের আলোটা জ্বেলে দিল।

যা দেখল তাতে একটা জোরালো ধাক্কা খেল।

উঠোনের আলোটা বেশি পাওয়ারের নয়। কিন্তু তাতেই অস্বাভাবিক দৃশ্যটা ধরা পড়েছে।

শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে যে-মানুষটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে চিরব্রত প্রথমে ঠিক চিনতে পারেনি।

গায়ে সাদা বুশ শার্ট আর প্যান্ট। সেগুলো জল-কাদায় মাখামাখি। জামায় লাল রঙের ছোপ লেগে আছে। পায়ে সাধারণ চপ্পল। মুখ দিয়ে চাপা গোঙানির শব্দ বেরোচ্ছে। বাঁ-হাতে একটা ফাইল বুকের কাছে খামচে ধরে আছে। আর ডানহাতটা সামনে বাড়িয়ে কিছু একটা ধরার জন্য খুঁজছে।

মানুষটার গোটা শরীরটা টলছে, থরথর করে কাঁপছে।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরে বসে চিরব্রত সেটা টের পায়নি। মানুষটা মনে হয় অনেকটা পথ বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে এসেছে, সেইজন্যই তার জামাকাপড় ভেজা। কিন্তু সেগুলোয় কাদা লাগল কী করে? আর লাল রংটা কি রক্ত?

মানুষটা মুখ নীচু করে থাকায় চিরব্রত তাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু কাসুন্দিগঞ্জে মাত্র একজন মানুষই ওকে 'আচায্যিবাবু' বলে ডাকে। তিনি নবমুকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারমশাই। প্রিয়রঞ্জন মাজি। চিরব্রতর বাবাকেও তিনি এই নামেই ডাকতেন। মানুষটিকে শ্রদ্ধা-সম্মান করতেন।

'মিস্টার মাজি!' চিরব্রতর গলাটা এমন পালটে গেল যে, ও নিজেই গলার স্বরটা চিনতে পারল না।

প্রিয়রঞ্জন মুখ তুললেন।

গায়ের রং মাঝারি। কপালটা চওড়া হতে-হতে টাকে গিয়ে মিশে গেছে।

মাথার পিছনের দিকটা কাঁচাপাকা চুল। বয়েস পঞ্চান্নর এদিক-সেদিক হবে। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা।

চিরব্রতর এই চেনা মুখটা এখন একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। কারণ, কপালের ডানদিকটা ফেটে রক্ত পড়ছে। চশমার বাঁ-দিকের কাচটা কোথায় যেন খুলে পড়ে গেছে। কপাল থেকে গাল বেয়ে রক্ত নেমে এসেছে আরও নীচে। তারপর সাদা জামাটা নিয়ে কারা যেন লাল রঙে হোলি খেলেছে। জল-কাদা মাখা শার্টের ওপরে লাল রংটা এখানে-সেখানে ছেয়ে আছে।

হেডমাস্টারমশায়ের ওপরের ঠোঁটটা বীভৎস ফুলে আছে। তার বাঁ-দিকটা ফেটে রক্ত বেরিয়ে পড়েছে।

চিরব্রতর ডাক শুনে তিনি দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে কিছু একটা ধরতে চাইলেন। আবার গুঙিয়ে উঠে বললেন, 'আচায্যিবাবু, আমায় বাঁচান!'

চিরব্রত চট করে উঠোনে নেমে এসে প্রিয়রঞ্জনকে জাপটে ধরল। প্রবীণ মানুষটা নিজের ওজন চিরব্রতর গায়ের ওপরে ছেড়ে দিলেন। চিরব্রত ওঁকে আঁকড়ে ধরে সাবধানে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এল।

প্রিয়রঞ্জনবাবু এলাকারই মানুষ এবং সকলের কাছে খুবই চেনা মুখ। তাই এই নিরীহ মানুষটিকে এরকম রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে কোচিং-এর ছেলেমেয়ের দল একেবারে আঁতকে উঠল।

মেহানকে ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা করতে বলল চিরব্রত। হেডমাস্টারমশায়কে ধরে ও সাবধানে চাদরের ওপরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিল। ছাত্ররাও বই-খাতা ফেলে প্রিয়রঞ্জনকে ঘিরে ধরল। মানুষটাকে নানান সাহায্য করতে লাগল।

মেহানের নিয়ে আসা ডেটল, তুলো আর গরমজল নিয়ে সোনামণি আর মানালি শুশ্রূষা শুরু করে দিয়েছে। সদাশিব, চয়ন, রাজ ওরা সবাই প্রিয়রঞ্জনের রক্তমাখা শার্ট ছাড়িয়ে চিরব্রতর এনে দেওয়া একটা জামা পরিয়ে দিচ্ছে। চোট পাওয়া মানুষটা তখন চোখ বুজে হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। পাশে ভেজা ফাইলটা পড়ে আছে।

চিরব্রত এক গ্লাস জল নিয়ে এসেছিল। ওঁর মাথার কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'জলটা খেয়ে নিন, মিস্টার মাজি। আপনার বাড়িতে ফোন করে একটা খবর দেবেন নাকি?' পকেট থেকে নিজের মোবাইল ফোন বের করল।

প্রিয়রঞ্জন এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে জানালেন, 'না—।' ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিলেন। একটা বড় শ্বাস ফেলে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন।

'আপনার এ-অবস্থা কেমন করে হল?'

চিরব্রতর দিকে তাকালেন প্রিয়রঞ্জন। করুণ মুখ। চোখে অসহায় ব্যথাতুর দৃষ্টি। চশমায় একটা কাচ নেই বলে দুটো চোখ দুরকম দেখাচ্ছে।

'আপনার এরকম হাল কেমন করে হল? অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে নাকি?'

'না, অ্যাক্সিডেন্ট না। বলছি...।' ছাত্র-ছাত্রীদের মুখের ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। বলবেন কি বলবেন না এই দোটানায় মুখ বুজে রইলেন।

চিরব্রতর কী মনে হল, ও চয়ন, সদাশিব, সোনামণিদের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারা করে বলল, 'অ্যাই, তোরা বাড়ি যা—তোদের আজ ছুটি। আবার পরশুদিন সন্ধেবেলা আসিস—ছ'টার সময়...।'

মানালি বলল, 'স্যার, ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে যাব নাকি?'

চিরব্রত কিছু বলার আগেই প্রিয়রঞ্জন মাজি হাত নেড়ে বললেন, 'না, না, ডাক্তার-টাক্তারকে খবর দেওয়ার দরকার নেই। তোমরা বাড়ি যাও...বাড়ি যাও...।'

চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করতে-করতে ছেলেমেয়েরা উঠোনের দিকে এগোল। চিরব্রত গ্রিলের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল। ওরা আটজনেই তখন ছাতা খুলেছে। নানান রঙের ছাতা।

চিরব্রত বারবার করে বলল, 'সাবধানে যাস...।'

ওরা অনেকে 'হ্যাঁ, স্যার—' বলে বাউন্ডারি গেট পেরিয়ে রওনা দিল।

চিরব্রত ঘরে ফিরে এল।

প্রিয়রঞ্জনবাবু এর মধ্যে খানিকটা যে সামলে উঠেছেন সেটা ওঁর সোজা হয়ে বসার ভঙ্গি দেখে মনে হল। মেহান কখন যেন এসে চাদরের ওপরে ঠিক ওঁর পাশটিতে বসেছে। মেহানের সঙ্গে প্রিয়রঞ্জনের পরিচয় থাকলেও তিনি বারবার অস্বস্তির চোখে মেহানের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

চিরব্রত এসে ওঁর মুখোমুখি বসল। একটু দূরে রাখা ওর আধখাওয়া চায়ের কাপ। আধাআধি খাওয়ার পর বাকিটা খেতে ভুলে গেছে। মাঝে-মাঝেই ওর এরকম হয়। এখন সেই চা জুড়িয়ে জল।

'মিস্টার মাজি, কী হয়েছে বলুন...।'

প্রিয়রঞ্জন মাজি আলতো গলায় বলতে শুরু করলেন।

৩. দ্বিতীয় সংঘর্ষ

প্রিয়রঞ্জন মাজি যখন তৈরি হয়ে বাড়ি থেকে বেরোলেন তখন ঘড়িতে ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিট।

ওঁর হাতে একটা ফাইল আর ছাতা। বৃষ্টি এখন পড়ছে না, তবে শুরু হলেই হল। আকাশের মেঘ ছ'টার সময়েই অন্ধকার নামিয়ে দিয়েছে।

এ-অঞ্চলের চেয়ারম্যান প্রীতম মণ্ডল। একইসঙ্গে উপকারী এবং দাপুটে। আজ ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে ওঁর অফিসে প্রিয়রঞ্জনকে যেতে বলেছেন। সঙ্গে যেন নবমুকুল স্কুলের এক্সটেন্শন বিল্ডিং-এর সবরকম কাগজপত্র থাকে। আলোচনার সময় ওগুলো দেখার দরকার হতে পারে।

সাইকেল-রিকশা-স্ট্যান্ডে রিকশা পেয়ে গেলেন সহজেই। রিকশা চালাচ্ছে বিমান। লোকাল ছেলে। বেঁটেখাটো চেহারা। ডানপায়ে একটু ডিফেক্ট আছে। তবে গায়ে জোর যে কম নয় সেটা ওর হাত আর পায়ের গোছের মাস্‌ল দেখেই বোঝা যায়।

'কই যাইবেন, সার?' গামছা দিয়ে মুখ মুছে বিমান জিগ্যেস করল।

'চেয়ারম্যানের বাড়ি—।' প্রিয়রঞ্জন বললেন।

রিকশা চলতে শুরু করল।

আসলে চেয়ারম্যানের বাড়ি আর অফিসের ঠিকানা একই। একতলার দুটো ঘর নিয়ে অফিস। এ ছাড়া গোটা চারতলা বাড়িটাই প্রীতম মণ্ডলের বাসভবন।

ঝাঁ-চকচকে বাড়ি। আগাপাশতলা মার্বেল দিয়ে মোড়া। দোতলা আর তিনতলার বারান্দায় বাহারি টবের সারি। সেখানে গ্রানাইট পাথরের পিলার ঘিরে রঙিন এল. ই. ডি. বাতির কলকা।

সুন্দর বাড়ির সামনে মানানসই দুটো গাড়িও এখন দাঁড়িয়ে আছে। একটা রুপোলি রঙের টয়োটা ইনোভা। আর তার পিছনে একটা নীল রঙের হিউন্ডাই আই-টেন। দুটো গাড়িই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে মানে চেয়ারম্যান এখন অফিসেই আছেন। কারণ, অফিস বন্ধ হলেই ইনোভা গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকে যায়। তা ছাড়া অফিসে এখন আলো জ্বলছে। দু-চারজনের কথাবার্তাও

শোনা যাচ্ছে।

বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামতে-নামতে প্রিয়রঞ্জন ভাবছিলেন, কেসটা ঠিক কীভাবে পুট-আপ করা যায়। যাতে বিনা ঝঞ্ঝাটে স্কুলের এক্সটেনশান বিল্ডিং-এর কাজটা শুরু করা যায়। তা হলেই গড়ে তোলা যাবে ফ্রি কম্পিউটার সেন্টার। কাসুন্দিগঞ্জে একটাও কম্পিউটার শেখার জায়গা নেই। এলাকার ছেলেমেয়েরা কেউ কম্পিউটার শিখতে চাইলে যেতে হয় সাড়ে চার কিলোমিটার দূরের জাহানাপুরে। তাই এক্সটেনশন বিল্ডিং-এ ফ্রি কম্পিউটার সেন্টার গড়ে তোলা প্রিয়রঞ্জন মাজির বহুদিনের স্বপ্ন। এক্সটেনশন বিল্ডিংটা একবার শুরু করতে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই।

প্রিয়রঞ্জনবাবুর সমস্ত ভাবনা জুড়ে শুধু এখন নতুন বাড়িটা তোলার চিন্তা। নতুন বাড়ি হলে তিনি একটা কম্পিউটার সেন্টার তৈরি করবেন। সেখানে থাকবে অন্তত পনেরোটা ডেস্কটপ কম্পিউটার। স্কুলের ছাত্ররা আর এলাকার ছেলেমেয়েরা সেখানে কম্পিউটার শিখবে। আর-একটা বড় ঘরে তিনি ইনডোর গেম্‌স-এর বন্দোবস্ত করবেন। সেখানেও সবাই মিলেমিশে খেলবে, নানান কম্পিটিশনে নাম দেবে।

স্বপ্ন। স্বপ্ন। নবমুকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বড় করে তোলার স্বপ্ন নিয়েই প্রিয়রঞ্জন মাজির জীবনের কতগুলো বছর কেটে গেল।

'আসুন, স্যার—আসুন...আসুন!'

অফিসের ঘষা কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই চেয়ারম্যান প্রীতম মণ্ডল হাসিমুখে সম্ভাষণ জানালেন।

এয়ারকন্ডিশন্‌ড অফিস। ঠান্ডা। সুন্দর করে সাজানো। একজোড়া কম্পিউটার। দু-জোড়া টেলিফোন। রাবার উডের বড়-বড় তিনটে টেবিল। চেয়ার অন্তত গোটা দশেক। চারটে রাবার উডের, ছ'টা প্লাস্টিকের। জানলায় ভেনেশিয়ান ব্লাইন্ড। আর দেওয়ালে মনীষীদের বড়-বড় ফটো—সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো।

পাঁচটা চেয়ারকে সুবিধেমতো এলোমেলো করে সাজিয়ে পাঁচজন ইয়াং ছেলে বসে আছে। কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে চাপা গলায় কথা চালাচালি করছে। ওদের মধ্যে দুজনের মুখ একটু চেনা-চেনা বলে প্রিয়রঞ্জনের মনে হল।

সবচেয়ে বড় মাপের টেবিলটার ওপাশে চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে বসে আছেন প্রীতম। বয়েস পঞ্চাশের এদিক-ওদিক। গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবি আর

পাজামা। তেলতেলে চুল পেতে আঁচড়ানো। চোখে রিমলেস চশমা। গোলগাল ফরসা মুখ। দাড়ি-গোঁফ যত্ন করে কামানো। মুখে পানজাতীয় কিছু একটা হয়তো রয়েছে—কারণ, প্রীতম খুব স্লো মোশনে চোয়াল নাড়ছেন। ওঁর বড়মাপের মোবাইল ফোন সামনেই টেবিলের ওপরে রাখা।

নিজের উলটোদিকের খালি চেয়ারটা ইশারায় দেখিয়ে প্রীতম বললেন, 'বসুন, স্যার—বসুন।' তারপর দেওয়ালে ঝোলানো শৌখিন দেওয়াল-ঘড়ির দিকে চোখ ঠেরে বললেন, 'আপনি তো হেভি পাংচুয়াল...।'

প্রিয়রঞ্জন কী আর বলবেন! ছাতাটা কোলের ওপরে নিয়ে বসলেন। হাতের ফাইলটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। বাতাসে হালকা পারফিউমের গন্ধ পেলেন যেন।

কয়েক সেকেন্ড পর মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে বললেন, 'না, মানে...আপনি বলেছিলেন ছ'টা সাড়ে ছ'টায় আসতে...।'

'গুড, গুড। এটাই তো চাই। পাংচুয়ালিটি হল এমন একটা অ্যাসেট যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু ভীষণ দামি। পাংচুয়ালিটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। স্যার, আপনারা হলেন যাকে বলে মডেল টিচার। আপনাদের দেখেই তো ছাত্র-ছাত্রীরা শিখবে।' প্রীতম সামনে ঝুঁকে এলেন ঃ 'প্রবলেমটার কোনও সলিউশন হল? তা না হলে তো বিল্ডিং-এর কাজটা শুরু করতে আপনার ডিলে হয়ে যাবে—।' বসে থাকা ছেলেগুলোর কোনও একজনকে লক্ষ করে আদেশ ছুড়ে দিলেন ঃ 'অ্যাই, আমাকে আর স্যারকে একটু চা খাওয়া—।'

প্রিয়রঞ্জন হাত নেড়ে আপত্তি করতে চাইলেন, কিন্তু প্রীতম সেদিকে নজর দিলেন না।

'প্রবলেম'টা প্রিয়রঞ্জনকে ক'দিন ধরে কুরে-কুরে খাচ্ছিল। এবং সেটার সমাধানের জন্যই আজ চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

ডি. আই. অফিস থেকে ভালো ফান্ড পাওয়া গেছে। এ ছাড়া বছরের পর বছর ধরে বাড়ি-বাড়ি ধরনা দিয়ে প্রাইভেট ডোনেশন কিছু কম জোগাড় করেননি। স্কুলের লাগোয়া চারকাঠা জমি বহু বছর ধরে পড়ে আছে। সেখানে কিছু ফুলগাছ চাষ করেছেন প্রিয়রঞ্জন—যাতে জমিটা একেবারে ফাঁকা পড়ে না থাকে।

কিন্তু তারপর?

তারপর এই 'প্রবলেম'।

প্ল্যান-ট্যান সব স্যাংশন হয়ে যাওয়ার পর স্কুল কমিটির তত্ত্বাবধানে কনস্ট্রাকশনের টেন্ডার ছাড়তে পেরেছেন। তারপর টেন্ডার ইভ্যালুয়েট করে কলকাতার নামী একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি 'ইন্ডিকন লিমিটেড'-কে সিলেক্ট করেছেন। এ-ব্যাপারে স্কুল কমিটিও ওঁর সঙ্গে আছে। সঙ্গে আছেন স্কুলের মাস্টারমশাইরা, দিদিমণিরা। কিন্তু চেয়ারম্যান বোধহয় সঙ্গে ছিলেন না।

প্রথমে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। গত মাসে কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হওয়ার কথাও ছিল। কিন্তু হঠাৎই...।

প্রিয়রঞ্জন মাজি স্কুলটার কথা ভাবছিলেন।

নবমুকুল প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কুলটা বেশ পুরোনো। একসময়ে ছাত্রের সংখ্যা ষাট কি সত্তর ছিল। তারপর বছরে-বছরে বাড়তে-বাড়তে এখন প্রায় চারশোর কাছাকাছি। স্কুলের সুনামও ছড়িয়ে পড়েছে ধীরে-ধীরে। সবাই বলে, নবমুকুল থেকে পাশ করার পর অন্য কোনও স্কুলে অ্যাডমিশন পাওয়াটা জলের মতো সহজ। কারণ, নবমুকুল খুব পোক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ভিত গড়ে দেয়।

স্কুল-বাড়িটা হলুদ রঙের, দোতলা। একতলা দোতলা মিলিয়ে মোট দশটা ঘর। আটটা ঘরে ক্লাস চলে। আর দুটো ঘরের একটা ঘর হেডস্যারের, আর তার পাশেরটা মাস্টারমশাই আর দিদিমণিদের।

প্রিয়রঞ্জন মাজি নবমুকুল স্কুলের হেডস্যার হয়ে আছেন প্রায় দশ বছর। হেডস্যার হয়ে আসার পর প্রিয়রঞ্জন সংসার নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে গুছিয়ে বসেন এই কাসুন্দিগঞ্জেই। তারপর স্কুলটাকে দাঁড় করানোর জন্য ঘাম ঝরিয়ে দিন-রাত পরিশ্রম করতে থাকেন। তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিলেন স্কুলেরই কয়েকজন মাস্টারমশাই আর দিদিমণি। তাঁদের মধ্যে পরশুরাম আচার্যও ছিলেন।

স্কুলের পড়াশোনার দিকে সবসময় তীক্ষ্ণ নজর রাখেন প্রিয়রঞ্জন। এবং তার পাশাপাশি সারাটা বছর ধরে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। যেমন, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, শিক্ষক দিবস, রাখি উৎসব এইসব। টাকার অভাবে অনুষ্ঠানগুলোয় তেমন জাঁকজমক থাকে না বটে, তবে আন্তরিকতা থাকে, ভালোবাসা থাকে।

এলাকায় কোনও কম্পিউটার শেখার স্কুল নেই। তাই প্রিয়রঞ্জনের খুব

সাধ, স্কুলের নতুন বিল্ডিং-এ ফ্রি কম্পিউটার সেন্টার খুলবেন। এলাকার সব ছাত্র-ছাত্রী সেখানে কম্পিউটার শিখবে। আর শিক্ষকদের মধ্যে থাকবে পরশুরামবাবুর ছেলে চিরব্রত আচার্য।

স্কুলের উন্নয়নের কাজে সেই শুরু থেকেই এলাকার মানুষের কাছে তিনি হাত পেতেছেন। কম্পিউটার সেন্টার খোলার জন্যও দরকার হলে আবার হাত পাতার কাজ শুরু করবেন। স্কুলকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য চেয়ারম্যান প্রীতম মণ্ডলও বেশ কয়েকবার মোটা টাকা স্কুল ফান্ডে ডোনেট করেছেন। স্কুলের অ্যানেক্স বিল্ডিং-এর প্ল্যানও খুব তাড়াতাড়ি স্যাংশন করে দিয়েছেন। কিন্তু তার পিছনে যে আরও কোনও লুকোনো প্ল্যান থাকতে পারে সেটা হেডমাস্টারমশায় কখনও ভাবেননি।

কিন্তু এখন অ্যানেক্স বিল্ডিং তুলতে গিয়ে হয়েছে যত সমস্যা। 'ইন্ডিকন লিমিটেড'-কে কনফার্ম্ড ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার মুখে প্রীতম ব্যাপারটার মধ্যে ইন্টারফিয়ার করেছেন। লোকাল ছেলেদের তৈরি একটি লোকাল কোম্পানি 'লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ'-কে কনস্ট্রাকশনের অর্ডারটা দেওয়ার জন্য প্রেশার দিচ্ছেন।

চা এসে গিয়েছিল। প্রিয়রঞ্জন তাতে কয়েকবার চুমুক দিলেন। স্বাদটা তেতো লাগল। অথচ দেখলেন, প্রীতম মণ্ডল মুখের ভেতরে জাবর কাটা বস্তুটিকে থু-থু করে লিটার বিনে ফেলে দিয়ে সুড়ুৎ-সুড়ুৎ করে কয়েক চুমুক চা শেষ করে ফেললেন। তারপর 'হুম' করে একটা ছোট্ট শব্দ করলেন। বোধহয় কিছু একটা বলার জন্য মনে-মনে তৈরি হলেন।

'দেখুন, স্যার, একটা কথা বলি—' দু-হাতের আঙুল মাথায়-মাথায় জুড়ে প্রীতম সেটা গভীর মনোযোগে লক্ষ করতে-করতে বললেন, '"লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ" লোকাল কোম্পানি। লোকাল চারজন ছেলে খুব স্ট্রাগ্‌ল করে চালায়। আপনি কি চান না, ওদের আর্থসামাজিক অবস্থার কিছুটা অন্তত উন্নতি হোক? পিছিয়ে থাকা মানুষদের সরিয়ে রেখে উন্নয়নের চেষ্টা করলে সেটা কখনও সাকসেসফুল হয়? আপনি তো, স্যার, জানেন—ব্যাকওয়ার্ড মানুষরা সবসময়েই উন্নয়নের একটা মেজর কম্পোনেন্ট। ওদের বাদ দিয়ে ডেভেলাপমেন্ট? ইম্‌পসিব্‌ল!' প্রিয়রঞ্জনের চশমার কাচের দিকে সরাসরি তাকালেন প্রীতম মণ্ডল ঃ 'আপনার মতো জ্ঞানীগুণী মানুষকে আর কী বোঝাব? কী রে, তোরা কী বলিস?' শেষ প্রশ্নটা প্রীতম ছুড়ে দিলেন বসে

থাকা পাঁচজন ছেলের দিকে তাকিয়ে।

ওদের মধ্যে তিনজন মুখে গদগদ হাসি ফুটিয়ে বলে উঠল, 'আপনার ওপরে আমরা আর কী কথা বলব, প্রীতমদা! আপনি আমাদের লোকাল গার্জেন...।'

প্রিয়রঞ্জনবাবু চোয়াল শক্ত করলেন। দুবার ঢোঁক গিলে তারপর খানিকটা ইতস্তত করে বললেন, 'তিনবছর আগে আমাদের কালীতলা চিলড্রেন্স পার্ক রিনোভেশানের কাজটা "লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ"-ই করেছিল। আট মাসের মধ্যে ওই পার্কের ঢেউকুচকুচ, দোলনা, স্লিপ, মেরি-গো-রাউন্ড—সবক'টা জিনিসের কী হাল হয়েছিল সেটা তো আপনি ভালো করেই জানেন! দুটো বাচ্চার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। তার মধ্যে একজনের চোট তো খুব সিরিয়াস ছিল—নেহাত কপালজোরে বেঁচে গেছে।' শব্দ করে একটা লম্বা শ্বাস ফেললেন প্রিয়রঞ্জন। কয়েক সেকেন্ড প্রীতমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'এর পরেও আপনি স্কুলের কনস্ট্রাকশনের কাজটা "লোকনাথ"-কে দিতে বলেন! আমার স্কুলের বাচ্চাগুলোর কথা একবার ভাববেন না? যদি এই চিলড্রেন্স পার্কের মতো কোনও মিসহ্যাপ হয়? তখন আপনি...।'

হেডস্যারকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে প্রীতম বললেন, 'কোনও মিসহ্যাপ হবে না। আপনি পড়েননি, "ফেইলিয়োর্স আর দি পিলারস অফ সাকসেস"? ওসব কিচ্ছু আর হবে না।' হাসলেন চেয়ারম্যান ঃ 'ভুল থেকে "লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ" শিক্ষা নিয়েছে। আপনি কোনও দুশ্চিন্তা করবেন না, হেডমাস্টারমশাই। সব দুশ্চিন্তা আপনি আমার ওপরে ছেড়ে দিন। আপনি টেনশন ফ্রি হয়ে যান...।'

প্রীতমের ফোন বেজে উঠল। সামনে ঝুঁকে পড়ে ইনকামিং কলটা কার সেটা দেখে নিয়েই কলটা কেটে দিলেন। জরুরি মিটিং চলছে। এখন উলটোপালটা কলের ডিস্টার্ব্যান্স চান না।

প্রিয়রঞ্জন মাজি ঘাড় গোঁজ করে বসে ছিলেন। যেসব কথা বলতে মন চাইছে সেসব কথা ভদ্রলোকের ভাষা নয়। ঘরে এ.সি. থাকলেও তিনি অল্প-অল্প ঘামছিলেন।

কী বলা যায় এখন?

লক্ষ করলেন, একা প্রীতম মণ্ডল নয়, পাঁচটা ছেলেও ওঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে। উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।

মোবাইল ফোন বেজে উঠল আবার। তবে প্রীতমের নয়—এই পাঁচজন ছেলের মধ্যে কারও। ফোনটা রিসিভ করে একটা ছেলে চাপা গলায় কথা বলতে লাগল। বোধহয় সিচুয়েশানের আপডেট কাউকে জানাচ্ছে।

আর বসে থাকার কোনও মানে হয় না। ফাইনাল মেসেজ অথবা সলিউশন প্রিয়রঞ্জন পেয়ে গেছেন। প্রীতম মণ্ডলের কথাগুলো শুনে কানদুটো গরম হয়ে উঠেছিল। অনেক উত্তরই জিভের ডগায় এসে ভিড় করেছিল, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

উঠে দাঁড়ালেন। এক-দু-মিনিট সময় নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করলেন। ওঁর স্বপ্ন—স্বপ্নটার তা হলে কী হবে? স্বপ্নগুলোর কী হবে?

আমতা-আমতা করে কোনওরকমে বললেন, 'আমার স্কুলের টিচাররা আছেন। স্কুল কমিটি...আছে। তাদের...একটা ওপিনিয়ান...মানে, মতামত...।'

গলা ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন প্রীতম। হাসতে-হাসতেই মাথা ঝুঁকিয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। যেন অবুঝ পোলাপানের বোকা-বোকা কথা শুনে হেসে ফেলেছেন।

ঘরে হাজির পাঁচটা ছেলেও অল্পবিস্তর ফিকফিক করে হাসছিল। আড়চোখে সেদিকে একবার তাকালেন প্রিয়রঞ্জন। ওদের চোখ মটকানো চাটন হাসি মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে দিল।

হাসি থামিয়ে প্রীতম মুখ তুলে বললেন, 'হেডস্যারমশাই, আপনি কিন্তু আমার কথা মোটেই মনোযোগ দিয়ে শোনেননি। আপনি বড্ড কেমন-কেমন। আমার কথাগুলো আপনি বুঝেও বুঝতে চাইছেন না। আপনি শুধু স্কুলের এই ফাইলটাতে যেখানে যেমন দরকার সই করে দেবেন, বাকিটা আমি সাল্‌টে নেব...।'

টেবিল থেকে ফাইলটা তুলে নিলেন প্রিয়রঞ্জন। প্রীতমের চোখে চোখ রেখে ঠান্ডা গলায় জানতে চাইলেন, 'এটাই তা হলে প্রবলেমটার একমাত্র সলিউশন?'

'এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন দেখছি...।' প্রীতমের চোয়াল এখন একটু তাড়াতাড়ি নড়ছিল।

ঘাড় টেরা ঘোড়ার মতো মাথাটা বেঁকিয়ে সামান্য কাত করলেন প্রিয়রঞ্জন মাজি। বললেন, 'না, বুঝিনি। সেজন্যেই আমার টিচারদের সব কথা জানিয়ে মতামত চাইব। তারপর তো স্কুল কমিটি আছে, এলাকার মানুষজন আছে, এলাকার ছাত্রছাত্রীরা আছে, আমার স্কুলের স্টুডেন্টরা আছে, ওদের অভিভাবকরা

আছেন...।'

পাঁচটা ছেলের মধ্যে দুজন উঠে দাঁড়াল। তাদের একজন বলল, 'স্যার, আপনি এখন বাড়ি ফিরবেন তো?'

একটু অবাক হয়ে প্রিয়রঞ্জন বললেন, 'হ্যাঁ, কেন?'

'সাবধানে যাবেন, স্যার। সামনের শীতলা মাঠের পাশের রাস্তাটা একটু দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা...।'

'সে কী! ওটা তো সরু রাস্তা! খুব বেশি গাড়ি-টারি তো যাতায়াত করে না! তা ছাড়া সেরকম কোনও বোর্ড তো ওই রাস্তায় লাগানো আছে বলে মনে পড়ছে না!'

'আমরা বোর্ডটা লাগাতে যাচ্ছি, স্যার—।' বলে চারটে ছেলে চেয়ারম্যানের অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রীতম ওদের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে একটু গলা তুলে বললেন, 'দেখিস, ব্যানা—একটু হালকার ওপর। বেশি ডিপ যেন না হয়...।'

ব্যানা আর ওর তিন সঙ্গী চলে গেল।

প্রীতম আর ওর ভাগশেষ হয়ে পড়ে থাকা শাগরেদের দিকে পালা করে বারকয়েক তাকিয়ে কোনও কথা না বলে অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রিয়রঞ্জন। দেখলেন, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তাই ছাতা খুলে রাস্তায় পা দিলেন। কিন্তু ওঁর কপালে তখন চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। স্কুলের এক্সটেনশন বিল্ডিং-এর তা হলে কী হবে? কম্পিউটার সেন্টারটার কী হবে?

পরশুরাম আচার্যের কথা মনে পড়ল। সোজা শিরদাঁড়ার মানুষ ছিলেন। এইরকম পরিস্থিতিতে মানুষটা রুখে দাঁড়াত। স্যার আইজ্যাক নিউটনের থার্ড ল' মানুষটার আদর্শ ছিল। কেউ উপকার করলে উপকার ফিরিয়ে দিতেন, আর অপকার করার চেষ্টা করলে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে শায়েস্তা করতেন।

চেয়ারম্যান মানুষটার সঙ্গে এই কনস্ট্রাকশনের প্রবলেম নিয়ে প্রায় দেড়মাস ধরে টানাপোড়েন চলছে। প্রিয়রঞ্জন এই সমস্যা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কারও সঙ্গে কথা বলেননি—শুধু পরশুরামবাবুর ছেলে চিরব্রতকে জানিয়েছেন। জানিয়ে ওকে বলেছেন কথাটা পাঁচকান না করতে। চিরব্রত মানুষ হিসেবে খুব ভালো। তা ছাড়া ও কম্পিউটার সেন্টারটার পার্ট অ্যান্ড পার্সেল। প্রিয়রঞ্জন ওকে খুব বিশ্বাস করেন।

কিন্তু এখন? এখন সামনে পথ কোথায়? আজকের এই মিটিং-এর

ব্যাপারটা কি আচায্যিবাবুকে জানাবেন? যাবেন ওর বাড়িতে?

ঘড়ি দেখলেন। সোয়া সাতটা বাজে। এ-সময়ে চিরব্রতর কোচিং ক্লাস চলে। তিনি গেলে ওর কথা বলতে অসুবিধে হবে।

চিরব্রতর বাবা প্রিয়রঞ্জন মাজির খুব কাছের মানুষ ছিলেন। প্রিয়রঞ্জন বরাবর মানুষটাকে 'আচায্যিবাবু' বলে ডাকতেন। সেই অভ্যাস থেকে চিরব্রতকেও একই নামে ডাকেন। যদিও চিরব্রত ওঁর থেকে প্রায় বিশ বছরের ছোট।

চিরব্রত বহু কাল কলকাতায় ছিল। তাই বলতে গেলে শহুরে মানুষ হয়ে গেছে। অথবা বলা যায় 'হয়ে গিয়েছিল'। এখন পাকাপাকিভাবে কাসুন্দিগঞ্জে ফেরার পর বছর পাঁচেকের মধ্যেই পুরোনো শিকড়গুলো ধীরে-ধীরে ওকে আবার জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু প্রিয়রঞ্জন মাজির সঙ্গে পরিচয়ের শুরু থেকেই চিরব্রত ওঁকে 'মিস্টার মাজি' বলে ডাকে। প্রিয়রঞ্জন অনেকবার বিকল্প সম্বোধনের দু-একটা প্রস্তাব দিলেও চিরব্রত সেসব মানিয়ে নিতে পারেনি।

ছাতার ওপরে বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ হচ্ছে। রাস্তায় লোকজন খুব একটা নেই। কোনও সাইকেল-রিকশাও চোখে পড়ছে না। পরপর চারটে লাইটপোস্ট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনের রাস্তা বলে এত ঘন-ঘন লাইটপোস্টের ব্যবস্থা। অন্যান্য রাস্তায় একটা লাইটপোস্টের কাছে দাঁড়ালে পরের লাইটপোস্টটাকে দূরসম্পর্কের আত্মীয় বলে মনে হয়।

প্রিয়রঞ্জন বাড়ির পথেই হাঁটা দিলেন। কপাল ভালো বলতে হবে যে, বৃষ্টি এখনও জোরে নামেনি। নিজের চটির ছপছপ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছেন ব্যাঙের ডাক। লাইটপোস্টের আলোয় ঝিরঝিরে বৃষ্টির ফোঁটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার পাশের নালার জল চিকচিক করছে। স্কুলের সমস্যা নিয়ে প্রিয়রঞ্জন এতই আনমনা ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল, তিনি যেন অচেনা এলাকার অচেনা পথ ধরে হেঁটে চলেছেন।

হাঁটতে-হাঁটতে কখন যে শীতলা মাঠের কাছে চলে এসেছেন খেয়াল করেননি। বাঁ-দিকে ফাঁকা মাঠ। মাঠের ধার ঘেঁষে কিছু গাছপালা। আর মাঠের খানিকটা ভেতরে বহু বছরের পুরোনো এক বিশাল ঝুপসি বটগাছ। গাছ থেকে মোটা-মোটা ঝুরি নেমে এসেছে। গাছের গোড়ায় সিমেন্টের ছড়ানো চাতাল। তারই মধ্যিখানে গাছের গুঁড়িতে খোঁদল করে মা শীতলার মন্দির। এলাকার লোকজনের বিশ্বাস, এই দেবতা নাকি জাগ্রত।

আকাশ মেঘলা থাকায় সেই মাঠে এখন আবছা ঘোলাটে আলো। মাঠের ওপারের লাইটপোস্টের আলোগুলো যেন কয়েকটা সাদা বিন্দু—তার বেশি কিছু নয়। শোনা যাচ্ছে ব্যাঙের কোরাস। ওদের ডাকের তেজ আর আওয়াজ বলে দিচ্ছে এখানে ওরা দলে অনেক ভারী।

রাস্তাটা সরু এবং নির্জন। প্রিয়রঞ্জনের ভয়-ভয় করছিল। পথের ধারে বসানো ইলেকট্রিকের পোলগুলোর দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন। 'Accident Prone Zone' কিংবা 'দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা' লেখা কোনও সাইনবোর্ডের খোঁজ করছিলেন—যদিও ভালো করেই জানেন, এরকম কোনও সাইনবোর্ড কোনওকালে এখানে ঝোলানো ছিল না। তা ছাড়া এই রাস্তা দিয়ে অল্পবিস্তর গাড়ি চলাচল করলেও সেরকম কোনও অ্যাক্সিডেন্ট কখনও হয়নি। রাস্তায় কোনও ক্রসিংও নেই কাছাকাছি।

তা হলে?

তা হলে, ওই যে ব্যানা না কী নাম—আর ওর দলবল, ওরা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছিল। অথবা প্রিয়রঞ্জনকে ভয় দেখাচ্ছিল।

প্রিয়রঞ্জনবাবুর বেশ টেনশন হচ্ছিল। বাড়িতে স্ত্রীকে একটা ফোন করবেন নাকি? না, না, থাক। ওঁর মিসেস ব্লাড শুগারের পেশেন্ট। টেনশন ওর নিত্যসঙ্গী। স্বামীর ফোন পেলেই হয়তো শীতলা মাঠের দিকে রওনা হবেন। তারপর...তারপর স্কুল ছুটির পর বাচ্চাকাচ্চাদের যেমন তাদের মায়েরা এসে নিয়ে যায়, ব্যাপারটা ঠিক সেইরকম দাঁড়াবে। মনে-মনে লজ্জা পেলেন প্রিয়রঞ্জন। আর ঠিক যখনই দূর থেকে মোটরবাইকের আওয়াজ শুনতে পেলেন।

পিছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারলেন, দুটো কি তিনটে বাইক ওঁর কাছ থেকে বেশ খানিকটা পিছনে এসে থমকে দাঁড়াল। কারণ, ইঞ্জিনের শব্দ হঠাৎই থেমে গেল।

পিছনে তাকালেন না। হাঁটার স্পিড বাড়িয়ে দিলেন। মনে হল, ওঁর বাড়িটা যেন আচমকা অনেকটা দূরে সরে গেছে। কিছুতেই ওটার কাছে পৌঁছোনো যাচ্ছে না।

এতক্ষণ ধরে নাকচ করে রাখা ভয়টা হঠাৎ পিংপং বলের মতো লাফিয়ে উঠল বুকের ভেতরে। পকেটে হাত ঢোকালেন প্রিয়রঞ্জন। মোবাইল ফোনটা আকড়ে ধরলেন। একটা ফোন করবেন নাকি বাড়িতে?

ঠিক তখনই চাপা গলায় মন্ত্র বলার মতো 'কবাডিড, কবাডিড, কবাডিড...।' কথাটা ওঁর কানে এল। আর তারপরই তিনটে ছেলে আচমকা ঠিক ওঁর

পাশটিতে মাথাচাড়া দিল।

ছেলেগুলো প্রিয়রঞ্জনকে ঘিরে দুলকি চালে চক্কর দিতে লাগল আর নীচু গলায় 'কবাড্ডি, কবাড্ডি, কবাড্ডি...।' বলেই চলল। যেন রাতের অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে ওরা এক অদ্ভুত ধরনের কবাডি খেলছে।

ছেলে তিনটের মুখে ভুসোকালির আকিবুকি কাটা। কমান্ডোদের মুখে যেমন থাকে। তাই তাদের একজনকেও চিনতে পারলেন না। শুধু অবাক ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাত-পাগুলো ইচ্ছের অবাধ্য হয়েই থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ওঁকে ঘিরে চক্কর কাটতে-কাটতেই একটা ছেলে প্রিয়রঞ্জন মাজির গালে সপাটে এক থাপ্পড় মারল। তারপর 'কবাড্ডি, কবাড্ডি...।' বলতে-বলতে একই ছন্দে ঘুরপাক খেয়ে চলল—যেন কিছুই হয়নি।

থাপ্পড় খেয়ে শরীরটা দুলে উঠল। তবে টাল খেয়ে পড়ে যেতে-যেতেও শেষ মুহূর্তে সামলে নিলেন। গালটা ভীষণভাবে জ্বলতে লাগল। যেন ছাল-চামড়া তুলে নিয়ে কেউ লঙ্কাবাটা ঘষে দিয়েছে।

ফাইলটাকে বুকের কাছে আরও জোরে আঁকড়ে ধরলেন। কিন্তু ছাতাটা ছিটকে পড়েছে রাস্তায়। দু-পাক গড়িয়ে ওটা চিৎ হয়ে গেল। হ্যান্ডেলটা তেরছাভাবে উঁচিয়ে রইল শূন্যে।

দশ-পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে একটা জোরালো ঘুসি এসে পড়ল ঠোঁটের পাশে।

এবার ছিটকে পড়লেন রাস্তায়। শরীরটা চিৎ হয়ে গেল। বুঝতে পারলেন চশমার একটা কাচ ভেঙে গেছে। ঝাপসাভাবে মেঘলা আকাশ দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন আকাশ থেকে ঝরে পড়া জলের ফোঁটা।

ছেলে তিনটে তখনও ওঁকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে, 'কবাড্ডি, কবাড্ডি...' 'মন্ত্র' পড়ছে। তবে খেয়াল করলেন, এদের একজনের হাতে কোথা থেকে যেন একটা খাটো লোহার রড চলে এসেছে। এবং সেটা সে উঁচিয়ে ধরেছে শূন্যে।

এরপর কী হতে পারে সেটা আন্দাজ করে শরীরটাকে এক-আধপাক গড়িয়ে নিতে চাইলেন। কিন্তু তার আগেই লোহার রডের আঘাতটা কপালের ডানদিকে এসে পড়ল। বিদ্যুৎ-ঝিলিকের মতো একটা তীব্র যন্ত্রণা পলকে সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল। চোখে যেন অনেকগুলো হলদে তারা দেখতে পেলেন। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ঠিক আগে শুনতে পেলেন, ওদের একজন ওঁর শরীরের

ওপরে ঝুঁকে পড়ে হিসহিস করে বলছে, 'সালা, যুধিষ্ঠিরের নাতজামাই! এবার বাড়ি গিয়ে তোর নীতি নিয়ে বড়া ভেজে খা—।'

আর-একজন বলল, 'পালিশটা বেশি ডিপ হয়ে যায়নি তো?'

কে যেন সে-কথার উত্তরে বলল, 'না, না। হালকাই হয়েছে—বেশি ডিপ হয়নি...।'

তারপর প্রিয়রঞ্জনের আর কিছু মনে নেই।

মুখের ওপরে বৃষ্টির জল পড়ছিল, সেইজন্যই হয়তো পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এল। কোনওরকমে উঠে বসলেন। মাথায় অসহ্য ব্যথা। ভয়ে আর যন্ত্রণায় শরীরটা তিরতির করে কাঁপছে।

পকেটে হাত দিয়ে মোবাইল ফোনটা খুঁজে পেতে চাইলেন। বাড়িতে এখন ফোন না করে উপায় নেই। কিন্তু পকেট হাতড়ে ওটা পেলেন না। আরও বুঝলেন, মানিব্যাগটাও নেই। বোধহয় মোবাইল ফোনটাকে খুঁজতে গেছে।

ফাইলটা আঁকড়ে ধরে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। ক'টা বাজে এখন? কতক্ষণ তিনি সেন্সলেস হয়ে ছিলেন?

সময় দেখতে গিয়ে বুঝতে পারলেন, হাতঘড়িটা নেই। নিশ্চয়ই মানিব্যাগটাকে খুঁজতে গেছে।

বিমূঢ় মানুষের মতো এপাশ-ওপাশ তাকালেন। খোলা ছাতাটা খানিকটা দূরে পড়ে আছে। ওটা আর তুলে নিতে ইচ্ছে করল না।

কপালে, গালে হাত দিয়ে রক্তের ছোঁয়া পেলেন। জামায় রক্তের দাগ। বেশ নার্ভাস হয়ে গেলেন প্রিয়রঞ্জন। ওঁর বাড়ি এখান থেকে এখনও অনেকটা দূরে। বরং চিরব্রতর বাড়িটা অনেক কাছে।

এই বিপদে 'আচায্যিবাবু'-র কথাই মনে পড়ল। তাই চিরব্রতর বাড়ির দিকেই ধীরে-ধীরে পা বাড়ালেন। মন আর শরীরের যন্ত্রণাটা ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল।

৪. প্রথম প্রতিবাদ

থানার দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় মেহান চিরব্রতকে জিগ্যেস করল, 'স্যার, ''থানা'' ওয়ার্ডটার এগজ্যাক্ট মিনিং আমাকে বলতে পারো?'

প্রিয়রঞ্জন মাজি অবাক হয়ে মেহানের দিকে তাকালেন। রোবটের মুখে

এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন! তারপর তাকালেন চিরব্রতর দিকে।

চিরব্রত অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসল, তারপর বলল, 'আসলে ওর ভেতরে একটা লার্নিং সিস্টেম আছে। তাই ও একটু প্রশ্নপ্রবণ।'

'"থানা" ওয়ার্ডটার মিনিং বললে না তো, স্যার—।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলছি। "থানা" মানে অনেক কিছু ঃ আস্তানা, ঘাঁটি, ফাঁড়ি, পাহারা দেওয়া, কোতোয়ালি, পুলিশের দপ্তর। হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।' ঘাড় কাত করে জানাল মেহান।

প্রিয়রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে চিরব্রত আর মেহান থানার দিকে হেঁটে চলেছিল। মেহান সঙ্গে থাকলে চিরব্রত কখনও সাইকেল-রিকশায় ওঠার কথা ভাবে না। কারণ, ওর ভর প্রায় দেড়শো কেজি।

সকালবেলার রাস্তা একটু ব্যস্তই বলা যায়। ওরা তিনজনে সরু পিচরাস্তার ধার ঘেঁষে হাঁটছিল। এদিক-ওদিক থেকে সাইকেল, মোটরবাইক আর সাইকেল-রিকশা ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। কদাচিৎ দু-একটা প্রাইভেট কার। গাড়ির লোকজন আর হাঁটাপথের মানুষ—অনেকেই অবাক চোখে মেহানকে দেখছিল। তার প্রধান কারণ, মেহানের অদ্ভুত হাঁটার ধরন।

মেহান অ্যান্ড্রয়েড, কিন্তু চিরব্রতর এই মডেল সেরকম পারফেক্ট নয়। যেমন, মেহানের কখনও ঘাম বেরোয় না, ও হাঁচতে পারে না—কারণ, ওর কখনও হাঁচি পায় না, ও কাশতে পারে না, হাই তোলে না। এরকম আরও ছোটখাটো অনেক ফারাক রয়েছে মানুষের সঙ্গে। তাই ও যে 'মানুষ' হিসেবে একটু পিকিউলিয়ার, সেটা বেশ চোখে পড়ে। ও যদি পারফেক্ট অ্যান্ড্রয়েড হত তা হলে চেহারা আর চলনে মানুষের সঙ্গে ওর কোনও তফাতই থাকত না।

ওরা থানার কাছে এসে পড়েছিল। থানাটা আসলে থানা নয়, ফাঁড়ি। একজন 'মেজোবাবু' এই ফাঁড়ির দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গী একজন এ. এস. আই. আর দুজন কনস্টেবল। এ ছাড়া একজন দারোয়ান, আর একজন পিয়োন।

ফাঁড়ির কোনও সদর গেট নেই। বাউন্ডারি ওয়াল বলতে একটা ফুটচারেক জরাজীর্ণ পাঁচিল। তার বেশ কয়েক জায়গায় ইট খসে গিয়ে উচ্চতা অনেকটা কমে গেছে। পাঁচিলটা এককালে সাদা চুনকাম করা ছিল, এখন ইটের রংটাই বেশি চোখে পড়ে।

বাউন্ডারি ওয়াল পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলে ব্রিক সোলিং করা উঠোন।

ইটের ফাঁকে-ফাঁকে মাটি বসে গেছে। সেখান থেকে ফিনফিনে ঘাস গজিয়ে উঠেছে।

উঠোনের ডানদিকে দুটো কলাগাছ গায়ে-গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সেই গাছজোড়াকে ঘিরে গোটা পাঁচ-সাত শ্যাওলা ধরা টব বসানো। টবে ছোট-বড় কয়েকটা গাছ। তারই একটায় সাদা রঙের কয়েকটা ফুল ফুটে আছে।

উঠোনের বাঁ-দিকে নীল রঙের পলিথিন ঢাকা দেওয়া একটা মোটরবাইক। আর পাশে তার দাঁড়িয়ে রোদে-জলে পোড়খাওয়া একটা সাইকেল।

সামনে দুটো সিঁড়ির ধাপ উঠলেই ফাঁড়ি। গোটাচারেক ঘর নিয়ে ছড়ানো একতলা বাড়ি। বাড়ির চেহারা অনেকটা উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা সাইকেলটার মতোই। সিঁড়ির ধাপ থেকে বারান্দায় ওঠার যে-পথ তার মাথার কাছে লাগানো রয়েছে রং-চটা সাইনবোর্ড ঃ পুলিশ ফাঁড়ি, কাসুন্দিগঞ্জ। এটাকে কখনও কেউ 'ফাঁড়ি' বলে, কখনও বা 'থানা'। অনেকটা ডাকনাম আর ভালো নামের মতোই।

মাথার ওপরে মেঘের আস্তর অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। সেই সুযোগে রোদের কোমল রুমাল বিছিয়ে গেছে চারিদিকে। সকালের এই ঠান্ডা শান্ত নরম চেহারা দেখে ভাবাই যায় না যে, কাল রাতে বৃষ্টির মধ্যে প্রিয়রঞ্জন মাজির সঙ্গে কীরকম নোংরা ঘটনা ঘটেছে।

কাল রাতে সমস্ত ঘটনা শোনার পর চিরব্রত স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে একটু ভয়ও পেয়েছে। কাসুন্দিগঞ্জে এরকম জঘন্য ঘটনা কখনও ঘটেনি। এলাকার স্কুলের হেডমাস্টারমশাইকে এরকম হেনস্থা! তদন্ত করলে হয়তো দেখা যাবে, নবমুকুল স্কুলেরই কোনও বখে যাওয়া পুরোনো ছাত্র ওই গুন্ডাবাজির জোটের মধ্যে রয়েছে। এই চিন্তাটাই হয়তো প্রিয়রঞ্জনের অপমানের জ্বালাটাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছে। কাল রাতে সমস্ত ঘটনা চিরব্রতকে খুলে বলার পর মানুষটা বারবার বিড়বিড় করছিল, 'এত চেষ্টা করেও এলাকার ছেলেমেয়েগুলোকে আমি সুশিক্ষা দিতে পারিনি। শিক্ষায় ফাঁক থেকে গিয়েছিল। সেইজন্যেই বোধহয় শিক্ষকদের আর সম্মান নেই...সম্মান নেই...।'

প্রিয়রঞ্জন বলতে গেলে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। বারবার ভেবেও ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। নবমুকুল স্কুলটাকে গড়ে তুলতে গিয়ে অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক কষ্ট সয়েছেন। কিন্তু মন সবসময় প্রফুল্ল ছিল। চোখের সামনে স্বপ্নগুলো জ্বলজ্বল করত। তাই কোনও কষ্টকেই কষ্ট বলে কখনও মনে হয়নি।

প্রিয়রঞ্জন মাজির নিজের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। কিন্তু তাতে ওঁর কোনও দুঃখ ছিল না। নবমুকুলের ছেলেমেয়েগুলোকেই নিজের ভেবে নিয়েছিলেন। ছোট-ছোট স্বপ্নগুলোকে সত্যি করে তোলার স্বপ্নে কোথা দিয়ে যেন কেটে যেত এক-একটা দিন, এক-একটা রাত।

কিন্তু আজকের ঘটনাটা এই স্বপ্ন-দেখা হেডমাস্টারমশাইকে বড্ড ধাক্কা দিয়েছে। শরীরে যা ব্যথা পেয়েছেন সেটা এর মধ্যেই ভুলে গেছেন, কিন্তু মনের ব্যথাটা বড্ড লেগেছে। কিছুতেই ওটা কমছে না।

সেইজন্যই বোধহয় প্রিয়রঞ্জনের চোখে জল এসে গিয়েছিল। বারবার জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছছিলেন। কিন্তু কেন এই চোখের জল? ব্যথা, অপমান, নাকি স্বপ্ন ভাঙার দুঃখ? ভাঙাচোরা মানুষটা এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছিলেন।

চিরব্রত ওঁর মনের অবস্থাটা হয়তো খানিকটা বুঝতে পারছিল, কিন্তু মেহান ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। ওর শরীরের ভেতরে নানান জটিল প্লাজমন সারকিটে তড়িৎপ্রবাহের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, অথবা থামছিল। ওর ব্রেনের ভেতরে অসংখ্য লজিকের কাটাকুটি চলছিল। কিন্তু ও বুঝে উঠতে পারছিল না, ওর এখন কীভাবে রিয়্যাক্ট করা উচিত।

শেষ পর্যন্ত ও চিরব্রতস্যারের দেখাদেখি প্রিয়রঞ্জনবাবুর পিঠে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল আর বলতে লাগল, 'শান্ত হোন, শান্ত হোন। চলুন, স্যার, বাড়ি চলুন—। বাড়িতে গিয়ে একটু রেস্ট নেবেন...।'

প্রিয়রঞ্জনকে সামলে ওঠার সময় দিল চিরব্রত। তারপর ও আর মেহান ওঁকে নিয়ে পথে বেরোল।

বৃষ্টি-ভেজা পথ এখন নির্জন। আকাশ তার 'জল-পড়া' আপাতত থামিয়েছে। নির্জন রাস্তায় একটাও রিকশা চোখে পড়ছে না।

চিরব্রত হেডমাস্টারমশাইকে জিগ্যেস করল, 'মিস্টার মাজি, এখন ফাঁড়িতে গিয়ে একটা কমপ্লেইন লেখাবেন নাকি?'

'না, না—ওসব কিছু করতে চাই না।' ভয় পাওয়া গলায় বললেন প্রিয়রঞ্জন, 'কার নামেই বা কমপ্লেইন করব! অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পাইনি। তা ছাড়া, বললাম তো—ওদের মুখে কালি মাখানো ছিল...।'

মেহান বলল, 'গেস করে দেখুন তো—কোনও চেনা নাম মনে পড়ছে?'

মেহানের দিকে তাকালেন হেডস্যার। অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন।

বিড়বিড় করে বললেন, 'না, না—কাউকে চিনি না।'

একটা গাড়ি উলটোদিক থেকে হেডলাইট জ্বেলে আসছিল। সেই আলোয় প্রিয়রঞ্জনের চশমা-ছাড়া চোখ দুটো অচেনা লাগছিল। নাকের গোড়ায় চশমার গ্রিপের দাগের ওপরে মানুষটা বারবার আঙুল বোলাচ্ছে। বোধহয় হেনস্থার সময় জোরালো গুঁতোয় ব্যথা পেয়েছে।

চিরব্রত যেটুকু আইনকানুন জানে তাতে ফাঁড়িতে গিয়ে এফ. আই. আর. জাতীয় কিছু করতে গেলে প্রিয়রঞ্জনের সরকারি হাসপাতালে যে ওঁর চিকিৎসা হয়েছে তার একটা কাগজ দরকার।

নাঃ, এসব আইনের জট এত রাতে সামাল দেওয়া মুশকিল। তা ছাড়া হেডস্যার এখনও বেশ আপসেট অবস্থায় রয়েছেন। ওঁর অনেক বারণ সত্ত্বেও চিরব্রত নিজের মোবাইল থেকে ওঁর স্ত্রীকে চোট পাওয়ার খবরটা দিয়েছে। যাতে ভদ্রমহিলা দুশ্চিন্তা না করেন সেইজন্য ব্যাপারস্যাপার বেশ কমিয়ে-টমিয়ে বলেছে। আরও বলেছে, 'চিন্তা করবেন না, আমি আমার সার্ভিস রোবটকে সঙ্গে নিয়ে মিস্টার মাজিকে আর পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

এমন সময় একটা খালি সাইকেল-রিকশা পাওয়া গেল। সেটাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে চিরব্রত আর হেডস্যার উঠে পড়লেন। রিকশা চলতে শুরু করামাত্রই মেহান তার পাশে-পাশে ছুটতে লাগল।

হঠাৎই মেহান বলল, 'স্যার, অন্যায়ের এগেইনস্টে সবসময় প্রোটেস্ট করা উচিত। বইয়ে পড়োনি, ''অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা...।'' '

'মেহান, একটু চুপ করবে!' রিকশা থেকে ছুটন্ত মেশিনকে হালকা ধমক দিল চিরব্রত। রোবটটার সবই ভালো, তবে স্কোপ পেলেই জ্ঞান দিতে চায়।

মেহান তখনকার মতো চুপ করে গেল। কিন্তু হেডস্যারের বাড়ির কাছে এসে রিকশা থামার পর চিরব্রত আর প্রিয়রঞ্জন রিকশা থেকে নেমে দাঁড়ানোমাত্রই ও ওর 'স্যারের' দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন কি আমি কিছু বলতে পারি?'

চিরব্রত বিরক্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হ্যাঁ—পারো।'

প্রিয়রঞ্জনের বাড়ির দরজার দিকে দু-পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেল তিনজনে। শোনা যাক, মেহান কী বলতে চায়।

'স্যার, আইজ্যাক অ্যাসিমভের জিরোথ্ ল' অফ রোবোটিক্সটা তোমার মনে আছে?'

'মনে থাকবে না আবার! তোমার ডায়নামিক প্রপার্টিজের কোর সার্কিটে ওই ফোর্থ ল'টাও—মানে, জিরোথ্ ল'টাও এমবেড করা আছে...।'

হেডস্যার অবাক হয়ে চিরব্রতর মুখের দিকে তাকালেন।

চিরব্রত বলল, 'নাইনটিন ফরটি টু-তে মার্চ মাসে ফেমাস সায়েন্স ফিকশন রাইটার আইজ্যাক অ্যাসিমভ ''রানঅ্যারাউন্ড'' নামে একটা গল্প লিখেছিলেন। সেই গল্পে তিনি প্রথম ''থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স''-এর কথা বলেন। আর একইসঙ্গে তিনি ''রোবোটিক্স'' শব্দটা তৈরি করে ইংরেজি ভাষাকে উপহার দেন।'

'কিন্তু জিরোথ ল'? সেটা কী ব্যাপার?'

প্রিয়রঞ্জনের এই প্রশ্নের উত্তর দিল মেহান।

'''থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স'' আবিষ্কার করার তেতাল্লিশ বছর পর অ্যাসিমভ ''রোবট্স অ্যান্ড এম্পায়ার'' উপন্যাসে জিরোথ্ ল'-এর কথা বলেন। যদিও এই ল'-এর ধারণা নিয়ে অ্যাসিমভ ১৯৫০ সালে ''দ্য এভিটেব্‌ল কনফ্লিক্ট'' গল্পে প্রথম আলোচনা করেন। এটাকে অনেক সময় ফোর্থ ল'-ও বলা হয়। তো সেই শূন্যতম সূত্রটার আসল বয়ানটা হল এইরকম ঃ

> *'''A robot may not harm humanity, or, by inaction, allow humanity to come to harm.''*

'তার মানে, একটা রোবট কিছুতেই, কোনও অবস্থাতেই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মানবজাতির কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

'কীসব উলটোপালটা বকতে শুরু করেছ, মেহান! এখন এসব কথা বলার সময়?'

কিন্তু চিরব্রতর ধমকে মেহান থামল না। বরং গোঁয়ারের মতো বলল, 'উলটোপালটা নয়, স্যার। এখনই এসব কথা বলার সময়। একটা রোবটের জন্য তোমরা জিরোথ্ ল' তৈরি করে দিয়েছ, অথচ মানুষের জন্যে সেরকম কিছু তৈরি করোনি—।'

'মিস্টার মাজি, আপনি প্লিজ বাড়িতে ঢুকুন—গিয়ে রেস্ট নিন। মেহানের

আজেবাজে কথায় কান দেবেন না।' এ-কথা বলে হেডস্যারকে বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে দিল চিরব্রত। মেহানকে বলল, 'চলো, এবার আমাদের ফেরার পালা...।'

'ফিরব, তবে তার আগে হেডস্যারকে আমার লাস্ট কথাটা বলে নিই। মিস্টার মাজি, আমি আমার লজিক দিয়ে '''জিরোথ্ ল' অফ হিউম্যানিটি'' তৈরি করেছি। আপনারা বলছেন একটা রোবট মানবজাতির কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আর আমি বলছি ঃ

'A human being may not harm humanity, or, by inaction, allow humanity to come to harm.'

'আমি আইজ্যাক অ্যাসিমভের জিরোথ্ ল'-এ শুধু একটা ওয়ার্ড চেঞ্জ করেছি—robot-এর বদলে human being। শুধু এটুকু চেঞ্জ করে আমার ''জিরোথ্ ল' অফ হিউম্যানিটি'' তৈরি করেছি। কোনও মানুষ যদি মানবতা কিংবা মানবজাতির ক্ষতি করে তা হলে সেটা অন্যায়। তার এগেইন্স্টে প্রোটেস্ট করা উচিত। আপনার সঙ্গে অন্যায় হয়েছে—তাই আপনার প্রোটেস্ট করা উচিত। কারণ, হিউম্যানিটিকে আপনার প্রোটেক্ট করা উচিত। আপনি যেটা করছেন, হেডস্যার, সেটা হল জিরোথ্ ল'-এর সেকেন্ড পার্টটা। বাই ইনঅ্যাকশন, ইউ আর অ্যালাওইং হিউম্যানিটি টু কাম টু হার্ম। আপনি জানেন না, এইরকম ছোট-ছোট ক্ষতি যোগ হয়ে শেষ পর্যন্ত অনেক বড় মাপের ক্ষতি হয়ে যাবে।'

দুজন শিক্ষক স্তম্ভিত হয়ে নাইন্থ জেনারেশন অ্যান্ড্রয়েডটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

চিরব্রতর মনে হল, এই মেহানকে ও চেনে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রিয়রঞ্জন মাজি ঘোর লাগা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'মেহান, তুমি কি সত্যিই অ্যান্ড্রয়েড?'

মেহান বলল, 'আমি ঠিক জানি না। তাই নিজেকে সবসময় নানান কোয়েশ্চেন করে সেটাই বোঝার চেষ্টা করি। তবে আমার স্যার আমার ভেতরটা সবচেয়ে ভালো জানে...তাই না, স্যার, বলো?'

চিরব্রত কোনও কথা বলল না। ওর মনে হল, সত্যিই কি ও মেহানের

ভেতরটা ভালো জানে?

ও মাথা নেড়ে ইশারা করে মেহানকে বলল, 'চলো, এবার ফেরা যাক...।'

প্রিয়রঞ্জন তখন একটু আনমনাভাবে বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'হিউম্যানিটিকে প্রোটেক্ট করতে হবে। প্রোটেক্ট করতে হলে প্রোটেস্ট করতে হবে...?'

এখন ফাঁড়ির সিঁড়ির ধাপ দুটোয় পা ফেলে ওঠার সময় প্রিয়রঞ্জন মাজির মনে হল, ওঁর কপালের ব্যথাটা একটু যেন কম-কম। এমনকী মনের ব্যথাটাও।

দু-ধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পর নিট সিমেন্টের আস্তর দেওয়া টানা বারান্দা। সেই বারান্দার মেঝেতে গরমে তেতে-পুড়ে যাওয়া ফুটিফাটা চাষজমির মতো ফাটল। কোনও-কোনও জায়গায় ফাটলগুলো মাপে বেশ চওড়া হয়ে গেছে। রিপেয়ার করার চেষ্টায় সেইসব ফাটলের ফাঁকগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে।

বারান্দা আড়াআড়িভাবে পেরিয়ে গেলেই মেজোবাবুর ঘর। ঘরের দরজা হাট করে খোলা থাকলেও সেলুনের মতো একজোড়া সুইংডোর খানিকটা প্রাইভেসি তৈরি করেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনও দারোয়ানকে ওরা দেখতে পেল না।

ওরা তিনজন সুইংডোর ঠেলে ঢোকার আগেই শুনতে পেল, ঘরের ভেতরে কেউ একজন দাপটের সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলছে। কথার স্রোতে ভেসে আসছে নোংরা গালাগালির কুৎসিত আবর্জনা।

সেলুন-দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই বোঝা গেল, কথার স্রোতের মালিক ফাঁড়ির 'মেজোবাবু' দশরথ ঘড়াই।

পুরোনো একটা হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ারে বডিটা এলিয়ে বসে আছেন। ডানহাতে আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে। ছোট্ট ঘরের বাতাসে ধোঁয়া উড়ছে। মাথার ওপরে একটা সিলিং ফ্যান হেঁচকি তুলে ঘুরছে।

দশরথের সামনে বেশ বড়সড় একটা পুরোনো টেবিল। তার ওপরে ছড়ানো কয়েকটা ফাইল, একটা কাচের গ্লাস, একটা চায়ের ভাঁড়, অ্যাশট্রে, পেন, আর কালো রঙের একটা টেলিফোন।

মেজোবাবুর চেহারা বেশ ভারীর দিকে। চোখে চশমা। মাথায় কদমছাঁট চুল। গাল দুটো বলের মতো ফোলা। কোমরের বেল্টের ওপরে একটি ডাগরডোগর ভুঁড়ি। আর গায়ের রং এমন যে, মাথার চুল যদি ভেড়ার লোমের

মতো পাকানো-প্যাঁচানো হত তা হলে ওঁকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিমের প্লেয়ার বলে সবাই ভুল করত।

দশরথ ঘড়াইয়ের কথা-স্রোত যাকে লক্ষ করে, সে একজন রোগাসোগা মানুষ। গায়ে ময়লা স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি। মাথার চুল খাড়া-খাড়া। গলায় কালো কারে বাঁধা একটা মাদুলি ঝুলছে।

দশরথের টেবিলের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই চিরব্রত একটা দুর্গন্ধ পেল। রোগা লোকটি দিনের বেলাতেই নেশা করে বসে আছে। তার পিছনে একজন বেঁটেমতন ভুঁড়িওয়ালা কনস্টেব্‌ল দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়েস পঞ্চাশের খারাপ দিকে। মাথায় বেশ পাকা চুল। ঠোঁটের ওপরে একই রঙের মোটাসোটা একজোড়া গোঁফও রয়েছে।

দুজন মাস্টারমশাইকে একসঙ্গে দেখে দশরথ তাঁর গালিগালাজের ফুলঝুরি সামলে নিয়েছিলেন। তবে ওঁদের সঙ্গে রোবটটাকে দেখে একটু যেন বিরক্তও হলেন। সমস্যাটা কি মানুষ দুজনের, না হতচ্ছাড়া রোবটটার?

দশরথের উলটোদিকে তিনটে হাতলওয়ালা চেয়ার রয়েছে। বয়েসের চাপে চেয়ারগুলোর কাঠের রং এখন দশরথেরই মতো।

হাতের ইশারায় চিরব্রত আর প্রিয়রঞ্জনকে চেয়ারে বসতে বললেন দশরথ। ওরা দুজনে বসল। ওদের দেখাদেখি মেহানও বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু দশরথ ওকে প্রায় ধম্‌কে উঠলেন, 'না, না, তুই না! তুই তো একটা ফার্নিচার! ফার্নিচার আবার ফার্নিচারে বসবে কী!'

মেহান বসার জন্য খালি চেয়ারটার দিকে পা বাড়িয়েছিল, দশরথের ধমকে থমকে গেল। কোনও জবাব না দিয়ে সরে এসে চিরব্রতর চেয়ারের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। প্রিয়রঞ্জন একপলক চিরব্রতর চোখে চোখ মেলালেন।

দশরথ ঘড়াই আবার রোগা চেহারার নেশাখোর লোকটিকে নিয়ে পড়লেন। পুলিশি গলায় ধমকানির কাজ শুরু করলেন।

মিনিটখানেকের কথাবার্তায় বোঝা গেল লোকটির নাম মারুফ। হস্তশিল্পের কাজে বেশ দড়। মানে, সোজা বাংলায় পকেটমার। বড় রাস্তার মোড়ে ৩৩৬ নম্বর বাসে নিজের হাতের কাজ দেখানোর সময় ভিকটিমের সুড়সুড়ি লাগে এবং তারই পরিণামে মারুফ পাবলিকের হাতে ধরা পড়ে।

ওকে বাস থেকে নামিয়ে যখন গণধোলাইয়ের প্রোগ্রাম শুরু হতে যাচ্ছিল তখন ট্র্যাফিক পুলিশ ওর চামড়া বাঁচায় এবং হাফডজন পাবলিকের তদারকিতে

ওকে ফাঁড়িতে নিয়ে এসে জমা দেয়।

দশরথ সিগারেটের টুকরোটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে মারুফের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'ঠিক আছে—যা, ছেড়ে দিলাম। সক্কালবেলা, এই রোগাপ্যাঁটকা বডিতে মাল টেনে বসে আছে!' এবার কনস্টেব্‌লটির দিকে তাকিয়ে ইশারা করে বললেন, 'গোপাল, এটাকে ছেড়ে দে। সকালবেলা মুড ভালো আছে বলে ছেড়ে দিলাম—।'

মারুফ নামের লোকটি হাতজোড় করে বলল, 'স্যার, আমার তেরোশো টাকাটা...।'

'ওটা তোর টাকা নাকি? ও তো পাবলিকের পকেটমারা টাকা!'

'কষ্টের ইনকাম, স্যার। কিছু আপনে রাখেন, আর কিছুটা অন্তত আমারে দেন...।'

'চোপ! ওটা পাবলিকের টাকা। পাবলিককে ফেরত দেওয়া আমাদের ডিউটি—।'

'কিন্তু তাদের খুঁজে পাবেন কেমনে, স্যার?' মারুফ কাতর গলায় টাকা উদ্ধারের শেষ চেষ্টা করল। কিন্তু উত্তরে গোপাল নামের কনস্টেবলটা মারুফকে ঘাড়ে একটা ঝাপ্পড় মেরে বলল, 'শিগগির বেরো! নইলে ভেতরে করে দেব...।'

মারুফ চলে গেল। যেতে-যেতে অসহায় ক্ষোভের নজরে দুবার দশরথ ঘড়াইয়ের দিকে ফিরে তাকাল।

দশরথ এবার গলাখাঁকারি দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। দাঁত বের করে হাসলেন। ওঁকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটোগ্রাফ বলে মনে হল।

'বলুন, স্যার, কী ব্যাপার?' হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন।

দশরথ ঘড়াইয়ের সঙ্গে চিরব্রত বা প্রিয়রঞ্জনবাবুর ভালোই মুখ চেনা আছে। বিভিন্ন লোকাল অনুষ্ঠানে কিংবা নবমুকুল বিদ্যালয়ের কোনও-কোনও প্রোগ্রামে ওঁদের দেখা হয়েছে। তা ছাড়া কাসুন্দিগঞ্জ ছোট জায়গা—এখানে সবাই সবাইকে চেনে।

চিরব্রত হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় বলল, 'বলুন—সব বলুন। কিছু বাদ দেবেন না।'

প্রিয়রঞ্জন বলতে শুরু করলেন। চেয়ারম্যানের অফিসের মিটিং থেকে শুরু করে শীতলা মাঠের কাছে ওঁর হেনস্থার কথা, চিরব্রতর বাড়িতে যাওয়ার কথা, তারপর সাইকেল-রিকশায় বাড়ি ফেরার কথা। সব খুলে বললেন।

'খুবই আনলাকি ব্যাপার—' এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে দশরথ ঘড়াই মন্তব্য করলেন, 'তবে খেলতে-খেলতে কখনও-সখনও দর্শক, মানে, পাবলিকের চোট লেগে যায়। অ্যাক্সিডেন্ট।'

চিরব্রত অবাক হয়ে দশরথের মুখের দিকে তাকাল। অ্যাক্সিডেন্ট!

পাশে তাকিয়ে দেখল, প্রিয়রঞ্জন মাজির মুখের চেহারাও একইরকম। বিস্ময়ে হাঁ করে মেজোবাবুকে দেখছেন।

চিরব্রত কোনওরকমে বলল, 'অ্যাক-সি-ডেন্ট! আপনি সেটা চট করে বুঝে গেলেন কেমন করে! আপনি তো স্পটেও একবার গেলেন না...।'

প্রিয়রঞ্জন মাজি একটু শান্তশিষ্ট মানুষ। দশরথের 'মহান' মন্তব্য শোনার পর নিজের হতবুদ্ধি ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

দশরথ ঘড়াই বেশ কসরৎ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইউনিফর্মে বারকয়েক হাত ঘষে বললেন, 'দেখুন চিরব্রতবাবু, কোনও জিনিস বোঝার মতো হলে আমি চট করে বুঝে যাই। না হলে বুঝি না। আপনাদের মতো বাঘা-বাঘা পণ্ডিত মানুষদের ব্যাপার অবশ্য আলাদা—আপনারা বোঝেন না এমন কিছু নেই।' পেটে হাত বুলিয়ে একটা হাই তুললেন ঃ 'যাকগে ওসব কথা। ওই টেবিলটায় জেনারেল ডায়েরির খাতা রয়েছে। তাতে যা প্রাণ চায় লিখুন। মনের শান্তি করুন। তারপর সে-লেখাটা আমি চেক করে যা কারেকশন করবার করে দেব'খন। দেখবেন, ডায়েরির পাতায় যা-কিছু লিখবেন সব বাংলায় লিখবেন যেন। মাতৃভাষা! মাতৃভাষা হল মাতৃদুগ্ধ—কে একজন বলেছিলেন না!'

চিরব্রত সব বুঝতে পারল। সব বুঝতে পেরেও ও প্রিয়রঞ্জন মাজির হাতের ডানা ধরে দশরথ ঘড়াইয়ের দেখানো টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল।

টেবিলটা মাপে ছোট। দুটো ভাঙা পায়া লোহার পাটিতে পেরেক ঠুকে সামাল দেওয়া হয়েছে। টেবিলের একপাশে একগাদা ফাইলপত্র ডাঁই করে রাখা। এ ছাড়া দুটো কাচের গ্লাস, একটা নীল রঙের বল পয়েন্ট পেন, আর দুটো কালি মাখা স্ট্যাম্প প্যাড টেবিলের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। তারই ফাঁকে জেনারেল ডায়েরির লম্বাটে খাতাটা কোনওরকমে জায়গা করে নিয়েছে।

টেবিলের সামনে দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার ছিল। চিরব্রত আর প্রিয়রঞ্জন তাতে বসলেন। তারপর টেবিলে রাখা নীল পেনটা তুলে নিয়ে হেডস্যার খাতাটা কাছে টেনে নিলেন। কনস্টেব্‌লটা ওঁদের সাহায্য করতে কখন যেন

টেবিলটার কাছে চলে এসেছে।

নতুন ডায়েরি লেখার জন্য ডায়েরি নম্বর আর তারিখ লেখাই ছিল। প্রিয়রঞ্জন সেখানে ডায়েরি লিখতে শুরু করলেন।

মেহান দশরথের টেবিলের কাছে এতক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎই দশরথকে লক্ষ করে চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনি মেজোবাবু কীরকম স্যালারি পান?'

দশরথ ঘড়াই হাঁ করে মেহানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রোবটটার এতবড় আস্পর্ধা!

চিরব্রতও মেহানের দিকে ঘুরে তাকিয়েছিল। ওকে ধমক দিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে, মেহান!'

মেহান এতটুকুও ঘাবড়াল না। সহজ স্বাভাবিকভাবে ধাতব ছোঁওয়া লাগা গলায় বলল, 'জিগ্যেস করছি তার কারণ হল, একটু আগেই দেখলাম, সরকারি মাইনে পাওয়া সত্ত্বেও উনি ওই মারুফ নামের পকেটমার ভদ্রলোকের কাছ থেকেও এক্সট্রা স্যালারি নিলেন...।'

এ-কথা বলামাত্রই দশরথ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে টেবিলের ওপাশ থেকে ঘুরে মেহানের কাছে চলে এলেন। একটা নোংরা খিস্তি দিয়ে মেহানকে মারতে যখন হাত তুলেছেন তখন চিরব্রত হাঁ-হাঁ করে বলে উঠল, 'মেজোবাবু, ওকে মারবেন না! ওকে মারবেন না!'

ফার্স্ট 'ল' অফ রোবোটিক্স মনে পড়ল মেহানের ঃ

'A robot may not injure a human being or, through inaction allow a human being to come to harm.'

এই অবস্থায় ও যে কী করবে, মেহান সেটা ভেবে উঠতে পারছিল না। ও কি দশরথ ঘড়াইকে বাধা দেবে? না কি থাপ্পড়টা সহ্য করে নেবে?

কিন্তু দু-দিকেই তো সমস্যা! ও বাধা দিলে মানুষের কাজের বিরোধিতা করা হয়। দশরথ তাতে আঘাতও পাবেন। সুতরাং, ফার্স্ট ল' ভায়োলেটেড হবে। কিন্তু...।

সবচেয়ে ভালো হয় মেজোবাবু যদি ওকে থাপ্পড়টা না মারেন।

কয়েক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে মেহান এসব চিন্তা করে নিয়েছিল।

তাই চিরব্রতর গায়ে-গায়েই মেহান চিৎকার করে উঠল, 'আমাকে মারবেন না, মেজোবাবু! প্লিজ, আমাকে মারবেন না!'

কিন্তু দশরথ সেসব অনুরোধ শুনলে তো!

মেহানের গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক চড় কষিয়ে দিলেন দশরথ। এবং একশো চৌষট্টি সিক্কা ওজনের আঘাত পেলেন। ওঁর গোটা শরীর ঝনঝন করে উঠল। মনে হল, এই বুঝি হাতের পাঞ্জাটা হাত থেকে খসে পড়ে যাবে।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলেন দশরথ ঘড়াই। চোখে সর্ষে ফুল দেখার সঙ্গে -সঙ্গে উলটে পড়ে গেলেন মেঝেতে। মোটাসোটা বডিটা নুন ছেটানো জোঁকের মতো গুটিয়ে যেতে চাইল। একইসঙ্গে বাচ্চা ছেলের মতো চিৎকার শুরু করে দিলেন, 'ওরে বাবা রে! মরে গেলুম রে! ওরে বাবা রে...!'

চিরব্রত আর গোপাল প্রায় ছুটে এল ধরাশায়ী মেজোবাবুর দিকে।

মেহান চিরব্রতকে বলল, 'স্যার, আমার কোনও দোষ নেই। আমি কিন্তু ফার্স্ট ল' মেনে চলেছি। উনিই আমাকে মারতে গিয়ে চোট পেয়েছেন।'

মেহান ঠিক কথাই বলেছে। অনেকে ভুলে যায় যে, মেহানের শরীরের বাইরেটা পলিমারের হলেও তার আড়ালে রয়েছে টেম্পারড্ স্টিল।

দশরথ ঘড়াইও ব্যাপারটা ভুলে গিয়েছিলেন, ফলে ওঁকে তার দাম দিতে হয়েছে।

চিরব্রত আর গোপাল মিলে দশরথকে কোনওরকমে দাঁড় করাল। দশরথ 'উঃ! আঃ!' আওয়াজ করছিলেন, আর বাঁ-হাত দিয়ে ডানহাতের আহত কবজিটার যত্ন-আত্তি করছিলেন। তারই ফাঁকে-ফাঁকে মেহানকে লক্ষ করে নোংরা শব্দের ফোয়ারা ছোটাচ্ছিলেন।

চিরব্রত চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। গোপালও কাঁচুমাচু মুখে ওর 'স্যার'-কে দেখছিল। কেন যে স্যার বেকার রোবটটাকে চড় মারতে গেলেন!

দশরথ হঠাৎই চিরব্রতর দিকে ফিরে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনার এই রদ্দি রোবটটার লাইসেন্স আছে?'

'হ্যাঁ, আছে। প্রত্যেক বছর তো আপনার কাছ থেকেই রিনিউ করার কাগজ সই করিয়ে নিয়ে যাই...!'

দশরথের সেটা ভালোই মনে আছে। সরকারি নিয়মমাফিক ডোমেস্টিক রোবট বা সার্ভিস রোবট ব্যবহার করতে গেলে লাইসেন্স করাতে হয়। তারপর লোকাল থানা থেকে সেটা এনডর্স করাতে হয়। তা ছাড়া রোবট কেনার খরচ

এমন যে, বেশ পয়সাওয়ালা লোক ছাড়া সে-খরচ যে-সে পোষাতে পারে না। তার ওপরে মেইনটিন্যান্স আর ট্রাব্‌লশুটিং-এর ঝামেলাও আছে। সেইজন্য খুব কম মানুষই রোবট ব্যবহার করতে পারে।

চিরব্রত সেদিক থেকে অনেকটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেছে। 'ইনরোকর'-এর গিফ্‌ট আর ওর নিজের টেকনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স—এই দুটো স্পেশাল ফ্যাক্টর থাকায় ও মেহানকে যেমন সস্তায় পেয়েছে, তেমন সস্তায় মেহানের মেইনটিন্যান্স আর ট্রাব্‌লশুটিং-এর কাজ সারতে পারে।

চিরব্রতর উত্তর শুনে দশরথ ঘড়াই কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর রুক্ষ গলায় চিরব্রতকে বললেন, 'এসব ফালতু রোবট-টোবটকে সঙ্গে করে ফাঁড়িতে আসেন কেন? চলুন, ওকে এক্ষুনি বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে বলুন। উঃ!' ডানহাতের কবজিতে বাঁ-হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, 'মালটার বডির ভেতরে শালা কী মাল ঢোকানো আছে কে জানে!'

মেহান চট করে গলা লম্বা করে জবাব দিল, 'আমি জানি, স্যার। স্টিল—।'

চিরব্রত একটা ধমক দিল মেহানকে। মাঝে-মাঝে রোবটটা বড্ড ফাজলামো করে।

'যাও, বাইরে গিয়ে চুপটি করে দাঁড়াও!'

মেহান ঘরের বাইরে পা বাড়াল।

এমন সময় প্রিয়রঞ্জন বললেন, 'আমার ডায়েরি লেখা হয়ে গেছে।'

দশরথের যেন হঠাৎই মনে পড়ল প্রিয়রঞ্জন মাজির কথা।

'কই দেখি, কী লিখেছেন...।' প্রিয়রঞ্জনের টেবিলের কাছে চলে গেলেন দশরথ। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। ডায়েরি-খাতাটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

চিরব্রত দশরথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ডায়েরির লেখাটা পড়তে চেষ্টা করছিল।

ঠিক এই সময়ে সুইংডোর ঠেলে ঘরে ঢুকলেন এ. এস. আই. যোগেন চন্দ্র আর কনস্টেবল রবিন বিশ্বাস। দুজনেই প্রবল ঘামছে, ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে। যোগেন চন্দ্রর পোড়খাওয়া মুখে অনেক ভাঁজ। ঠোঁট দুটো সিগারেট বা বিড়ি খেয়ে-খেয়ে কালো হয়ে গেছে। আর রবিন বিশ্বাস মানুষটা এতই রোগা যে, গায়ে ইউনিফর্ম না থাকলে ওকে পুলিশের লোক বলে কেউ

বিশ্বাসই করত না।

জানা গেল, সাতসকালেই হুজ্জুতির খবর পেয়ে ওঁরা দুজনে ব্যায়াম সমিতির মাঠে গিয়েছিল। ওখানে রাখাল পোদ্দার নামে এক ভদ্রলোকের জমিতে কারা নাকি একটা ক্লাবঘর তৈরির চেষ্টা করছিল। তাই নিয়ে দু-দলে হাতাহাতি লাঠালাঠি।

দশরথ ঘড়াইকে সংক্ষেপে রিপোর্টটা দিলেন যোগেনবাবু। তারপর ক্যাঁচক্যাঁচ করে ঘুরতে থাকা সিলিং ফ্যানটার নীচে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। মাথা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগলেন।

কনস্টেবল রবিন বিশ্বাস পাশের ঘরে যাওয়ার দরজার কাছে একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ল। ওর মুখের ব্যাজার ভাবটা কয়েক হাজার বছরের পুরোনো বলে মনে হল।

প্রিয়রঞ্জনের লেখাটা পড়তে-পড়তে দশরথ রীতিমতো খেপে গেলেন।

'এসব আবোলতাবোল কী লিখেছেন আপনি? পুরো গল্প-উপন্যাস ফেঁদে বসেছেন!'

'মানে?' অবাক হয়ে বললেন প্রিয়রঞ্জনবাবু। ডায়েরিতে তিনি সব সত্যি কথাই লিখেছেন। তাই মেজোবাবুর উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারছিলেন না।

'চেয়ারম্যান স্যারের বাড়িতে যে মিটিং করতে গিয়েছিলেন, সেসব ফালতু কথা এখানে লিখেছেন কেন? আপনার মেইন আইটেম হল শীতলা মাঠের পাশের রাস্তা—ব্যস! সেখানে অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন ব্যক্তি কবাডি খেলার সময় আপনার গায়ে পড়ে যায়। মানে ধাক্কা-টাক্কা লাগে—ওই টাইপের কিছু...।'

প্রিয়রঞ্জন মাজি পেনটা শূন্যে ধরে হাঁ করে মেজোবাবুর কথা শুনছিলেন। ভাবছিলেন, মানুষটা কীরকম একবগ্গা আর মিথ্যেবাদী। হয়তো এই চাকরিটা করার জন্য এই দুটো জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতা।

দশরথ বিরক্তভাবে ডায়েরি-খাতাটা নিজের কাছে টেনে নিলেন।

হতভম্ব প্রিয়রঞ্জনের অবশ হাত থেকে পেনটা একরকম ছিনিয়ে নিলেন। তারপর ঃ 'দাঁড়ান, আমি সব কেটেকুটে ঠিক করে দিচ্ছি। যত্তসব উটকো লাফড়া!' ডায়েরির লেখার ওপরে ব্যথা-সম্পৃক্ত হাত নিয়ে খুব ধীরে-ধীরে কলম চালাতে লাগলেন। হেডস্যারের পরীক্ষার খাতার ওপরে যেন আরও বড় কোনও মহা হেডস্যার পরীক্ষকের কলম চালাচ্ছেন। তবে ডানহাতে চোট থাকায় মাঝে-মাঝেই 'উঃ! আঃ!' করছিলেন, আর নিজের মনে কীসব

বিড়বিড় করছিলেন।

চিরব্রতর মাথাটা গরম হয়ে গেল। কিন্তু মাথা গরম করে কোনও লাভ নেই, এ-কথা ভেবে ও চুপ করে গেল। মনে-মনে ভাবল, থানায় ডায়েরি করে অন্তত প্রতিবাদটুকু যে করা গেছে সেটা কম নয়। কিন্তু এত কমে হবে না—আরও কিছুটা বেশি চাই। ওর সার্ভিস রোবটটা বলেছিল, 'প্রোটেস্ট অ্যান্ড প্রোটেক্ট।' এই প্রতিবাদে তার সবটুকু হল কই!

দশরথ ঘড়াইয়ের কাজ সারা হয়ে গিয়েছিল।

হেডস্যারের মুখের চেহারা দেখে চিরব্রতর কষ্ট হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এইসব কারণেই বোধহয় মানুষটা থানা-পুলিশ করতে চায়নি।

'চলুন, মিস্টার মাজি। আমরা এবার যাই...।'

ওরা দুজনে সুইংডোরের দিকে এগোল। মেহান কৌতূহলে পাল্লা ফাঁক করে উঁকি মারছিল, চিরব্রতকে এগিয়ে আসতে দেখে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চিরব্রত অধৈর্য ইশারায় ওকে বাইরে যেতে বলল। যদি রোবটটা আবার কোনও ঝামেলা বাধিয়ে বসে!

দশরথের পকেটে মোবাইল ফোন বেজে উঠল। ফোনটা রিসিভ করেই মেজোবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

চেয়ারম্যান স্যার।

'হ্যাঁ, স্যার মিটে গেছে। একটা জেনারেল ডায়েরি লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি, স্যার। আপনার অফিসে মিটিং, ব্যানা, হ্যানাত্যানা কীসব হাবিজাবি লিখেছিল, স্যার। সব কেটেকুটে সাইজ করে দিয়েছি। একে তো সরকারি হসপিটালে ট্রিটমেন্টের কোনও কাগজ নেই, তার ওপর...!'

ওরা তিনজনে ফাঁড়ির বাইরে বেরিয়ে এল।

মেহান চিরব্রতকে জিগ্যেস করল, 'স্যার, একটা কথা বলতে পারি?'

চিরব্রত সন্দেহের চোখে মেহানের দিকে তাকাল। কে জানে, অবাধ্য রোবটটা এখন কী বলবে! কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে চিরব্রত বলল, 'বলো, কী বলবে—।'

'দশরথ ঘড়াই ওঁর স্যালারির আর-একটা পার্ট বোধহয় চেয়ারম্যান স্যারের কাছ থেকে পান...।'

চিরব্রত ভাবল, মেহানটা একটা রোবট। মানুষের তুলনায় হদ্দ বোকা। লজিক ছাড়া কিছু বোঝে না। সেইজন্যই বোধহয় ওর সাহস অনেক বেশি।

৫. প্রথম প্রস্তুতি

মেঘলা আকাশে কখন যেন হামাগুড়ি দিয়ে সন্ধে নেমে গেছে। চিরব্রত মা আর বাবার ফটোর সামনে ধূপকাঠি জ্বেলে ধূপদানিতে বসাচ্ছিল। এমন সময় বাইরের ঘরের দিক থেকে মেহান এসে বলল, 'সাতজন এসে গেছে, আর-একজন মনে হয় আর আসবে না...।'

হ্যাঁ, রাজ আজ আসবে না। ওর জ্বর হয়েছে। ঘণ্টাখানেক আগে চিরব্রতকে ওর মা ফোন করেছিলেন।

ঘরে টিভি চলছিল। খবর দেখতে-দেখতে চিরব্রত উঠে পড়েছিল। দেওয়ালে টাঙানো পরশুরাম আর সন্ধ্যামালতীর ফটোর কাছে গিয়ে রোজকার মতো ধূপ জ্বালাচ্ছিল। হঠাৎই ওর খেয়াল হল, কথা বলতে-বলতে মেহান টিভির বেশ কাছাকাছি চলে গেছে।

'মেহান, জলদি সরে এসো এদিকে। তোমাকে বলেছি না, টিভি চললে তার দেড় মিটারের মধ্যে যাবে না!'

চট করে টিভি থেকে আরও দু-পা দূরে সরে গেল মেহান।

চিরব্রত বাবা-মায়ের ছবিকে নমস্কার করে মেহানের কাছে এল। বলল, 'আজ ওদের ম্যাথ্‌স-এর টেস্ট নেব।' দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা ক্যাবিনেট থেকে টেস্টের কোয়েশ্চেন নিয়ে মেহানকে দিল ঃ 'তুমি ও-ঘরে যাও। ওদের কোয়েশ্চেন পেপার ডিস্ট্রিবিউট করে তারপর আধঘণ্টা সময় দেবে। আর লক্ষ রাখবে, পরীক্ষা চলার সময় কেউ কারও সঙ্গে যেন কথা না বলে। তুমি যাও, আমি ড্রেস চেঞ্জ করে সুধামাসির সঙ্গে কথা বলে আধঘণ্টা পরে যাচ্ছি—।'

মেহান চলে গেল। চিরব্রত বেডরুমে গেল চেঞ্জ করতে।

ছাত্র-ছাত্রীদের কোয়েশ্চেন পেপার বিলি করার পর মেহান ওর 'স্যার'-এর নির্দেশ সবাইকে জানিয়ে দিল। পরীক্ষার সময় তিরিশ মিনিট। পরীক্ষা চলার সময় স্টুডেন্টরা নিজেদের মধ্যে কথা বলবে না।

স্যারের কোচিং-এ টেস্ট নেওয়ার সময় এইসব নিয়মের কথা ওরা বরাবর শুনছে। এবং এগুলো ওরা সবসময় মেনে চলে। ওদের পরীক্ষায় গার্ড

দেওয়ার কাজ করে মেহান। ফলে নিয়মের এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই।

কোয়েশ্চেন পেপার বিলি করার পর মেহান ঘরের নির্দিষ্ট কোণে গিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল।

কোয়েশ্চেন হাতে পেয়েই সোনামণি, মানালি, চয়ন, সদাশিবরা মাথা ঝুঁকিয়ে উত্তর লিখতে শুরু করল।

পাঁচমিনিট পরেই অঙ্কুর নামে একজন ছাত্র মেহানকে জিগ্যেস করল, 'রোবটকাকু, রুট ওভার পাই-এর ভ্যালু কত?'

মেহান লজিক দিয়ে দেখল, ও যদি এই প্রশ্নের উত্তর দেয় তা হলে চিরব্রত স্যারের রুল মোটেই ভায়োলেটেড হচ্ছে না। তাই ও ধীরে-ধীরে বলল, '১.৭৭২৪৫৩৮৫১ আপ টু নাইন প্লেসেস অফ ডেসিমেল।'

'থ্যাংক ইউ—' ভ্যালুটা লেখা শেষ করে বলে উঠল অঙ্কুর। তারপর একমনে পরীক্ষা দিতে লাগল।

একটু পরেই চয়ন জিগ্যেস করল, 'রোবটকাকু, নাইনটিন স্কোয়্যার ইন্টু রুট ওভার সেভেনটিন পয়েন্ট এইট থ্রি কত হয়?'

'১৫২৪.৩৪৩৬০৬ আপ টু সিক্স প্লেসেস অফ ডেসিমেল।'

'থ্যাংক ইউ—।'

ছাত্রগুলো এমনিতে বেশ ভালো। দু-একবার ছাড়া মেহানকে ওরা বিরক্ত করে না। ওদের স্যার এখনও পর্যন্ত মেহানের এই 'দয়ালু' রূপটার কথা জানতে পারেনি।

মেহানকে এরকম ক্যালকুলেটর হিসেবে ওরা যে ব্যবহার করে তার কারণ, ওদের বেশিরভাগই বেশ গরিব—সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর কেনার মতো স্বচ্ছলতা নেই। তা ছাড়া ওদের কারও-কারও একজন দুজন করে ভাই-বোন। ফলে দুজন কিংবা তিনজন পড়ুয়া ছেলেমেয়ের জন্য দুটো বা তিনটে ক্যালকুলেটর কেনা ওদের বাবা-মায়ের কাছে স্বপ্ন। আর কম্পিউটার? সেটা তো ভয়াবহ একটা দুঃস্বপ্ন।

সেইজন্যেই পাড়ার নবমুকুল প্রাইমারি স্কুলে ফ্রি কম্পিউটার সেন্টার খোলা হবে এ-কথা শুনে অনেকদিন আগে থেকেই ওরা উৎসাহিত হয়েছিল। তা ছাড়া এটাও ওরা শুনেছে যে, ওই সেন্টার চালু হলে সেখানে ওদের চিরব্রতস্যার নাকি ট্রেনিং দেবেন। সেটা স্যারকে জিগ্যেস করব-করব করেও

শেষ পর্যন্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে ওরা জিগ্যেস করতে পারেনি।

এর পিছনে একটা বড় কারণ হল, দশদিন আগের রাত্রিবেলার সেই ঘটনাটা। নবমুকুল স্কুলের হেডস্যার একেবারে রক্তাক্ত অবস্থায় এ-বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন। সেদিনের ঘটনার কারণ তখন জানতে না পারলেও পরে ওরা এর তার মুখে সবই শুনেছে। বাড়িতে ওদের মা-বাবারাও ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিল। ওরা এটুকু বুঝেছে, কম্পিউটার সেন্টারের ভবিষ্যৎই এখন প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

চিরব্রত চায়ের কাপ হাতে ঘরে এসে ঢুকল। চায়ে দুবার চুমুক দিয়ে বসে পড়ল ওর জায়গায়। ও এখন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে চুল-টুল আঁচড়ে পরিপাটি হয়ে এসেছে।

ও বসতে না বসতেই পরীক্ষার সময় শেষ হল। ছাত্ররা পরীক্ষার খাতাগুলো হাতে-হাতে জড়ো করে গোছাটা ওর হাতে দিল। ও সেটা চালান করে দিল মেহানের হাতে। মেহান খাতাগুলোর পাতা উলটেপালটে দেখতে লাগল। খাতা দেখার ব্যাপারে ও চিরব্রতকে অনেকসময় হেল্প করে।

পরীক্ষার পর পড়ানো শুরু হবে। আজ চিরব্রত ট্রিগোনোমেট্রির একটা নতুন চ্যাপ্টার ধরবে বলে ঠিক করেছে।

রূপা, চয়ন আর মানালি স্যারের খুব কাছাকাছি বসেছে। চয়ন ওর অঙ্ক বইটা স্যারকে এগিয়ে দিল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'স্যার, একটা কথা জিগ্যেস করব?'

'কী কথা? বল্—।'

'স্যার, নবমুকুল স্কুলের ফ্রি কম্পিউটার সেন্টারটা নাকি আর হবে না! বাড়িতে বাবা বলছিল। কীসব গণ্ডগোল ঝামেলা হয়ে নাকি আটকে গেছে?'

চিরব্রত কী বলবে ভেবে ওঠার আগেই সোনামণি পিছনের সারি থেকে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, স্যার, আমার বাবাও এ-কথা বলছিল। মা-কে বলছিল, আমাদের এলাকায় একটা ভালো জিনিস হতে যাচ্ছিল—আটকে গেল। কেন স্যার?'

চিরব্রত এখন কী জবাব দেবে? সব খুলে বলবে ওদের কাছে?

চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে ওর কপালে ভাঁজ পড়ছিল। ওর বাবা হলে কী করতেন এই অবস্থায়? আকাশের দিকে মাথা তুলে থাকা লোহার রডের মতো মানুষটা?

মেহান পরীক্ষার খাতাগুলো ভেতরের ঘরে রেখে এসে আবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়েছিল নিজের জায়গায়। ও হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি বলব, স্যার?'

অন্য সময় হলে ওর এই পাকাপনায় চিরব্রত ওকে ধমকে উঠত, কিন্তু এখন ওর দিকে তাকাল শুধু—কিছু বলতে পারল না। ও জানে, যদি ছেলেমেয়েগুলোকে সব কথা খুলে বলতে হয় তা হলে মেহান ওর চেয়ে অনেক নিখুঁতভাবে বলবে। কারণ, ওর বাব্‌ল মেমোরি। সেখানে ভুল-ভ্রান্তির কোনও সুযোগ নেই।

ছেলেমেয়েগুলো অনেক কথাই জেনে গেছে। সুতরাং, পুরোটা জানলে ক্ষতি কী? তা ছাড়া কম্পিউটার সেন্টারটা তৈরি হবে ওদের জন্য—তাই নবমুকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক্সটেনশন বিল্ডিং নিয়ে ওদের কনসার্নটাই সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া নবমুকুলের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলোর কনসার্নও কিছু কম নয়। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ তো ছোটবেলা থেকেই শুরু হওয়া উচিত। নানান সময়ে চিরব্রত লক্ষ করেছে, মেহানকে নিয়ে ছোটদের মধ্যে কত কৌতূহল। মেহান কী করে চলা-ফেরা করে, কী করে দেখতে পায়, কীভাবে কথা বলে—এসব নিয়ে ওরা চিরব্রতকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পাগল করে দেয়। চিরব্রত জানে, ওদের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আগামী দিনের কয়েকজন তুখোড় বিজ্ঞানী।

চিরব্রত মেহানকে বলল, 'বলো। ওরা জানুক সবকিছু...।'

মেহান গড়গড় করে সব বলতে শুরু করল। চেয়ারম্যানের বাড়িতে প্রিয়রঞ্জন মাজির মিটিং থেকে শুরু করে ফাঁড়িতে ডায়েরি লেখার ঘটনা পর্যন্ত।

সমস্ত ঘটনা বলার সময় কখনও-কখনও মেহান, 'ব্লিপ-ব্লিপ' শব্দ করছিল। তখন সদাশিব ওকে কথার মাঝে থামিয়ে জিগ্যেস করেছে, 'ওই ''ব্লিপ'' শব্দগুলোর মানে কী, রোবটকাকু?'

'ওগুলো গালাগাল। তাই আমি ''ব্লিপ'' করে যাচ্ছি। তোমাদের ওগুলো শুনে কাজ নেই...।'

চিরব্রত এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভয়ে-ভয়ে ছিল। কিন্তু মেহানের 'বিবেচনা' দেখে ও আশ্বস্ত হল।

সব কথা শোনার পর ওদের কয়েকজন একসঙ্গে চিরব্রতকে জিগ্যেস করল, 'এখন তা হলে কী হবে, স্যার?'

সত্যিই তো! কী হবে এখন?

থানায় ডায়েরি করার পর প্রিয়রঞ্জনবাবু আরও দুবার চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেছেন, কথা বলেছেন—কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। প্রীতম মণ্ডল সেই 'লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ' ধরে বসে আছেন।

প্রিয়রঞ্জন মাজি বেশ ভেঙে পড়েছেন। চিরব্রতর সঙ্গে কয়েকবার দেখা করতে এসেছেন, আলোচনা করেছেন, কিন্তু সমস্যা সমাধানের কোনও দিশা পাওয়া যায়নি। চিরব্রতও দুবার হেডস্যারের বাড়িতে গেছে, কথাবার্তা বলেছে, কিন্তু অন্ধকার অন্ধকারই রয়ে গেছে।

হেডস্যার নবমুকুলের টিচারদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। তাঁরা নানান পরামর্শ দিয়েছেন। কেউ-কেউ বলেছেন, 'লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ'-কে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিন। আবার কেউ বলেছেন, মাসকয়েক অপেক্ষা করে দেখুন কী হয়—কোনদিকে জল গড়ায়। তিনজন বলেছেন, চেয়ারম্যানের কাছে গিয়ে একটু ধরা-করা করে দেখুন, হয়ে যাবে।

কিন্তু কোনও পরামর্শই হেডস্যারের মনে ধরেনি। ওঁর মনে হচ্ছিল, কোথায় যেন অন্যায়ের সঙ্গে আপসরফার একটা গন্ধ থেকে যাচ্ছে। তাই বারবার চিরব্রতর কাছে ছুটে এসেছেন। পরশুরাম আচার্যর ছেলের কাছে সমাধান-সূত্র চেয়েছেন।

চিরব্রত চুপ করে আছে দেখে মেহান বলল, 'আমাদের প্রোটেস্ট করতে হবে। প্রোটেক্ট করতে হবে...।'

মানালি জিগ্যেস করল, 'কী প্রোটেক্ট করতে হবে?'

মেহান বলল, 'হিউম্যানিটি—হিউম্যানিটিকে প্রোটেক্ট করতে হবে।'

চিরব্রত মেহানের দিকে একবার তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। মেহান ছেলেমেয়েগুলোকে যা জ্ঞান দিতে চায় দিক। চিরব্রতর কিচ্ছু ভালো লাগছে না। সমাধান খুঁজে-খুঁজে ওর নিজেকে কীরকম যেন বিধ্বস্ত লাগছে।

মেহান তখন চয়ন, সোনামণি, সদাশিবদের বলছে, 'দ্যাখো, আমাদের রোবটদের অ্যাক্টিভিটির মধ্যে কতকগুলো মিনিমাম নিয়মকানুন আছে। কিন্তু আই অ্যাম সরি টু সে, মানুষের মধ্যে সেরকম নিয়মকানুনের কোনও বালাই দেখি না। মাঝে-মাঝে মনে হয়, স্যারকে বলি, আমাদের ''ল'জ অফ রোবোটিক্স''-গুলো তুমি অকেজো করে দাও। তারপর দেখি, কী হয়। কিন্তু না, সবার লাইফেই মিনিমাম কতকগুলো রুল্‌স থাকা দরকার...।'

সদাশিব জিগ্যেস করল, '''ল'জ অফ রোবোটিক্স''-গুলো কী, রোবটকাকু?'

মেহান গড়গড় করে ল'গুলো বলে গেল। প্রথমে 'জিরোথ্ ল' অফ রোবোটিক্স', তারপর 'থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স।'

ল'গুলো বলা শেষ হলে মেহান আলতো করে হাসল—অনেকটা যেন দুঃখ-দুঃখ হাসি। তারপর বলল, 'মানুষ যেমন ''থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স'' তৈরি করেছে, তেমনি আমিও তৈরি করেছি ''থ্রি ল'জ অফ হিউম্যানিটি''। ''জিরোথ্ ল' অফ হিউম্যানিটি'' আমি আগেই তৈরি করে স্যারকে শুনিয়েছি। স্যারের থেকে তোমরা জেনে নিয়ো—' চায়ের কাপ শেষ-করে-বসে-থাকা চিরব্রতর দিকে দেখল মেহান ঃ 'এবারে ''মানবতার তিনটে সূত্র'' শোনো ঃ

> *'A human being may not injure another human being or, through inaction, allow another human being to come to harm.*

'এর মানে হল, ''কোনও মানুষ কোনও মানুষের ক্ষতি করবে না, অথবা নিষ্ক্রিয় থেকে কোনও মানুষের ক্ষতি হতে দেবে না।'' এখানে আমি ''robot'' শব্দটার বদলে শুধু ''human being'' বসিয়েছি।

'ঠিক একইভাবে বাকি দুটো সূত্র আমি তৈরি করেছি ঃ ''একজন মানুষ সবসময় অন্য মানুষের নির্দেশ পালন করবে, যদি না সেই আদেশ প্রথম সূত্রের বিরোধিতা করে।''

'আর লাস্টের সূত্রটা হল ঃ ''একজন মানুষ সবসময় আত্মরক্ষা করবে, যদি না সেই আত্মরক্ষার চেষ্টা প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্রের বিরোধিতা করে।''

'এই সূত্রগুলো মেনে চললেই তোমাদের পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হয়ে যেত, তাই না, স্যার?'

চিরব্রত ভীষণ অবাক হয়ে গেল। এই লজিক-সর্বস্ব রোবটটা এত ভেবেছে!

চয়ন, সদাশিব, সোনামণিরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'দারুণ! দারুণ!'

চিরব্রত কিছুটা যেন লজ্জা পেল। ও এত বছর ধরে রোবট নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে, থ্রি ল'জ অফ রোবোটিক্স নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে, অথচ থ্রি ল'জ অফ হিউম্যানিটি-র কথা ওর কখনও মাথায় আসেনি। সত্যি, সবাই যদি এই কথাগুলো ভাবত, তা হলে জীবনটা অনেক সুন্দর হতে পারত!

'স্যার, আর-একটা কথা বলব?'

চিরব্রত মেহানের দিকে তাকাল শুধু। কোনও কথা বলল না। রোবটটা আজ যা বলতে চায় বলুক! আজ বোধহয় ওর কথা বলার দিন।

চিরব্রতর মনে হচ্ছিল, ও যেন মেহানের 'চিন্তা'-র কাছে হেরে যাচ্ছে।

'কী, রোবটকাকু, কী বলবে তুমি?' ছেলেমেয়েগুলো জিগ্যেস করল।

'আমার মনে হয়, তোমরা সবাই যদি দল বেঁধে চেয়ারম্যান স্যারের কাছে গিয়ে রিকোয়েস্ট করো তা হলে তিনি হয়তো স্কুলের এক্সটেনশন বিল্ডিংটা তোলার পারমিশন দেবেন। কী বলো, স্যার?' চিরব্রতর দিকে তাকিয়ে শেষের প্রশ্নটা করল মেহান।

চিরব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কী জানি!'

কিন্তু মেহান দমে যাওয়ার পাত্র নয়।' ও ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করে বলল, 'দ্যাখো, কম্পিউটার সেন্টারটা তোমাদের জন্যে। নবমুকুলের স্টুডেন্টরা আর তোমরা এর ইউজার, নবমুকুলের হেডস্যার বা আমার ''স্যার'' নয়। তা ছাড়া চেয়ারম্যান প্রীতমবাবুও ওই সেন্টারে, ফ্রি-তে হোক বা পয়সা দিয়ে হোক, কম্পিউটার শিখতে আসবে না। সুতরাং, যে-জিনিসটা তোমাদের জন্যে সেটা নিয়ে লাথালাথি লাঠালাঠি করছে অন্যসব বুড়ো খোকার দল! তাই আমার মনে হয়, তোমরা চেয়ারম্যান স্যারের কাছে রিট্‌ন অ্যাপিল করো। যাকে বলে লিখিত আবেদন...।'

হঠাৎই চিরব্রতর যেন চটকা ভাঙল। মেহানের শেষ কথাগুলো ওকে ভাবিয়ে তুলল। কথায়-কথায় জ্ঞান-দেওয়া রোবটটা তো খুব একটা খারাপ বলেনি! রিট্‌ন অ্যাপিল। লিখিত আবেদন।

চিরব্রত লিখিত আবেদনের কথাই ভাবল, তবে একটু অন্যরকম স্টাইলে। নাঃ, ব্যাপারটা নিয়ে মিস্টার মাজির সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার, একটু আলোচনা করা দরকার।

চিরব্রত নিজের ভাবনায় বুঁদ হয়ে রইল। ওর মনে হল, মেহান ওকে অজান্তেই পথের ইশারা জানিয়ে দিয়েছে।

মেহান তখনও একই ইস্যু নিয়ে সাতজন ছাত্রের সামনে ধানাইপানাই করে চলেছে।

শেষে ও বলল, 'তোমরা সবাই যার-যার বাড়িতে এইসব কথা জানাও।

জানাও "ফোর ল'জ অফ হিউম্যানিটি"-র কথা। ফ্রি কম্পিউটার সেন্টারের ওপরে হক একমাত্র তোমাদের—মানে, স্টুডেন্ট্‌দের—আর কারও নয়। কাসুন্দিগঞ্জে তোমাদের যত বন্ধুবান্ধব আছে, সব্বাইকে ব্যাপারটা জানাও। মানবতার চারটে সূত্রের কথাও জানাও। এক-একজন তিনজন করে বন্ধুকে জানাও। তারপর সেই তিনজনকে রিকোয়েস্ট করো, তারা যেন প্রত্যেকে আবার তিনজন করে বন্ধুকে জানায়। তা হলেই দেখতে-দেখতে গোটা এলাকায় সব্বাই ব্যাপারটা জেনে যাবে।' এইবার 'স্যার'-এর দিকে এক পা এগিয়ে এল মেহান। 'স্যার'-কে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার, ওই চারটে ল'জ অফ হিউম্যানিটি নিয়ে তুমিও ভাবো। তুমি তো শিক্ষক! তাই তোমারও একটা দায় আছে। তোমার কাছে ছাত্রদের অন্য আর-একটা যে ব্যাচ পড়তে আসে, তাদের আমি কাল এসব কথা জানাব। তুমি যেন আবার আমাকে বারণ কোরো না! তুমি তো সবসময় আমাকে জ্ঞান দিতেই দ্যাখো! আমার "ফোর ল'জ অফ হিউম্যানিটি" কি খারাপ, তুমিই বলো?'

চিরব্রত চট করে উঠে পড়ল। মেহানের কাছে গিয়ে ওকে জাপটে ধরে ওর গালে শব্দ করে একটা চুমু খেল।

'এ কী করছ, স্যার! এ কী করছ! তুমি না সেদিন বললে, চুমু খাওয়া খারাপ!'

মেহানের কথায় হেসে ফেলল চিরব্রত। বলল, 'খারাপ কি না সেটা ডিপেন্ড করছে কে কাকে চুমু খাচ্ছে তার ওপর...।'

স্যারের কথা শুনে সাতজন ছাত্র মুখ টিপে হেসে উঠল।

৬. দ্বিতীয় প্রতিবাদ

টিফিনের ঘণ্টা পড়ল। তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ছেলেমেয়ের দল হুল্লোড় করে চলে এল স্কুলের বাঁধানো চাতালে। চাতালটা ফুট দেড়েক নীচু। চাতালের সীমানা ঘেঁষে ছোট সরু রোয়াক। সেখানে বসে বাচ্চাগুলো যার-যার টিফিন বক্স খুলে টিফিন খায়, আর নিজেদের মধ্যে বকমবকম করে। হেডস্যার প্রিয়রঞ্জন মাজি ঘরে বসে পশ্চিমের জানলা দিয়ে ওদের চঞ্চলতা দেখেন। এ-দৃশ্য দেখতে ওঁর ভীষণ ভালো লাগে। কারণ, ওঁর বুকের ভেতরে কয়েকটা

ফাঁকা জায়গা তখন ভরাট হয়ে যায়।

হেডস্যারের ঘরের উত্তরের জানলা দিয়ে আর-একটা প্রিয় দৃশ্য দেখা যায়—স্কুলের লাগোয়া চার কাঠা জমি। এই জমিতেই তৈরি হবে এক্সটেনশন বিল্ডিং—যেখানে তৈরি হবে ফ্রি কম্পিউটার সেন্টার।

ফাঁকা জমিটার দিকে চেয়ে রইলেন প্রিয়রঞ্জন। এখন গ্রিলের পার্টিশন দিয়ে স্কুল আর জমিকে আলাদা করা আছে। তবে যাতায়াতের জন্য রয়েছে গ্রিলের গেট। এক্সটেনশন বিল্ডিং তৈরি হয়ে গেলে এই পার্টিশন খুলে নেওয়া হবে। তারপর তা থেকেই তৈরি করা হবে বিল্ডিং-এর বেশ কয়েকটা জানলার গ্রিল। 'ইন্ডিকন লিমিটেড'-এর সঙ্গে এ-ব্যাপারে কথা হয়ে আছে। কিন্তু সবটাই যে এখন আটকে আছে!

চার কাঠা জমিটাকে খালি রাখেননি প্রিয়রঞ্জন। অনেক ফুলগাছ লাগিয়ে দিয়েছেন সেখানে। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে গাছগুলো বেশ বড়সড় হয়ে গেছে। নানান রঙের ফুলও হয়েছে অনেক। স্কুলের দারোয়ান নুরুল ওই ফুলগাছগুলোর দেখভাল করে। তার জন্য ওকে মাসে চারশো টাকা 'বকশিশ' দেওয়া হয়। এ ছাড়া সপ্তাহে একদিন করে ছাত্রদের 'গাছ লাগাও, গাছ বাঁচাও' কর্মসূচিতে শামিল করা হয়। তখন ওদের সঙ্গে দুজন টিচার থাকেন, আর প্রিয়রঞ্জন নিজে থাকেন। নুরুলকেও সঙ্গে রাখেন, কারণ, গাছের ব্যাপারটা ও বোঝে ভালো। খুদে-খুদে ছাত্ররা ওই জমিতে নতুন-নতুন গাছ লাগায়। ছুটোছুটি করে। সেই দৃশ্যটা প্রিয়রঞ্জন মাজি দু-চোখ ভরে দেখেন। রঙিন ফুলের মাঝে রঙিন ফুলেরা ছুটোছুটি করছে। তখন আবার বুকের ভেতরে কয়েকটা ফাঁকা জায়গা ভরে যায়।

বাড়ি থেকে নিয়ে আসা রুটি-তরকারি খেতে শুরু করলেন। ক'দিন ধরে পেটটা ঠিক ধাতস্থ নেই। তা ছাড়া কোমরের ব্যথাটাও আবার বেড়েছে। কিন্তু উত্তরের জানলা দিয়ে ওই ফুলগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে সেসব বেশ ভুলে থাকা যায়।

একটু আনমনা ছিলেন। তাই চিরব্রত কখন যে দরজার কাছে এসে পাল্লায় টোকা দিয়েছে সেটা খেয়াল করেননি। কিন্তু খেয়াল করতেই টিফিন খাওয়া থামিয়ে ওকে ইশারা করে ভেতরে আসতে বললেন।

'আসুন, আসুন, আচায্যিবাবু। বসুন—।'

চিরব্রত বসল। ঘরটা মাপে বেশ ছোট। এর আগে ও বারকয়েক

এ-ঘরে এসেছে। ঘরটা ছোট হলেও কোথায় যেন একটা আন্তরিকতার গন্ধ রয়েছে—অনেকটা পুঁচকে আতরের শিশির মতো।

'একটা ব্যাপার আলোচনা করতে এলাম। তবে আপনি আগে টিফিন সেরে নিন—।'

'দাঁড়ান, আগে চায়ের কথা বলি...।'

নিজের চেয়ার ছেড়ে দরজার কাছে চলে গেলেন প্রিয়রঞ্জন। 'গুলাবি! গুলাবি!' বলে ডাক পাড়লেন।

পিয়োন গুলাবিরাম আশেপাশেই কোথাও ছিল, হেডস্যারের ডাক শুনে ছুটে এল। রোগা পাতলা চেহারা। মাথার চুল তেলচপচপে।

'দুটো চায়ের ব্যবস্থা কর। গেস্ট এসেছেন—।'

গুলাবিরাম ছুটল চায়ের আয়োজন করতে।

রুটির শেষ টুকরোটা দিয়ে টিফিন বক্সের গায়ে লেগে থাকা তরকারির অবশেষটুকু মুছে নিয়ে টুকরোটা মুখে পুরে দিলেন প্রিয়রঞ্জন। দ্রুত মুখ নেড়ে টেবিলে রাখা জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালেন। কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে বললেন, 'বলুন—।' গ্লাসটা রেখে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। খালি টিফিন বক্সটা টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখলেন।

টিফিন ব্রেক শেষ হওয়ার ঘণ্টা পড়ল। ছাত্র-ছাত্রীরা হুড়মুড় করে যার-যার ক্লাসরুমের দিকে ছুটল।

চিরব্রতকে আঙুলের ইশারা করে প্রিয়রঞ্জন মাজি বললেন, 'এক মিনিট—।' তারপর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে চাতালের কিনারায় গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। চোখের পলকে প্রিয়রঞ্জনবাবু হেডস্যারে পালটে গেলেন। ছুটে চলা ছেলেমেয়েগুলো মুহূর্তে গতি কমিয়ে দিল। প্যারেড করার ঢঙে লাইন দিয়ে শান্তভাবে হেঁটে বারান্দা ধরে এগোতে লাগল। বারান্দার গা বরাবর দাঁড়িয়ে থাকা ওদের ক্লাসরুমগুলোয় ঢুকে পড়তে লাগল।

একটু পরেই প্রিয়রঞ্জনবাবু ঘরে ফিরে এলেন। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে মাথার ওপরে ঘুরন্ত সিলিং ফ্যানটার দিকে একবার তাকালেন। তারপর চিরব্রতর দিকে নজর নামিয়ে হেসে বললেন, 'ছেলেমেয়েগুলো বড্ড দুরন্ত। টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়লে এমন হুড়োহুড়ি করে ক্লাসঘরের দিকে দৌড়োয়—যে-কোনও সময় একটা বাজে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে...। বলুন, আপনি কী বলছিলেন।'

চিরব্রত সামান্য মাথা নাড়ল। কয়েক সেকেন্ড টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'চেয়ারম্যান প্রীতম মণ্ডলের কাছে আর-একবার অ্যাপিল করলে হয় না?'

প্রিয়রঞ্জন মাজি হতাশভাবে একটা লম্বা শ্বাস ফেললেন ঃ 'কোনও লাভ নেই, আচায্যিবাবু। আমি আরও দুবার চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেছি। অনেক করে বুঝিয়ে বলেছি—কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। উনি সেই একই গোঁ ধরে রয়েছেন। আর সতেরো দিন পর টিচার্স ডে। ভেবেছিলাম, সেদিন তো স্কুলে প্রতি বছর একটা ছোট অনুষ্ঠান করি—তো সেই অনুষ্ঠানের দিনই ভিতপুজো করব। চেয়ারম্যান স্যারকে সেই অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন করব। ওঁর হাত দিয়েই একটা-দুটো ইট সিমেন্ট দিয়ে গাঁথিয়ে নেব। কত সুন্দর হত বলুন তো ব্যাপারটা?'

সত্যিই সুন্দর হত। চিরব্রত মনে-মনে ভাবল। দেখছিল, কথাগুলো বলতে-বলতে হেডস্যারের মুখে-চোখে কেমন এক উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটে উঠেছে। মানুষটার স্বপ্নগুলো বোধহয় সেই মুহূর্তে ডানা মেলে দিয়েছিল। কিন্তু তার পরের মুহূর্তেই ওরা ডানা ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ল। কারণ, প্রিয়রঞ্জন মাজির মুখে কালো একটা পরদা নেমে এল।

'না, মিস্টার মাজি। আমি একটু অন্যরকম অ্যাপিলের কথা ভেবেছিলাম।' চিরব্রত বিড়বিড় করে বলল।

'কীরকম অ্যাপিল?' গ্লাসে তখনও বেশ খানিকটা জল ছিল। সেটুকু একচুমুকে শেষ করে দিলেন।

চিরব্রত বলতে শুরু করল। বলল যে, মেহানের উলটোপালটা কথাবার্তা থেকেই আইডিয়াটা ওর মাথায় এসেছে। ওর কোচিং-এর ছাত্রদের মেহান বলেছে, কম্পিউটার সেন্টারের সমস্যাটার কথা এলাকায় প্রচার করতে। আরও বলেছে 'ফোর ল'জ অফ হিউম্যানিটি'-র কথা। বলেছে, এই সূত্রগুলোও প্রচার করতে হবে। এক-একজন তিনজন করে বন্ধুকে জানাবে। তারা এক-একজন আবার নতুন তিনজনকে ব্যাপারটা জানাবে। জি. পি. সিরিজের মতো। তা হলেই ব্যস! তিনদিনের মধ্যে গোটা এলাকার মানুষ সব জেনে যাবে। সেইসঙ্গে চেয়ারম্যান স্যারের কাছে রিট্‌ন অ্যাপিলও করতে হবে।

শেষ কথাটা শোনার পর বিষণ্ণ হাসলেন হেডস্যার। মাথা নেড়ে বললেন, 'রিট্‌ন অ্যাপিল করে কোনও লাভ নেই, আচায্যিবাবু...।'

'না, মিস্টার মাজি, আমি একটু অন্যরকম স্টাইলে অ্যাপিল করার কথা ভাবছিলাম...। এর জন্যে আমাকে আর আপনাকে কিছু টাকা খরচ করতে হবে—।'

'তার মানে?'

চিরব্রত ব্যাপারটা হেডস্যারকে বুঝিয়ে বলতে লাগল।

সেদিন ভোরবেলা থেকেই আকাশ নীল, আর সূর্য একেবার সূর্যের মতন। আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হল মাঠে-ঘাটে বোধহয় কাশফুল ফুটে গেছে। পুজোর আর দেরি নেই।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেশ টগবগে ফুর্তির মেজাজে অফিসে নেমে এলেন চেয়ারম্যান প্রীতম মণ্ডল। গায়ে পাঞ্জাবি আর পাজামা। ওঁর বাড়ির দিক থেকে অফিসে আসা-যাওয়ার জন্য একটা আলাদা দরজা রয়েছে। সেই দরজা দিয়েই অফিস-ঘরে ঢুকলেন।

অফিসটা বেশ সাজানো-গোছানো টিপটপ। এসি চলছে। ব্যানা আর তার দুজন শাগরেদ চেয়ারে বসে 'দাদা'-র অফিসে আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করছিল। এ ছাড়া একজন বৃদ্ধ আর একজন গৃহবধূ একটু দূরে দুটো চেয়ারে বসেছিল। কী এক সমস্যা নিয়ে ওরা চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

'দাদা, চা নিয়ে আসছি—' বলে ব্যানা কাচের দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দু-হাতে দু-তাড়া পোস্টকার্ড আর ইনল্যান্ড লেটার নিয়ে ইউনিফর্ম পরা একজন সিকিওরিটি গার্ড অফিসের দরজা দিয়ে ঢুকল।

'কী ব্যাপার, প্রণবেশ? এত চিঠি কীসের?'

প্রণবেশ প্রীতম মণ্ডলের বাড়ির সিকিওরিটি গার্ড। অল্প বয়েস, কিন্তু খুব বিশ্বাসী।

'কীসের চিঠি জানি না, স্যার, তবে এতগুলো এসেছে—।'

প্রীতমের টেবিলে দু-তাড়া চিঠি নামিয়ে রেখে প্রণবেশ চলে গেল।

ভুরু কুঁচকে গেল চেয়ারম্যানের। ওঁর কাছে রোজ চিঠি আসে বটে, তবে তার সংখ্যা খুবই কম। বড় জোর চারটে কি পাঁচটা। কিন্তু আজ? আজকের

দিনটা বোধহয় একটু অন্যরকম হতে চলেছে।

ছড়ানো চিঠির তাড়া ঘাঁটতে শুরু করলেন। সবই পোস্টকার্ড আর ইনল্যান্ড লেটার।

একটা পোস্টকার্ড নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। চেয়ারম্যানকে গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা দু-তিন লাইনের চিঠি ঃ

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার,

আমি কম্পিউটার শিখতে চাই। কম্পিউটার আমার ভালো লাগে। ফ্রি কম্পিউটার সেন্টারটা তাড়াতাড়ি করিয়ে দিন না। প্লিজ। আপনি আমার আর আমার বন্ধুদের ভালোবাসা পাবেন। নমস্কার।

গোবিন্দ (ক্লাস ফোর)

নবমুকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়

চিঠিটায় তিনটে বানান ভুল রয়েছে। এমন মোটা দাগের ভুল যে, চেয়ারম্যানও সেটা ধরতে পারলেন।

চিঠিটার নীচে ছোট-ছোট অক্ষরে লেখা রয়েছে 'মানবতার চারটি সূত্র'।

সূত্রগুলো পড়ে চেয়ারম্যান একটু অবাক হয়ে গেলেন। বেশ কয়েকবার ওগুলো পড়লেন। আগে কখনও এরকম সূত্রের কথা তিনি শোনেননি। তবে সূত্রগুলো ওঁকে একটু ভাবিয়ে তুলল।

এরপর দ্বিতীয় চিঠিটা পড়লেন। তারপর তৃতীয়...চতুর্থ...পঞ্চম...।

নাঃ, আর পড়া সম্ভব নয়। অবশ্য পড়ার দরকারও নেই, কারণ, সব চিঠির বিষয় একই ঃ ফ্রি কম্পিউটার সেন্টার আর তার সঙ্গে 'মানবতার চারটি সূত্র'।

এই সেন্টারটার জন্য এতগুলো ছেলেমেয়ে ওঁকে চিঠি লিখেছে! এ নিশ্চয়ই ওই গোঁয়ারগোবিন্দ হেডমাস্টারটার প্লল্যান! মাস্টারির আড়ালে যত্তসব শয়তানি বুদ্ধি! আর তার সঙ্গে চিরব্রত আচার্য লোকটাও জুটেছে। থানায় এই দুটো মাস্টার মিলে মেজোবাবুর কাছে কমপ্লেইন করতে গিয়েছিল। তা ছাড়া চিরব্রতর কোচিং ক্লাসের অনেকগুলো ছেলেমেয়েও চেয়ারম্যানকে একইরকম চিঠি লিখেছে।

প্রীতম মণ্ডল চিঠিগুলো পড়ার ফাঁকেই ব্যানা ফিরে এসেছিল। এসে দাদার সামনে চায়ের কাপ সাজিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু প্রীতম সেদিকে নজর না দিয়ে চিঠিগুলোর দিকেই নজর দিয়ে রেখেছিলেন।

এখন চিঠি ছেড়ে ঠান্ডা-হয়ে-আসা চায়ে চুমুক দিয়েই ঠোঁট বেঁকালেন। আপনমনে কথা বলার ঢঙে বললেন, 'মাস্টার দুটোর ওপরে নজর রাখা দরকার। ওরা বড্ড বেড়েছে।' তারপর ব্যানার দিকে তাকিয়ে ওকে কাছে ডাকলেন। চাপা গলায় বললেন, 'শোন, ব্যানা—তুই চিরব্রত আচার্যর ওপরে একটু নজর রাখবি তো...।'

ব্যানা উৎসাহে বলে উঠল, 'ধরে একটু গ্রানাইট পালিশ দিয়ে দেব নাকি, দাদা?'

'আঃ, আস্তে কথা বল।' দূরে বসে থাকা বৃদ্ধ এবং বউটির দিকে আড়চোখে ইশারা করলেন প্রীতম। তারপর নীচু গলায় বললেন, 'না, না, ওসব কিছু নয়। শুধু একটু ওয়াচ রাখবি—কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, এইসব।'

'ও. কে., দাদা—।'

'আর ফ্যান্টাকে বলিস হেডমাস্টারটাকে চোখে-চোখে রাখতে—।'

প্রীতমের কথায় ঘাড় কাত করেই ব্যানা ওর মোবাইল ফোনের বোতাম টিপতে শুরু করল।

কিন্তু চেয়ারম্যান তখনও জানতেন না, আগামীকাল ওঁর কাছে আজকের দ্বিগুণ চিঠি আসতে চলেছে।

পরদিন ঠিক তাই হল। এবং তার পরদিনও তাই। একটা দিন যেন আগের দিনের জেরক্স কপি হয়ে চলল—শুধু চিঠির সংখ্যাটা লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়তে লাগল।

চিরব্রত প্রিয়রঞ্জন মাজিকে যে টাকা খরচ হওয়ার কথা বলেছিল, সেটা অজস্র পোস্টকার্ড আর ইনল্যান্ড লেটার কেনার জন্য। নানান পোস্ট অফিসে ঘুরে-ঘুরে সাতদিনের পরিশ্রমে চিরব্রত কয়েক হাজার পোস্টকার্ড আর ইনল্যান্ড লেটার কিনে ফেলেছে। এই কাজের জন্য কলকাতার কোথায় না কোথায় ও হানা দিয়েছে! ওর মধ্যে কেমন একটা জেদ কাজ করছিল।

এরপর চিরব্রত ওর ছাত্রদের কাছে দরাজ হাতে পোস্টকার্ড আর ইনল্যান্ড বিলি করেছে। বলেছে, চিঠিতে কী লিখতে হবে, আর কাকে লিখতে হবে। তারপর ওরা স্যারের কথামতো কাজ শুরু করে দিয়েছে। রোজ একটা করে চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলছে। ফ্রি কম্পিউটার সেন্টারটা ওদের জীবনে সত্যিই খুব দরকার।

প্রিয়রঞ্জন মাজিও ঠিক একই কাজ করেছেন। ক্লাস থ্রি আর ফোরের

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় দেড়হাজার ইনল্যান্ড লেটার আর পোস্টকার্ড বিলি করেছেন। তার সঙ্গে বিলি করেছেন চিঠির বয়ানের জেরক্স কপি—যাতে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের চিঠি লিখতে কোনও অসুবিধে না হয়।

এই চিঠিপত্রের 'আন্দোলন' শুরু করার আগে প্রিয়রঞ্জন মাজি আর চিরব্রত দুজনেই গার্জেনদের সঙ্গে কথা বলেছে, তাঁদেরকে সমস্যাটার কথা বুঝিয়েছে। বলেছে, এই চিঠি লেখার মধ্যে কোনও বেআইনি কিংবা অনৈতিক ব্যাপার নেই।

বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এই কাজ করতে চিরব্রত এবং প্রিয়রঞ্জনকে সাংঘাতিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনরাত কাসুন্দিগঞ্জ চষে বেড়াতে হয়েছে। বেশিরভাগটাই হেঁটে, আর কখনও বা সাইকেলে। ওদের দুজনেরই মনে হয়েছে, মানবতার সূত্রগুলোর কথা সব মানুষের জানা উচিত।

চেয়ারম্যান প্রীতম মণ্ডল যখন দৈনিক চিঠির স্রোতে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তখন আরও দুটো ঘটনা ঘটছিল। প্রথমটা হল, এলাকার বাসিন্দাদের মুখে-মুখে কম্পিউটার সেন্টারের সমস্যাটার প্রচার চলছিল। এক-এক ধাপে তিনগুণ করে এলাকাবাসী ব্যাপারটা জানতে পারছিল। আর দ্বিতীয়টা, এলাকার মানুষজন প্রচুর চিঠি পাচ্ছিলেন, যে-চিঠিতে চেয়ারম্যান স্যারকে লেখা চিঠির কথাগুলোই লেখা আছে, তবে শেষে যোগ করা আছে দুটো বাড়তি লাইন ঃ

'এই চিঠিটা দয়া করে চেয়ারম্যান স্যারকে দিয়ে দেবেন। আর বলবেন, তিনি যেন দয়া করে আমাদের কম্পিউটার সেন্টারটা তাড়াতাড়ি চালু করার ব্যবস্থা করেন।'

সুতরাং, এই চিঠিগুলো যাঁরা পাচ্ছিলেন তাঁরা সেগুলো প্রীতম মণ্ডলের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসছিলেন। কেউ-কেউ ওঁর সঙ্গে দেখা করে কম্পিউটার সেন্টারটা তাড়াতাড়ি শুরু করার জন্য অনুরোধও করে আসছিলেন।

প্রীতম মণ্ডল অভিজ্ঞ মানুষ, কিন্তু তিনি কখনও এইরকম 'নিঃশব্দ আন্দোলন'-এর মুখোমুখি হননি। তাই তিনি ঘনিষ্ঠ লোকজন আর ফ্যান্টা-ব্যানার মতো শাগরেদদের নিয়ে রোজই গোপন বৈঠকে বসতে লাগলেন। কী করা যায়? কী করা যায়?

শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তর যেটা বেরোল সেটা হল, যে-দুজন এই নষ্টামির গোড়া তাদের শায়েস্তা করতে হবে। এমন কিছু একটা করতে হবে

যাতে ওই দুটো মাস্টার আর ভুলেও কখনও এসব 'ইন্টেলেকচুয়াল উৎপাত' না করে।

কিন্তু ফ্যান্টা আর ব্যানা তো শায়েস্তা করার একটাই মাত্র পথ জানে। তাই ওরা দলবল নিয়ে ওদের মতো করে তৈরি হওয়ার কাজ শুরু করল।

৭. শেষ সংঘর্ষ

দিনটা ছিল রবিবার। কিন্তু দিনটার শুরু হল অদ্ভুতভাবে—একেবারেই অন্যান্য রবিবারের মতো নয়। অন্তত চেয়ারম্যান প্রীতম মণ্ডলের জন্য।

রবিবার দিন প্রীতম একটু বেলা করে ওঠেন—সাড়ে আটটা কি ন'টার কাছাকাছি হয়ে যায়। আজ তার কিছুটা আগেই ওঁর ঘুম ভেঙে গেল, কারণ, কারা যেন স্লোগান দিচ্ছে। কিন্তু এলাকায় এরকম কোনও বিক্ষোভের প্রোগ্রাম আছে বলে তো কোনও খবর পাননি!

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। চোখে-মুখে জল দিয়ে একটা পাঞ্জাবি গায়ে গলিয়ে নিলেন। ড্রেসিং টেবিলে রাখা চশমাটা চোখে দিলেন, আর তার পাশে রাখা মোবাইল ফোনটা তুলে নিয়ে সুইচ অন করে ঝুলবারান্দার দিকে হাঁটা দিলেন।

এই সাতসকালে কীসের স্লোগান? কোরাসে আওয়াজ তোলা স্লোগানটা এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ঃ

'চেয়ারম্যান প্রীতম মণ্ডল, জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ!'

দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন প্রীতম। আকাশ ঝকঝকে। সূর্যও ঠিকঠাকভাবে সব জায়গায় আলো ফেলেছে। প্রকৃতির তুলিতে শরৎকালের ছোঁয়া লেগেছে। তার মধ্যে হঠাৎ এইরকম পজিটিভ স্লোগান!

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই প্রীতমের চোখ নীচের দিকে নামল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ধাক্কা খেলেন যেন।

স্কুলের ইউনিফর্ম পরা অসংখ্য ছেলেমেয়ে প্রীতম মণ্ডলের বাড়ির সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো লম্বা মানুষ—প্রিয়রঞ্জন মাজি আর চিরব্রত আচার্য—এ ছাড়া দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একটা রোবট—মেহান।

ছেলেমেয়েদের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেক পুরুষ-মহিলা। বোধহয় ওদের গার্জেন, আর এলাকার কৌতূহলী দর্শক। সব মিলিয়ে ভিড় এতটাই যে, সেটা রাস্তা বরাবর দু-দিকে অনেকটা করে ছড়িয়ে পড়েছে। রাস্তার যে-সরু অংশটা ওরা গাড়ি আর লোকজনের চলাচলের জন্য ছেড়ে রাখার চেষ্টা করেছে সেখান দিয়ে সাইকেল, সাইকেল-রিকশা আর লোকজন বেশ অসুবিধে করে যাতায়াত করছে। পথচলতি কৌতূহলী মানুষরা স্কুল ইউনিফর্ম পরা ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা জমায়েত দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে জানতে চাইছে, ব্যাপারটা কী। ফলে ঘটনাটা প্রায় 'পথ অবরোধ'-এর চেহারা নিয়েছে।

'চেয়ারম্যান জিন্দাবাদ!' মাঝে-মাঝে থামছিল, আর সেই ফাঁকগুলোতে চিরব্রত, প্রিয়রঞ্জন কিংবা মেহানের বক্তৃতা পালা করে শোনা যাচ্ছিল।

'আমাদের এলাকায় বহু বছর ধরে একটা কম্পিউটার সেন্টারের দরকার ছিল। আজকাল ছেলেমেয়েদের কাছে কম্পিউটার এডুকেশনটা খুবই জরুরি, অথচ আমাদের ছেলেমেয়েরা, ছাত্র-ছাত্রীরা, সেই এডুকেশন পাচ্ছিল না। এতদিন পর সময় বদলাতে চলেছে। আমাদের চেয়ারম্যান স্যারের উদ্যোগে খুব শিগগিরই নবমুকুল প্রাইমারি স্কুলের এক্সটেনশন বিল্ডিং তৈরি হতে চলেছে। আমাদের চেয়ারম্যান প্রীতম মণ্ডল নিজে হাতে সেই বিল্ডিং-এর প্ল্যান স্যাংশন করে দিয়েছেন। ওই বিল্ডিং-এই তৈরি হবে ফ্রি কম্পিউটার সেন্টার। আমাদের এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফ্রি কম্পিউটার সেন্টার। একেবারে ফ্রি!'

আবার স্লোগান ঃ

'আমাদের চেয়ারম্যান—জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ!'

কিছুক্ষণ ধরে স্লোগান চলতে লাগল।

তারপর আবার শোনা গেল চিরব্রতর চিৎকার ঃ 'কিছুদিন পরেই আসছে শিক্ষক দিবস। সেই পবিত্র দিনে আমাদের চেয়ারম্যান নিজে হাতে সেই এক্সটেনশন বিল্ডিং-এর কনস্ট্রাকশনের সূচনা করবেন। আর তার পরদিন থেকেই শুরু হয়ে যাবে বিল্ডিং তৈরির কাজ। খুব নামকরা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ''ইন্ডিকন লিমিটেড'' এই কাজের দায়িত্ব পেয়েছে। আমাদের চেয়ারম্যানের আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা নিয়ে এই এক্সটেনশন বিল্ডিং তৈরির

কাজ এগিয়ে চলবে। দেখতে-দেখতে তৈরি হয়ে যাবে আমাদের ফ্রি কম্পিউটার সেন্টার। সেখানে আমি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের কম্পিউটার শেখাব। তার জন্য আমি কোনও টাকাপয়সা নেব না। নবমুকুলের হেডস্যারকে আমি কথা দিয়েছি।'

চিরব্রতর কথা শেষ হতে না হতেই বাচ্চাকাচ্চাদের হাততালি। এবং সে-হাততালির রেশ থামতে না থামতেই প্রিয়রঞ্জন মাজি জোর গলায় বলতে শুরু করলেন, 'আপনারা সবাই শিক্ষক দিবসে নবমুকুল স্কুলের অনুষ্ঠানে আসবেন। চেয়ারম্যান স্যারের উদ্যোগকে আপনারা আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন এটাই আমাদের বিশ্বাস...।'

প্রিয়রঞ্জন মাজির কথা শেষ হওয়ার পর আবার শোনা গেল স্লোগান। চেয়ারম্যানকে অভিনন্দন জানিয়ে অসংখ্য গলা একসঙ্গে মিলে গেল।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রীতম মণ্ডল ক্রমশ তাজ্জব হয়ে যাচ্ছিলেন। কী হচ্ছে এসব? তিনি তো স্কুলের এক্সটেনশন বিল্ডিং তোলার কাজে বাধা দিয়েছেন! অন্যায়ভাবে 'লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ'-কে দিয়ে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজটা করাতে চেয়েছেন! ব্যানাদের দিয়ে প্রিয়রঞ্জন মাজিকে তিনি 'শিক্ষা' দিয়েছেন। ফাঁড়ির মেজোবাবু প্রিয়রঞ্জন আর চিরব্রত—দুজন মাস্টারকেই হেনস্থা করেছেন! অথচ এসব সত্ত্বেও প্রিয়রঞ্জন মাজি আর চিরব্রত আচার্য শ'য়ে শ'য়ে ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে এসে ওঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একটানা ওঁর গুণগান করে চলেছেন! সব ভালো-ভালো কাজের উদ্যোক্তা হিসেবে ওঁর নাম মিথ্যে-মিথ্যে বলে চলেছেন!

কেন? কেন? কেন?

ফ্রি কম্পিউটার সেন্টার তাড়াতাড়ি করিয়ে দেওয়ার জন্য ওঁর নামে গত কয়েকদিন ধরে হাজার-হাজার চিঠি এসেছে। সেন্টারটা হলে প্রীতম সকলের ভালোবাসা পাবেন। অথচ প্রীতম সেই ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য নন।

এই দুজন মাস্টার মিলে কী অভিসন্ধি করে প্রীতম মণ্ডলকে এক মহান চেয়ারম্যানের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন কে জানে!

চেয়ারম্যানের মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। মিথ্যে প্রশংসার চাপে চোখে প্রায় অন্ধকার দেখছিলেন। কী করবেন এখন?

কোনওরকম সমস্যায় পড়লে প্রীতম সাধারণত যা করে থাকেন তাই করলেন ঃ মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে ফ্যান্টা আর ব্যানাকে পরপর দুটো

ফোন করলেন। বললেন, ওঁর বাড়ির সামনে বাচ্চারা পথ অবরোধ করেছে। এর নাটের গুরু হচ্ছে দুটো মাস্টার ঃ একজন নবমুকুলের হেডস্যার, আর-একজন প্রাইভেট কোচিং চালায়, মেহান নামের একটা অ্যান্ড্রয়েড নিয়ে ঘোরে।

চেয়ারম্যান একবার ভাবলেন, পুলিশে খবর দেবেন। কিন্তু পরের মুহূর্তেই ওঁর মনে হল, সেটা খুব হাস্যকর ব্যাপার হবে। কারণ, শুরু থেকেই এই জমায়েতের সবাই ওঁর প্রশংসা করে চলেছে। একটাও খারাপ কথা কেউ বলেনি, কেউ চেয়ারম্যানের অফিস বা বাড়ি ভাঙচুর করেনি। তা হলে পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যাপারটা আসছে কেমন করে? বরং স্কুলের এই ছেলেমেয়েদের কাছে আর ওই দুজন মাস্টারমশায়ের কাছে তিনি যথেষ্ট সুরক্ষিত।

যেসব প্রশংসার তিনি যোগ্য নন এতক্ষণ ধরে সেসব প্রশংসা শুনে-শুনে চেয়ারম্যান বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, এত বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে বহু খারাপ-খারাপ কাজ করার পর এই প্রশংসা ওঁকে নিজের কাছে অনেক-অনেক ছোট করে দিচ্ছে। লজ্জা নামে যে-বস্তুটা ওঁর ভেতরে আছে বলে কখনও টের পাননি, আজ যেন হঠাৎই সেটা টের পেলেন।

ঠিক তখনই মোটরবাইকের শব্দ শোনা গেল।

চেয়ারম্যান বারান্দা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, প্রায় আট-ন'টা মোটরবাইক ওঁর বাড়ির সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জড়ো হয়ে গেছে। সিংহের গর্জনের মতো 'গর্‌র গর্‌র...' শব্দ উঠছে।

ব্যানা আর ফ্যান্টা ওদের দলবল নিয়ে এসে গেছে।

কিন্তু ওরা সামনের দৃশ্য দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। স্কুলের ড্রেস পরে এত ছেলেমেয়ে ভিড় করেছে এখানে! বাইকের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেবে, না কি চালু রাখবে?

চেয়ারম্যানের নামে কয়েক হাজার চিঠি পাঠানোর কথা ওরা শুনেছে। চিঠির বিষয়টা জেনে ওরা একটু অবাকও হয়েছে। চেয়ারম্যান স্যার ওদের একরকম ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন, আর কম্পিউটার সেন্টার যাতে তাড়াতাড়ি চালু করা যায় তার জন্য তলে-তলে চোরা মদত দিচ্ছেন! স্লোগানগুলো ওদের আরও অবাক করছিল। আর একইসঙ্গে ওদের চিন্তাভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল।

এখন এই বাচ্চাগুলোর সঙ্গে কী করবে ওরা? চেয়ারম্যান ফোন করে

ওদের শুধু আসতে বলেছেন—তারপর আর কিছু বলেননি। তা ছাড়া...।

তা ছাড়া ব্যানার এক ভাইঝি নবমুকুলে ক্লাস থ্রি-তে পড়ে। স্কুলের ড্রেস পরে থাকায় ব্যানা ওকে এই ভিড়ে চিনে উঠতে পারছে না। সবাইকে একইরকম মনে হচ্ছে। ব্যানা যদি এখন কোনও উলটোপালটা কাণ্ড করে তা হলে ওর ভাইঝি সেসব দেখে ফেলবে—বাড়িতে গিয়ে বলে দেবে। তারপরই মা, বাবা, দাদা, বউদির সঙ্গে অশান্তি।

ফ্যান্টার সেসব সমস্যা নেই। তাই ও গরগরে মোটরবাইক নিয়ে 'দাদা' প্রীতম মণ্ডলের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু দাদা এখনও চুপ করে আছেন কেন? ওই তো, মোবাইল হাতে নিয়ে চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

কিন্তু ফ্যান্টা অ্যাকশনে নেমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে ভালোবাসে না। তাই ও ক্রমাগত হর্ন দিয়ে, ইঞ্জিন রেস করে, মোটরবাইক চালিয়ে দিয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করে চিরব্রতর দিকে এগোতে শুরু করল। এই মাস্টারটাই যত নষ্টামির গোড়া।

বাইকটা এগিয়ে আসতেই ছেলেমেয়ের দঙ্গল ভয়ে দু-পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল।

ফ্যান্টার পিছন-পিছন ঢুকে পড়ল আরও তিনটে বাইক।

চিরব্রতর কাছে এসে ফ্যান্টা চোখ গরম করে বলল, 'অ্যাই ব্যাটা মাস্টারের বাচ্চা! স্কুলের চারাপোনাদের নিয়ে এসব কী গদর করছিস? সিক্ষা দেওয়ার নামে ফুক্‌রিবাজি?'

ফ্যান্টা বাইক নিয়ে চিরব্রতকে ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল।

একটু দূরে ছেলেমেয়েদের ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা প্রিয়রঞ্জন মাজির চোখে ব্যাপারটা ধরা পড়ল। ধরা পড়ল মেহানের চোখেও, কারণ, ও বলতে গেলে ওর 'স্যার'-এর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।

মেহান কাউকে আর কোনও সময় দিল না। কেউটের ছোবল মারার গতিতে ও ফ্যান্টার বাইকের লেগ গার্ড চেপে ধরল। তারপর ফ্যান্টা সমেত বাইকটাকে তুলে ধরল মাথার ওপরে। বাইক আর মানুষের গোটা সিস্টেমটা সামান্য এদিক-ওদিক নাড়িয়ে সিস্টেমের সি. জি.-টা ও ভার্টিকাল লাইনের সঙ্গে অ্যালাইন করে নিল।

দুজন মানুষ তখন প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল।

একজন ফ্যান্টা। ওর বডিটা স্লাইড করে চলে এসেছে বাইকের ড্যাশবোর্ডের কাছে। কোনওরকমে দুটো হাতল আঁকড়ে ধরে ভয়ে কাঁটা হয়ে গুণ্ডাটা চেঁচাচ্ছে ঃ 'কী হচ্ছে! কী হচ্ছে! লোহার বাচ্চা! নামিয়ে দে...এক্ষুনি নামিয়ে দে বলছি!'

দ্বিতীয়জন চিরব্রত!

'মেহান, কী করছ! ফার্স্ট ল', ফার্স্ট ল'...!'

'সবক'টা ল'-ই মনে আছে, স্যার। আপনি ভাববেন না...।' মেহান 'কুল' গলায় বলল। তারপর মুখ তুলে তাকাল ফ্যান্টার বিপর্যস্ত মুখের দিকে ঃ 'তুমি দেখছি এখনও হান্ড্রেড পার্সেন্ট জানোয়ার রয়ে গেছ। আজ তোমাকে পার্সেন্টেজ কমানোর লাস্ট চান্স দিচ্ছি। জানোয়ারের পার্সেন্টেজ কমিয়ে এবার মানুষের পার্সেন্টেজ বাড়াও—।'

'বাড়াব, বাড়াব, বাড়াব...!' করুণ গলায় বলল ফ্যান্টা। ওর একটু আগের জঙ্গি তেজ এখন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

মেহানের 'সার্কাস' দেখে ছেলেমেয়ের দল তখন হইহই করে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে, 'রোবটকাকু! রোবটকাকু!' বলে রব তুলছে।

দোতলার বারান্দা থেকে চেয়ারম্যান প্রীতম মণ্ডল অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন। ইঁদুরকল থেকে ইঁদুরকে যেভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে ছিটকে ফেলা হয়, ঠিক সেইভাবে মোটরবাইকটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফ্যান্টাকে রাস্তার ধারের খোলা নর্দমায় ফেলে দিল মেহান। থকথকে কালো জল ছিটকে উঠল চারিদিকে। তারপর ও দু-হাতে ধরা বাইকটাকে ফুটপাঁচেক দূরের একটা খোলা জায়গায় ছুড়ে দিল। বাইকটা দুবার পালটি খেয়ে রাস্তার ধারে পড়ে রইল।

রাস্তায় তখন ভিড় আরও বেড়ে গেছে। নানান আলোচনা চলছে। উত্তেজনা টগবগ করছে।

চিরব্রত চেয়ারম্যানের দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'চেয়ারম্যান স্যার, আপনি একটু অফিসে নেমে আসুন। আমি আর মিস্টার মাজি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

সঙ্গে-সঙ্গে 'আমাদের চেয়ারম্যান, জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ!' স্লোগান শুরু হয়ে গেল।

প্রীতম মণ্ডল হাতের ইশারায় জানালেন যে, তিনি অফিস-ঘরে নেমে আসছেন।

ফ্যান্টা তখন সারা গায়ে নোংরা মেখে ড্রেন থেকে রাস্তায় উঠে এসেছে। ওর শাগরেদরা এসে ওকে ঘিরে ধরেছে, ওকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করছে।

কয়েকমিনিটের মধ্যেই চেয়ারম্যানের অফিসের সদর দরজা খুলে গেল। চিরব্রত ইশারায় হেডস্যারকে ডেকে নিয়ে এগোল। ওদের পিছন-পিছন মেহান। এখন ও 'স্যার'-কে ছেড়ে থাকতে চায় না।

প্রীতম মণ্ডলের বুক ধুকপুক করছিল। তিনি মেহানের কীর্তির কথা আগে শুনেছেন। আজ নিজের চোখে দেখলেন ওর কাণ্ড। রোবটটা আবার কিছু করে বসবে না তো!

অফিসে ঢুকে সবাই বসল। মেহান বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু চেয়ারগুলো তেমন মজবুত মডেলের নয় দেখে ও চিরব্রতর পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রীতম একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আপনাদের প্রশংসায় আমি খুব অস্বস্তির মধ্যে পড়েছি। কারণ, এত প্রশংসার যোগ্য আমি নই...।'

'তা কেন? আপনি তো বলতে গেলে সব ব্যাপারেই নবমুকুলকে হেল্প করছেন—।' হাসিমুখে প্রিয়রঞ্জন মাজি বললেন।

হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে চিরব্রত একটা ইশারা করল, যার অর্থ 'এবার বলুন—।'

'চেয়ারম্যান স্যার, আপনাকে আমি আমার স্কুলের শিক্ষক দিবসের ফাংশানে নেমন্তন্ন করতে এসেছি। আপনি সেদিনের অনুষ্ঠানে আমাদের প্রধান অতিথি হবেন।'

'আর একইসঙ্গে স্কুলের এক্সটেনশন বিল্ডিং-এর কনস্ট্রাকশনের শুভ সূচনা করবেন।' চিরব্রত বলল, 'বিশ্বাস করুন, এই ফ্রি কম্পিউটার সেন্টারটা কাসুন্দিগঞ্জের ছেলেমেয়েদের জন্যে বড় দরকার...।'

চেয়ারম্যান হেসে বললেন, 'সেটা তো বুঝতেই পারছি। নইলে এলাকার এতসব ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে পথে নেমে আসে?' প্রিয়রঞ্জন মাজির দিকে তাকালেন এবার ঃ 'আমি অবশ্যই যাব, হেডমাস্টারমশাই। আমি আপনাদের এই উদ্যোগকে মনে-প্রাণে সাপোর্ট করি। আমি সবসময় আপনাদের পাশে আছি। উঁহু, পাশে নয়, সাথে আছি—।'

কথাগুলো বলার সময় প্রীতম মণ্ডলের মনে হল, পুরোনো চেয়ারম্যানটাকে খতম করে দিয়ে এবার একটা নতুন চেয়ারম্যান জন্ম নিক। জন্মদিন হিসেবে আজকের চেয়ে শুভ দিন আর কিছু হতে পারে না।

boierpathshala.blogspot.com

মেহান হঠাৎই চিরব্রতকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার, আমি একটা কথা বলব—?'

'কী কথা?' ভুরু কুঁচকে মেহানের দিকে তাকাল।

'শিক্ষক দিবসের ফাংশানে নিশ্চয়ই অনেকে লেকচার দেবেন?'

'হ্যাঁ, তা দেবেন। চেয়ারম্যান স্যার দেবেন, হেডস্যার দেবেন, অন্য টিচাররাও কিছু বলবেন। তারপর গার্জেনরাও আছেন। তারপর...।'

'তারপর আমি একটা লেকচার দেব।' চিরব্রতর কথা শেষ করতে না দিয়ে মেহান বলে উঠল, 'খুব ছোট লেকচার...।'

'তুমি আবার কী নিয়ে লেকচার দেবে?'

'আমার আবিষ্কার নিয়ে—।'

'তোমার আবিষ্কার মানে?'

'কেন, ''ফোর ল'জ অফ হিউম্যানিটি''।' মেহান নির্লিপ্তভাবে বলল।

boierpathshala.blogspot.com